ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৪শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৩
১ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	বৈশাখ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৃদ্ধ ভারি নৃপস্নাত স্ত্রীরোগিবর চক্রিণাম্।
পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতশ্চ ভূপতেঃ।

বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, ব্রহ্মচারী বা যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তি, স্ত্রী, রোগী, বিবাহের জন্য সজ্জিত বর ও চক্রী ইহাদের গমন কালে রাস্তা ছাড়িয়া দিবে। ইহাদের মধ্যে রাজা অধিক মাননীয়। রাজা অপেক্ষা ব্রহ্মচারী অধিক সম্মানার্হ, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে ইহাদিগকে যাইবার জন্য রাস্তা দিবে।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥

যাগ, অধ্যয়ন, দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম, প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন এতত্রিতয় বিপ্রের পক্ষে অধিক ধর্ম্ম।

প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্।
কুসীদ কৃষি বাণিজ্য পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্।

প্রজার পরিপালন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রধান কর্ম্ম। কৃষিকর্ম্ম মহজনী কারবার বাণিজ্যাদি বৈশ্যের পক্ষে প্রধান কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥

দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের পক্ষে প্রধান কর্ম্ম। যদি তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হয় তবে বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিবে। অথবা দ্বিজাতির হিতাচরণ করত বিবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে।

ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণ নিজ ভার্য্যাতে রত, পবিত্র, ভৃত্যবর্গের ভরণকর্ত্তা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় নিরত হইবে। নমস্কারাত্মক মন্ত্র দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, জিতেন্দ্রিয়তা, দান, দয়া, দম, ক্ষমা এই গুলি ধর্ম্মের কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

বয়োবুদ্ধ্যর্থবাগ্বেশ শ্রুতাভিজন কর্ম্মণাম্
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠাং তথা।

বয়, বুদ্ধি, বাণী, বেশ, বিদ্যা, কুল ও নিজ২ কর্ম্মের অনুসারে কৌটিল্য ও শঠতা বিবর্জ্জিত জীবিকা অবলম্বন করিবে।

ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স তু সোমং পিবেদ্দ্বিজঃ।
প্রাক্‌সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদ্যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ।

যাঁহার গৃহে তিন বৎসরেরও অধিক উদরান্নের সংস্থান থাকে, তিনি সোমযাগ করিতে পারেন। যাঁহার গৃহে এক বৎসরের অন্ন সংস্থান থাকে তিনি প্রাক্‌সৌমিকী ক্রিয়া (সোমযাগের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য দর্শ পৌর্ণমাসাদি ক্রিয়া) অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

নববর্ষে আমাদের কথা।

১৮১২ শকাব্দা চলিয়া গেল। ঘটনারাশি বুকে করিয়া খণ্ডকাল মহাকালে মিশিয়া গেল। মহামায়ার নাট্যশালায় কত নূতন অভিনয় দেখাইয়া বিগত বর্ষ অতীতের গভীর গর্ভে ডুবিয়া গেল। খণ্ডকাল মহাকালের চরণে উপহার দিবার জন্য জগতের কত হাঁসি কান্না কুড়াইয়া পুষ্পমালা গাঁথিয়া লইয়া গেল। দুঃখী জীব দুঃখের কশাঘাতে পীড়িত হইয়া বিগত বর্ষকে অলক্ষ্যে বিদায় দিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, সুখী জীব আনন্দের হিল্লোলে ভাসমান হইয়া বিগত বর্ষকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কত আব্দার করিয়াছে, কিন্তু উভয়েরই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিগত বর্ষ আপনার কার্য্য আপনি করিয়া ধীরে ২ অনন্ত লীলাময়ীর লীলপটে মিলাইয়া গেল। প্রকৃতির অনন্ত-ভাব স্রোতে তৃণকণিকার ন্যায় বিগতবর্ষ কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। বিশ্বপ্লাবী প্রলয় বন্যার ভীষণ আবেগে পর্ব্বতমালা যেমন ভাসিয়া যায় সেই রূপ অনন্ত কালস্রোতে জীব জীবন ভাসিয়া যাইতেছে, কাহার সাধ্য যে তীব্র-তরঙ্গের প্রতিকূলে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। হুড় ২ হুড় ২ করিয়া কাল প্রবাহ অবিরত অনন্ত সাগর সঙ্গমে ধাবিত হইতেছে। প্রতি পলে প্রতি বিপলে প্রতি মুহূর্ত্তে মহাকাল—অজাগর সর্পের বিরাট গর্ভে জগৎ প্রবিষ্ট হইতেছে। অনন্ত ইন্দ্রজালময়ী প্রকৃতির একটি পট প্রক্ষেপানন্তর আবার অন্য একটি পট উত্তোলিত হইতেছে, ইহারই নাম নববর্ষ।

এ স্বেচ্ছাচারপ্লাবিত দেশে ইংরাজি সভ্যতারঞ্জিত উপধর্ম্ম সমূহের বিরুদ্ধে ধর্ম্মপ্রচারকই প্রথম মাথা তুলিয়াছিলেন। ঘোর স্বেচ্ছাচারবিজৃম্ভিত কল্পনারাশির বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকই প্রথম বীরবেশে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারকের সেই জন্মদিনের সহিত বর্ত্তমান দিনের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। তখন ধর্ম্মপ্রচারক যে ব্রত উদ্‌যাপন করিবার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ কুটকটাক্ষনিক্ষেপে পদে ২ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। "এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই সেকেলে হিন্দু ধর্ম্মের ন্যাক্কারজনক কথা লইয়া তোমরা পাগলামী করিতে চাও কেন?" এইরূপ কত ভর্ৎসনাই ধর্ম্ম-প্রচারককে পুরস্কার পাইতে হইয়াছিল। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রতপথের অনেক সহায় মিলিয়াছে। আশা ভরসার অভয় বাণী ঘোষিত করিয়া এখন অনেকেই যোগ দিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সমগ্রদেশের সম্মিলিত শক্তির মধুর আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া আশার অমৃতময় উচ্ছ্বাসে সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। শত যাতনা সহ্য করিয়া আমাদের ক্ষীণ শক্তি বিরাট মহীয়সী শক্তির চরণ তলে মাথা রাখিয়া আশ্রয়াঞ্চলে মুখ লুকাইয়া এতদিনে জুড়াইবার অবকাশ পাইয়াছে ইহাতে আমরা ধন্য। পূর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া গিয়া পুরাতন লাঞ্ছনা কষ্টকে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবাইয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা ভবিষ্যতের আবাহন করিতেছি।

বিগতবারের দ্বাদশবার্ষিকী কুম্ভমেলায় এমনি দিনে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উক্ত সভাই প্রথমে মুঙ্গেরে কার্য্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক দেশে ২ আর্য্যধর্ম্ম প্রচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই সময়েই হিন্দু প্রচার পদ্ধতির পক্ষপাতী হইয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় " সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন —

• • • I think you ought to decide soon whether you should adopt a strictly Hindu mode of propagation, for if you do not adopt it at once, the Arya Samajes bid fair to outstrip the Bramha Samajes, as has been the case at Monghyr and elsewhere &c " * • *

" আপনারা শীঘ্রই হিন্দুরীতিতে ধর্ম্ম প্রচারপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন ; যদি এখনই এরূপ পদ্ধতিগ্রহণ না করেন, তবে আর্য্যসভা (যেরূপ মুঙ্গের ও অন্যান্য স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে) ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

সেই কুম্ভমেলা গিয়াছে, পুনরায় কুম্ভমেলা আসিল। এই দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের আন্দোলন কিরূপ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে, দেশের লোকের আর্য্যধর্ম্মের দিকে মতিগতি কিরূপ ফিরিয়াছে, ইংরাজি সভ্যতার ভীষণ দুর্গ ভেদ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কিরূপ হিন্দুর অন্তরাত্মা বিচলিত হয়, সে সমস্তের পূর্ণ পরিচয় গর্ভাধানবিনাশক আইনের আন্দোলনে স্পষ্ট রূপে পাওয়া গিয়াছে। সতীদাহ উঠাইবার সময়েও ত আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু এমন দেশব্যাপী আন্দোলন, এমন পল্লীতে ২ প্রতিবাদ, এমন ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযুক্তিমূলক প্রতিবাদ আর কখনও হয় নাই, ইহা একরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে। সত্য বটে, আন্দোলন অগ্রাহ্য করিয়া রাজা নিজ রাজশক্তি দেখাইবার জন্য আইন পাস করিতে বাধ্য হইলেন, কেননা আইন পাস করা রাজার সম্পূর্ণ একতিয়ারের মধ্যে। কিন্তু রাজা ভিতরে২ ইহা ত বুঝিলেন, এই আইনের জন্য প্রজাসমূহের মনে কিরূপ ভয়ানক অসন্তোষ জন্মিয়াছে। এই রূপ দেশব্যাপী অসন্তোষ যে জন্মিবে, রাজা অগ্রে বুঝিতে পারেন নাই। সার স্টুয়ার্ট বেলি বলিয়াছিলেন, জন কতক মূর্খ অর্থ-ডকসন্ন্যাসের লোক এই আইনের বিরুদ্ধে চীৎকার করিবে বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই যখন আইনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করিলেন তখন গবর্ণমেণ্টের চমক ভাঙ্গিল, ভ্রম ঘুচিল। কিন্তু আইন যখন পেস হইয়াছে, তখন পাস করিতেই হইবে, নাহলে প্রেষ্টিজ [মান] বজায় থাকিবে না, এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্টকে আপাততঃ আইন পাস করিতে হইল। ভবিষ্যতে এই দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা মনে করিয়া ক্রমাগত প্রজার অসন্তোষ বৃদ্ধির কথা ভাবিয়া এতৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। সত্য বটে বঙ্গদেশেই আইনের অধিক প্রতিবাদ হইয়াছে, বঙ্গের মফস্বলের ধর্ম্মসভাসমিতি হইতে যেমন প্রতিবাদ হইয়াছে, তেমন পঞ্জাবাদি প্রদেশ হইতে হয় নাই, ইহার কারণ কয়েক বর্ষ হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণ বঙ্গেই অধিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন তাই আইন সম্বন্ধে বঙ্গেই ধর্ম্মান্দোলন প্রবলতর হইয়াছে। এখন পঞ্জাবাদি প্রদেশেও আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্য্য ধর্ম্মের আন্দোলন সম্বন্ধে যতটা উন্নতি হইয়াছে, কার্য্যাংশে ততটা হয় নাই, এই রূপ যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখিতে চাই। তাঁহাদের ইহাই কি অভিপ্রায় যে এই আন্দোলনের ফলে গৃহে ২ একবারে ধ্রুব প্রহ্লাদের মত মহাপুরুষ সমাজে অবতীর্ণ হইবেন, শুকদেবাদির মত মহাযোগী আকাশ ফুঁড়িয়া চলিয়া যাইবেন। এই রূপ যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা শূন্য মার্গে মনোহর উদ্যান বসাইতে চাহেন,

এ দাবদগ্ধ পতিত মরুভূমে তাঁহারা একবারেই পুণ্য-সলিলা মন্দাকিনীর অমৃত স্রোত বহাইতে চাহেন, গোমুখী হইতে নিঃসৃত দিগ্‌দেশে প্লাবিত গঙ্গাকে পুনরায় তাঁহারা গোমুখীর দিকেই ফিরাইয়া উজান বহাইয়া লইয়া যাইতে চাহেন ইহা কি কখনও সম্ভব?

ধর্ম্মসভা সমিতির আন্দোলনে দেশে যদি ধর্ম্মনিষ্ঠার ভাব উদ্দীপিত হয়, ধ্বংসাভিমুখী উচ্ছৃঙ্খল পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রশমিত হয়, জাতীয় ভাষার যদি উন্নতি হয়, ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাসস্থান, ভাষা পরিচ্ছদ ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে মিত্রতা ও একতা যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলেই বুঝিব ধর্ম্মসভার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যের এই প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া যদি ধর্ম্মসভা মরিয়া যান, তাহা হইলে ধর্ম্মসভা নিজের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া যাইবেন, ইহার পর যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের অন্যান্য ভাগ আরম্ভ করিবার অবসর পাইবেন।

বিগত বর্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের মধ্যে সহবাস-আইনের আন্দোলনই স্মরণীয় ঘটনা। এই আইন পাস হওয়ায় আমাদের লোক্‌সান হয় নাই, লাভই হইয়াছে। আমরা যে বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার রাজত্বে এত দিন বাস করিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই আন্দোলন তাহা মনে করাইয়া দিল। ইংরাজি শিক্ষার গুপ্ত বিষে আমাদের সমাজ জর্জরিত প্রায় হইয়া কিরূপ ধ্বংসপথে যাইতেছে, তাহা সামাজিক গণ বুঝিয়া তৎ প্রতিবিধানার্থ জাগরূক হইয়াছেন। ইংরাজকে জব্দ করিবার জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক ইংরাজি সভ্যতা ও বিলাসসামগ্রীর প্রতি লোকের বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছে। স্বধর্ম্মরক্ষা ও স্বজাতীয় ভাষার পুষ্টি সাধনার্থ দেশের ধনী সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাই কলিকাতায় "ধর্ম্ম-মণ্ডলী" স্থাপিত হইবার চেষ্টা হইতেছে। লোকে ঠেকিয়া যাহা শিখে, তাহা কখনও ভুলে না, তাহা মজ্জাগত হইয়া যায়। এই আইন উপলক্ষে হিন্দুসমাজ যাহা ঠেকিয়া শিখিলেন, তাহা কখনও ভুলিবেন না। এই মর্ম্মভেদী শিক্ষা আইন না হইলে হইত না। সুতরাং আইনে অনেক শিক্ষা হইল।

আইন পাস হওয়ায় অনেকেই নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহার কারণ বুঝি না। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার রাজত্বে কোন্ কালেই বা আশা করিবার কারণ ছিল, যে এখন তাহা নষ্ট হওয়ায় নিরাশ হইতে হইবে। যাহাদের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের অহিনকুল সম্বন্ধ, অদৃষ্টদোষে তাহাদের হাতে যখন পড়িয়াছি, তখন আমাদের নির্য্যাতিত হওয়াই স্বাভাবিক এই টুকু ভুলিয়া যাওয়ায় আশাভঙ্গের নিমিত্ত আমরা বৃথা মনস্তাপ পাইতেছি। যে রাজার রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি, তাহাও সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"।

হিন্দু সমাজের গৃহশত্রুগণ সর্ব্বদাই ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, বিধর্ম্মী রাজাও তাহাদের পরিদর্শিত ছিদ্রের ভিতর দিয়া সমাজে হস্তক্ষেপ করিতে লোলুপ হইয়াছেন, সমাজকে উৎসন্ন করিবার জন্য শাণিত কুঠার সর্ব্বদাই উত্তোলিত করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এমন অবস্থায় বিশেষ সতর্ক, বিশেষ দৃঢপ্রতিজ্ঞ, বিশেষ অধ্যবসায়শীল না হইলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু সমাজে যদি পুনরায় সামাজিকী শক্তি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে উক্তরূপ শত সহস্র আইনেও হিন্দু সমাজের কিছুই হইবে না। প্রতি দেশে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে সামাজিক পঞ্চায়ৎ প্রস্তুত হউক, যে কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের অনুযায়ী অভিযোগের কল্পনাও করিবে তাহাকে সমাজচ্যুত জাতিচ্যুত পরিবারচ্যুত করিবার ব্যবস্থা হউক। যে ব্যক্তি ভদ্র পরিবারের মান সম্ভ্রমের উপর আঘাত

করিতে চাহে, তাহার লাঞ্ছনার এক শেষ হওয়া উচিত। সমাজে নানারূপ অত্যাচার অপকর্ম্ম চলিতেছে সমাজ সে সমস্তের প্রতীকার করিতেছেন না বটে, কেননা সমাজ সে সমস্ত বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু স্ত্রী জাতির মানসম্ভ্রমের হানির সম্ভাবনা হইলে হিন্দু প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন। সুতরাং উক্ত বিষয়ে সমাজকে বাধ্য হইয়া জাগ্রত হইতে হইবে। নহিলে আর কোন উপায় নাই। কেবল এক সামাজিক শাসনের বলে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষ রূপে আইন হইলেও তাহা সমাজে চলে নাই। পূর্ব্বেকার দশমবর্ষের সম্মতি আইনও কেবল সামাজিক শাসনের গুণেই বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুতরাং সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর হইলে বর্ত্তমান আইনের বিষময়ী শক্তি নিশ্চয়ই সমাজে ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

বিগত বর্ষ এক প্রকার কাটিয়া গেল। বর্ত্তমান নববর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া যাঁহার কৃপায় ধর্ম্মপ্রচারক দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরম প্রভুকে প্রণিপাত করি। অনুগ্রাহক গ্রাহক বর্গের আশীর্ব্বাদপুষ্পাঞ্জলি মাথায় লইয়া আমরা নববর্ষকে আমন্ত্রণ করিতেছি।

(নিবেদন—বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির মধ্যে পাঠাইবেন, তাঁহাদের ডাক মাশুল দিতে হইবেনা, অর্থাৎ যাঁহারা ৩।৶০ বা ২।৶০ অথবা ১।৶০ মূল্যের কাগজের গ্রাহক, তাঁহাদের যথাক্রমে ৩৲, ২৲, ১৲ করিয়া মনি অর্ডার পাঠাইলেই হইবে। ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক সকলেই ধর্ম্মাত্মা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলেই ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তা জন্য শীঘ্র মূল্য পাঠাইয়া সুখী করিবেন। ইহাতে গ্রাহক ও প্রকাশক উভয়েরই সুবিধা।)

নববর্ষ।

যাহা গিয়াছে তাহা কি আবার আসিবে,—যখন ছিল তখন তাহার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাহার আস্বাদ তেমন সাধ মিটাইয়া লই নাই, মনে এক বারও হয় নাই যে এমনটি আর পাইব না, ভাবি নাই যে জলস্রোতের মতন সময় ভাসিয়া যাইতেছে, হয়ত আর ফিরিবে না, এই বেলা তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি করি। সেই অতৃপ্তিকর অথচ সুখ স্বপ্নময় অতীত আবার কি অভাবময় বর্ত্তমানে মিশিবে? শুনিয়াছি জগৎ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। যাহা ছিল, তাহাই আছে এবং তাহাই থাকিবে, নূতনের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ নাই, নূতন বলিয়া কোন কিছুই হয় নাই, হইবে না এবং হইতেও পারে না। অবস্থার পৌনঃপুন্য সংঘটনে জগতের স্থিতি। যেমন প্রবল নদীস্রোতে কাষ্ঠখণ্ডাদি কখনও বা ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে, ঘুরিয়া ২ তীরে লাগিতেছে আবার ভাসিয়া যাইতেছে তেমনি অবস্থার পরিবর্ত্তনে উলটি পালটি ভাসিয়া, ডুবিয়া ঘুরিয়া সৃষ্টির স্ফূর্ত্তি এবং পরিণতি হইতেছে। যাহা ছিল তাহাই আছে এবং থাকিবে।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু গতি এবং পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছু আছে কি? এই অবিরাম অনবরত গতি কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে? একটি বর্ষ ডুবিল, বুঝি আর ফিরিবে না। এমনি জলবিন্দুপাতবৎ ফোঁটা ২ করিয়া কত বর্ষ কত শতবর্ষ, কত সহস্র বর্ষ—কোটী ২ বর্ষ কোথায় পতিত হইয়াছে, কেন এমন করিয়া চলিয়া যাইতেছে কে বলিবে? মনুষ্য-স্মৃতিপটে সুখের, দুঃখের কত কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া যায় সে সকলই কি স্থির হইয়া থাকে? এক একটি করিয়া যে সব শোকগাথা কালের কুজ্ঝটিকা কোলে লুক্কায়িত হইতেছে। কেন এমন হয়, কেন এমন যায়, পুনঃ পুনঃ এমন করিয়া কেন আসিতেছে, জাতীয় স্মৃতিপটে কেন পুনঃ

পুনঃ আঘাত করিয়া, কলঙ্কিত করিয়া—মলিন করিয়া চলিয়া যাইতেছে? বর্ষের পর বর্ষ আসিল, চলিয়া গেল, দুঃখের, শোকের, যাতনার, দরিদ্রতার পসারা লইয়া, অপবিত্রতা, হীনতা, ভীরুতার উপঢৌকন লইয়া, কত বেশে কত ভাবে কত বৎসর আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া হিন্দুগণকে দলিত—মথিত—পীড়িত করিয়া চলিয়া গেল। যাহা গেল তাহা আর আসিল না, যাহা লইয়া গেল তাহাও ত ফিরাইয়া পাইলাম না। কিন্তু যে দুরপনেয় কলঙ্করেখা রাখিয়া গিয়াছে এখনও ত তাহা বিধৌত হইল না। হিন্দুর ভাগ্যের সে মসীলেপ দিন দিন ঘোরতর ভ্রমর-কৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় এই স্বল্পায়তন কালিমা লেখা ধীরে ২ আমাদের নিষ্কলঙ্ক সৌভাগ্যশশীকে গ্রাস করিতেছে। চিরান্ধকার বুঝি সন্নিকট।

বর্ষের শেষে, গতবৎসরের কথা ভাবিয়া, চমকিত হইয়া যখন অতীত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তখনই এই দুইটি কথা মনে পড়ে। মনুষ্য বর্ত্তমানে সুখী থাকিতে পারে না কেন? কোটীশ্বর হইলেও তৃষিত চাতকের ন্যায় ভবিষ্যৎ—আকাশে সুখের জলদ-খণ্ড দেখিতে চঞ্চল হয় কেন? বর্ত্তমানকে ধিক্কার দিয়া স্বপ্নময়ী ভবিষ্যৎ সুখ প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটে কেন? আমাদের যাহা ছিল তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সন্তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই কেন? অন্ধকার-পূর্ণ দেশে, অন্ধগণের সমাজে এ "কেনর" জ্যোতিলেখা কে দেখাইতে পারে? একটি বৎসর চলিয়া গেল, সুখের নহে, দুঃখের। মনোভঙ্গের কত বিষয় ক্রোড়ে করিয়া চলিয়া গেল, তত্রাচ কি জানি কেন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শরীর কণ্টকিত হইতেছে। কোন্ বিভীষিকা আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ-ক্রোড়ে সঞ্চিত আছে তাহা বিধাতাই জানেন। নবাগতের আদর সৎকার করিতে হয়; সম্মান সৌজন্য দেখাইতে হয় কিন্তু আশাপথ দেখিতে ২ দুঃখ—কষ্ট—যাতনা চাপিয়া সুখের আশায় ভবিষ্যতের কোণে দৃষ্টি পাত করিতে ২ আমরা এখন চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতেছি। ভরসাহীন উৎসাহহীন উদ্যমহীন হইয়া ঔদাস্যের অন্তস্তলে পড়িয়া আছি।

ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে যে History repeats itself" যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিবে, একবার যে অবস্থায় লোকে পতিত হইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থা হয়ত শতবর্ষ পরে আবার হইবে। ঘুরিয়া ২ ফিরিয়া ২ ঐতিহাসিক বিষয় আসিতেছে, যাইতেছে আবার আসিবে। ইহা প্রকৃত কি না জানি না কিন্তু বুনিয়াদী ঘরের পক্ষে ভরসা বাক্য বটে। কিন্তু আমাদের কোন্ দিন আসিতেছে? কালাপাহাড় যে দিনে হিন্দুর দেবদেবীকে চূর্ণ করিয়াছিল সেই দিন! অথবা দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজীব যে দিন হিন্দুগণকে পীড়ন করিয়া ছিলেন সেই দিন! অথবা নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ অশোক যে দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন সেই দিন! তাই সশঙ্কিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে হয়। ভারতের দশদশা হইয়াছে এখন কোন্ দশা ফিরিবে তাহা কে জানে?

এস নববর্ষ! চিরদিনই তোমাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া, আদর আপ্যায়িত করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়াছি। চিরদরিদ্রের কল্পনার চক্ষে তুমি কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মোহিত করিয়াছ। আর হিন্দুর মন আশায় ভরসায় ফুলিয়া উঠে না, অল্পে ২ আমরা সাগর-গর্ভে ডুবিতেছি। মনে হয় না যে আমরা কখনও সুখী হইব, মনে হয় না যে আমরা আবার গাল পুরিয়া হাঁসিব, মনে হয় না যে আবার ভাই ভাই এক হইয়া, ঘরের পরের নিজের করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিব, মনে হয় না যে আবার ধর্ম্মগতপ্রাণ হইয়া ধর্ম্মের সংসার পাতাইয়া ধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিতে জগৎ পবিত্র করিব। বিলাসের প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া আমাদের আঘাত করিতেছে, অহম্মুখতা লাম্পট্যের

মহাবিষে আমরা জর্জ্জরিত হইয়াছি, ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া আর সুখের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখি না। এস নববর্ষ? না ডাকিলেও তুমি আসিবে, না চাহিলেও তুমি তোমার কার্য্য অল্পে ২ সাধন করিতে থাকিবে। বিধাতা যে বজ্রলিপি তোমাকে দিয়াছেন তুমি বজ্রাগ্নির মসী করিয়া বজ্রসূচীর লেখনী করিয়া আমাদের ভাগ্যে তাহার প্রতিলেখ লিখিবেই। জানিনা এবার কোন কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছ, কোন্ অবনতির সূচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছ। বড় ভয় হয় পাছে আত্মহারা হই, স্মৃতিশূন্য হই, জ্ঞানহীন উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠি।

অনাথের নাথ! দীনবন্ধু! ডাকার মত তোমাকে ডাকিতে পারি না তাই তুমি আমাদের সাড়া দেও না, তাই এত রোদন ধ্বনি তুমি শুনিতে পাও না—কিন্তু তেমন করিয়া ডাকিবার শক্তি কে দিবে, সে ভাব ভঙ্গি কে শিখাইবে, তুমি বৈ কে আর আমাদের আছে। প্রভু! তুমি বল দেও! বুদ্ধি দেও! ধৈর্য্য দেও! সহিষ্ণুতা দেও! তোমার আশীর্ব্বাদ পাইয়া যেন আমরা সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

হরিদ্বারে মহাকুম্ভমেলা।

রাশি চক্র দ্বাদশবার পরিভ্রমণ করিলে মহাকুম্ভযোগে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে এই মহামেলা হইয়া থাকে। ১৮১২ শকাব্দার শেষ দিনে এই মহাসম্মিলনী হইয়া গেল। এই মহাকুম্ভযোগে হরিদ্বারব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য বিভাগ হইতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমবেত হইয়া ছিল। লোক সকলের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট নিজোচিত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই। পথ, ঘাট, মঠ, মাঠ ও যাত্রী দিগের থাকিবার স্থানাদি অতিশয় পরিষ্কার রাখা হইয়াছিল। অতি জনতা বশতঃ লোকের ঘাত প্রতিঘাত জনিত কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট না হয়, তজ্জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়া ছিল। চৌর্য্যাদি নিবারণের জন্য যাদৃশ সদ্ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার কোন প্রকার ত্রুটি হয় নাই। লোকে পীড়িত হইলে তাহা দিগের চিকিৎসার জন্য, সঙ্গী সহচরচ্যুত হইয়া হারাইয়া গেলে, লোক সকলকে নিজ বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়া ছিল। এই সকল কার্য্যের জন্য বহুসংখ্যক পুলিস কর্ম্মচারী, ডাক্তার, মেথর নিযোজিত ছিল। মল মূত্র ত্যাগের জন্য শত শত টাট্টী বা পায়খানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই সকল টাট্টী যাহাতে সর্ব্বদা অতি পরিষ্কার থাকে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের অতিশয় যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। হরিদ্বার স্থানটী হিন্দুর চক্ষে যেমন পবিত্র, গবর্ণমেণ্ট বাহ্যতঃ তাহাকে তাদৃশই নির্ম্মল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গৃহস্থদিগের ও সাধু সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন দিকে নিরূপিত ছিল। কন্খল, জ্বালাপুর, হরিদ্বার, গঙ্গার পরপার ও পর্ব্বতের উপরিভাগের কিয়দংশ পর্য্যন্ত তীর্থার্থীগণ কয়েক দিন নিজ নিজ নিবাস নিরূপণ করিয়াছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে অনেক বণিক ব্যবসাদার নানাবিধ সামগ্রীসহ আসিয়া দোকান খুলিয়াছিল। মিষ্টান্নাদি তীর্থাগত ব্যক্তি গণের আহারাদির জন্য যথাযোগ্য অনায়াসলভ্য ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তীর্থাগতগণের যাহাতে কোন রূপ ক্লেশ না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই উত্তম হইয়া ছিল।

এই সময়ে হরিদ্বারে প্রাকৃতিকী অবস্থা নাতিশীতোষ্ণ। দিবাভাগ উত্তাপযুক্ত ও রাত্রিকাল অতিশয় সুশীতল। চারি দিকের পর্ব্বতমালা তরুপল্লবাদিতে সুশোভিত থাকায় এবং ভগবতী ভাগিরথী কোথাও সপ্তস্রোতা ও কোথাও ত্রিস্রোতা হইয়া নির্ম্মল জল তরঙ্গে তরতর বেগে প্রবাহিত হওয়ায় স্থানীয় দৃশ্য

অতি মনোহর বোধ হইল। এত সাধু, এত সন্ন্যাসী, এত মহাত্মা কেহ কখনও একত্রে আর কোথাও দেখে নাই। এই মহামেলা সাধুদিগের মহাসম্মিলনী বলিলেই হয়। দ্বাদশ বর্ষান্তে মুনি, মহর্ষি, সাধু, সন্ন্যাসীগণ অতুল তপঃপ্রভাবযুক্ত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথীর পৃথ্বী স্পর্শের প্রথম পাদভূমি এই হরিদ্বার ক্ষেত্রে এক একবার সম্মিলিত হইয়া থাকেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত; এই মহর্ষি মেলা দর্শন করিবার জন্য গৃহস্থগণও মহাবিষুব সংক্রান্তিতে কুম্ভস্নান উপলক্ষে হরিদ্বারে উপস্থিত হইতেন। ক্রমে ক্রমে এই মেলার বাহ্যপুষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দুগণের যদি তপোভূমি দর্শনে যদি সাধু সজ্জন সমাগমে প্রাণ মন পবিত্র করিতে হয়, যদি পবিত্র উল্লাসে জন্ম জীবন সফল করিতে হয়, তবে এই মহামহর্ষিমেলায় সমাগম ভিন্ন আর উত্তম সুযোগ সংযোগ হওয়া সুকঠিন।

এই মহামেলার উপলক্ষে বিশেষরূপে ধর্ম্মান্দোলন করিবার জন্য মিরাট হইতে ও সাহারাণ পুর হইতে সমাগত ধর্ম্মসভাগুলীর ও দিল্লী হইতে সমাগত ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহাধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্যেক সভাতেই সুযোগ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যান ও বক্তৃতা হইয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার দ্বারা মিরাট সভা ও ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। প্রতি সভাতেই ব্যাখ্যান বক্তৃতা শুনিবার জন্য কয়েক দিন সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণের অতিশয় জনতা হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মবিরোধী খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণের ও দয়ানন্দী দলের বক্তৃতাও স্থানে ২ হইয়াছিল। দয়ানন্দীগণ হিন্দু পণ্ডিত গণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, কিন্তু কোন দিনই বিচারে অগ্রসর হয় নাই। বস্তুতঃ পণ্ডিত গণের সহিত বিচার করিবার উপযুক্ত সমর্থ ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে কেহ নাই। মহারাজা দ্বারভাঙ্গাধীশের উৎসাহে ও উদ্যোগে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে হরিদ্বার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় হিন্দু ধর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিত গণের মর্য্যাদা বর্দ্ধনার্থ পাঁচটী স্বর্ণ পদক বিতরিত হইল। দেশ হিতৈষী গুণীগণের এই রূপে মান মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে দেখিলে আমরা বড় সুখী হই। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে একটী পদক একজন বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারককেও প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মসভা সমূহের নিয়মিত অধিবেশন হওয়ায় তীর্থাগত সজ্জন গণের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে স্নান, দেবদর্শন, সাধুদর্শন ও ধর্ম্মালোচনাই বিশেষ কার্য্য বলিতে হইবে।

এই মহামেলায় রাজা রাজেন্দ্র বর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া বোধ হইল। আখাড়াধারী মহান্তগণের সাজ সজ্জা প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক জাঁক জমাকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী ভেরী প্রভৃতির তুমুল ব্যাপারের ও প্রত্যেক আখড়ায় সহস্র সহস্র সাধু গৃহস্থ অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসযুক্ত হইল। নাগা, অলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, ঊর্দ্ধবাহু নখী, ঠাড়েশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, অঙ্গঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভুখড় কুকড়, উখড়, ঘর বাড়ী, সরভঙ্গী, দশনামা সন্ন্যাসী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, কবির পন্থী, অবধূত, ব্রহ্মচারী, হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাট্টা যোগী, আদি কত শ্রেণীর কত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিনা। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল, চক্ষু সফল ও মানব জন্ম পবিত্র হইল। এই মহামহর্ষি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই যেন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলা খেলা আর ভাল লাগে না,

জীবের বৃথা মান, অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।

কুম্ভ যোগে স্নান করিবার পূর্ব্ব দিনই লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসিয়া প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ ভূমি জনাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭।১৬ দিন ক্রমাগত রেলওয়ে কোম্পানি ঘন্টায় ঘন্টায় বিশেষ ট্রেণে লোক বোঝাই করিয়া হরিদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ী কুলাইয়া উঠিতে না পারায় মালগাড়ী ও পশ্বাদি লইয়া যাইবার গাড়ীতে পুঞ্জ পুঞ্জ লোক বোঝাই করিতে হইয়াছিল। রেল পথে লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। হরিদ্বারে অতিশয় পীড়া হইতেছে, ওলাউঠায় শত শত লোক মরিয়া যাইতেছে, গবর্ণমেন্ট কাহাকেও তথায় যাইতে দিতেছেন না, প্রত্যেক লোকের উপর অত্যধিক অত্যাচার হইতেছে এই রূপ অনেক মিথ্যা জন-প্রবাদ দেশে দেশে প্রচারিত হওয়ায় অনেক যাত্রী নিজ নিজ দেশ হইতে আদৌ বাহির হইতেই পারেন নাই। বস্তুতঃ ভগবতী ভাগিরথীর কৃপায় ও ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সুব্যবস্থায় পীড়াদি কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়। তীর্থপ্রবেশ কালে প্রত্যেক যাত্রীকে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এক আনা মূল্যের একখানি করিয়া কাগজের টিকিট ক্রয় করিতে হইয়াছিল, এবং অমাবস্যা ও সংক্রান্তির দিন গমনাগমনের নানা অসুবিধা পরিহারার্থ একখানি করিয়া কাপড়ের টিকিট এক আনা মূল্যের ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই কাপড়ের টিকিট ক্রয় করা লোকের নিজ নিজ ইচ্ছাধীন ছিল। যাত্রী দিগের স্নান করিতে যাইবার জন্য তিনটী পথ অবধারিত হইয়াছিল। স্নান করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য আর এক স্বতন্ত্র পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাঁহারা কাপড়ের টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন তাহারা যে কোন পথে যাইতে আসিতে পারিতেন, পথের মাঝে মাঝে দারুনির্ম্মিত "অবরোধ" প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্যেক অবরোধে সিপাহি পাহারা ছিল। সম্মুখের ভীড় যতক্ষণ না কমিয়া যাইত, ততক্ষণ যাত্রী দিগের জন্য এই অবরোধদ্বার উন্মুক্ত হইত না। এইরূপ প্রথা অবলম্বিত না হইলে গঙ্গার ঘাটে কতশত বালক, বৃদ্ধ, নারী ও দুর্ব্বল ব্যক্তি যে বহুজন পদ-দলিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত তাহার সীমা নাই। গবর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় বিপুল বিঘ্ন বিপত্তি হইতে লোক সকল রক্ষিত হইয়াছে। পথপার্শ্ববর্ত্তী উচ্চোচ্চ সৌধ শিখরে ব্রিটিস ধ্বজাধারী কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান থাকিত, সম্মুখের জনতা কমিয়াছে এই রূপ সঙ্কেত জানাইলে তবে পশ্চাদ্বর্ত্তী অবরোধ দ্বার উন্মুক্ত হইত। ব্রিটিস প্রহরী ও কর্ম্মচারী গণ অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ নিজ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীর কিছু কিছু অত্যাচার দেখিয়া বিশেষতঃ দুর্ব্বল দরিদ্র অতিথির প্রতি বল প্রয়োগ করিতে দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। লোকসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া উঠিতে পারি নাই; কিন্তু পথের বিস্তৃতির পরিমাণে সরল রেখা টানিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি সেকেণ্ডে তিনটী পথ দিয়া গড়পড়তা অন্যূন ২৫ জন স্নানার্থী ঐ সরল রেখা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বরাত্রি ২টা হইতে সংক্রান্তির দিন অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই হিসাবে স্নানার্থীর সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রয়োদশ লক্ষ। যদি প্রাগুক্ত মিথ্যা জনপ্রবাদ প্রচারিত না হইত তাহা হইলে অন্যূন বিংশলক্ষ লোকের সমাগম হইত। বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মপ্রচারের গুণে এবার অনেক বাঙ্গালীর কুম্ভস্নান উপলক্ষে হরিদ্বারে আসিবার উৎসাহ দেখিয়া পরম তুষ্টি লাভ করিলাম। এত বাঙ্গালী পূর্ব্বে পূর্ব্বে কোন কুম্ভযোগে সমাগত হয়েন নাই। হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেল পথ নির্ম্মিত হওয়ায় লোক সকলের আসিবার উত্তম সুবিধা হইয়াছে।

হরিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ড (হর্ কে পৌড়ি), কুশাবর্ত্ত ঘাটে, নীলাচলপ্রবাহিনী নীলধারায়, দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী কণখলে স্নান করিতে হয়।

নীলাচলনিবাসিনী চণ্ডী দেবী ও স্থানান্তরে বিল্বকেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
কনখলে স্নান মাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

লোকের অতিজনতা জন্য এবং বিল্বকেশ্বর ও চণ্ডী দেবীর মন্দিরের ক্ষুদ্রায়তন থাকায় দর্শনার্থী দিগের প্রবেশ ও নির্গম অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। আমরা যে দিন মা চণ্ডীকে দর্শন করিতে উঠিয়াছিলাম, সেই দিন দুইজন পুলিশ-প্রহরী জনতা নিবারণ করিতে গিয়া মন্দির মঞ্চ হইতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। যাত্রীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আঘাত পাইয়াছিল। স্নানের দিনও কয়েক জন লোকের অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল ও মূর্চ্ছাদি হইয়াছিল। শুনিলাম (বলিতে পারি না সত্য কি মিথ্যা) কয়েক জন নাকি প্রাণত্যাগও করিয়াছে। এবার তীর্থের পাণ্ডাদিগের অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের অর্থাগম অধিক হইবে, গবর্ণমেণ্ট যাতায়াতের জন্য গঙ্গার উপরে ৭।৮ টা নৌসেতু ও বন জঙ্গল কাটিয়া অনেক গুলি সুপ্রকাণ্ড পথ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এবার হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটা অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের সুযোগ্য দীক্ষাগুরু শ্রীমদবধূত দয়াল দাস স্বামী জী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্জ্জন সৈকত-ভূমিতে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে আসন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে আসন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর ও প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের পর তিনি তাঁহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বহুশাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কুমার পরিব্রাজকের প্রতি এই রূপ আদেশ ও উপদেশ হইল যে তিনি পিতৃমাতৃদত্ত পূর্ব্বা-শ্রমের নাম (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন) পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমোচিত গুরুদত্ত নামে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পরিচিত ও সম্ভাষিত হয়েন। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক নাম পরিবর্ত্তন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে লোকের বুঝিবার কিছু অসুবিধা হয় বলিয়া এতদিন পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এবার হইতে গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় বোধে পরিবর্ত্তিত নাম শিরোধার্য্য করিলেন। এখন হইতে যে কোন ব্যক্তি এই সুপ্রসিদ্ধ অবধূত শিষ্যকে পত্রাদি লিখিবেন, আশা করি তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন" না বলিয়া "কুমার পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" এই রূপ বলিবেন বা লিখিবেন। নামের প্রথমার্দ্ধে প্রেমের, অপরার্দ্ধে জ্ঞানের প্রতিভাতি প্রকাশ পাইতেছে। কুমার পরিব্রাজক যেমন জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির পক্ষপাতী, তাঁহার গুরুদেবও তদুপযুক্ত নামকরণ করিয়াছেন। এ নামে দেহের জনক পিতৃদেবের ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক সদ্গুরুদেবের প্রদত্ত নামের উভয় ছায়াই পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েক দিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম। যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, সাধু, সন্ন্যাসী, মহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রী, পুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার সদুদার ভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে। এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে তিনি কাহারও বাটীতে গমন করেন না, কাহারও নিকট একটা কপর্দ্দক প্রার্থনা করেন না। তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক, অভ্যাগত পুরী মালপুয়া, মোহন ভোগ, অন্নব্যঞ্জনাদি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। দুই বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত। বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর প্রেমপূর্ণ বাণী, যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য তাঁহার তপঃশক্তি, ধন্য তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, যখনই যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা,

না হয় ভগবদ্ভজন, সংকীর্ত্তন, না হয় সদ্ধর্ম্মালাপ হইতেছে, মুহূর্ত্ত মাত্র তথায় সময় অপব্যয়িত হয়না। যদি অবকাশ পাই তো অন্য সময় তাঁহার উপদেশাদির বিষয় বলিব।

এই মহামেলায় জুনা আখাড়া ও নিরঞ্জনী আখাড়ার কিছু ধুম ধাম হইয়া ছিল। কাশ্মীরাধীশ ভ্রাতৃগণ সহিত স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। এখানে যাহা কিছু দেখিলাম সব কিছু হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম, অবকাশা-ভাবে তাহার কিছুই ভাবরূপ করিয়া পাঠক গণের সম্মুখে ধরিতে পারিলাম না, ইহাই বড় আক্ষেপ রহিল।

কাশীধামে বিষম বিভ্রাট।

পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আজ ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে ঘোর অশান্তি রাজত্ব করিতেছে। ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামায় সমগ্র সহর বিকম্পিত হইয়াছে। মিউটিনির পর এমন দুর্দ্দিন সহরবাসীর অদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। ধন প্রাণ লইয়া লোকে শশব্যস্ত,—আতঙ্কে শিহরিত,—উৎকণ্ঠায় আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভীষণ লুটপাটের ভয়ে দোকানপাট কার কারবার সমস্তই বন্ধ হইয়াছে, রাস্তায় ২ গোরা পল্টন পাহারা বসিয়া গিয়াছে। বড় ২ রাস্তা লোক-সমাগম শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কোলাহল নাই কলরব নাই, চারিদিক নীরব নিস্পন্দ! সমগ্র সহর শ্মশানভূমির ন্যায় উজাড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘোর বিষাদের তিমিরময়ী ছায়া সমগ্র সহরকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন, কাশীধামে জলের কল হইতেছে। জানিনা কি অশুভ ক্ষণে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাই বিপদের উপর বিপদ, বিঘ্নের উপর বিঘ্ন আসিয়া ইহার কার্য্য ক্ষেত্রে বাধা জন্মাইতেছে। অন্যান্য বিপদ বিঘ্নের কথা ধর্ম্মপ্রচারকের আলোচনার বিষয় নহে। যে বিপদে সমগ্র সহর দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে বলিয়াই অদ্য তাহার বিবরণ ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকগণকে আমরা অবগত করিতে বাধ্য।

কাশীতলবাহিনী গঙ্গার সহিত যেখানে অসী নদীর সঙ্গম হইয়াছে, সেই খানেই জলের কলের সূত্রপাত হইয়াছে। সেই খানেই লৌহনির্ম্মিত নল ও এঞ্জিনাদি বসান হইতেছে। জল সাফ্ করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তথায় পুষ্করিণীও খনন করা হইয়াছে, সেই পুষ্করিণীর পার্শ্বেই রামমন্দির বিদ্যমান। রামমন্দির না ভাঙ্গিলে জলের কল অন্যদিক দিয়া লইয়া যাইবারি সুবিধা নাই। সুতরাং রামমন্দির চূর্ণ করিতেই হইবে। অথচ হিন্দুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট—উত্তেজিত করা হইবে না। বড়ই বিষম সমস্যা উপস্থিত। প্রথমে যখন সেই স্থানটি কার্য্যোপযোগী কিনা ইহা বিচার করিবার জন্য নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভ্য গণ বুঝিতে পারেন নাই, যে সে রাস্তায় রামমন্দির পড়িবে। বিষম ভ্রমে পড়িয়া তাঁহারা সেই স্থানটিকে কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী বলিয়া মঞ্জুর করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের ভ্রম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রামমন্দির না ভাঙ্গিলে সম্ভাবনা নাই তাহা নিষ্কাশিত হইল। অতঃপর কোন ২ বাবু সভ্য ব্যবস্থা দিলেন যে রাম মন্দির ভাঙ্গিয়া রাম বিগ্রহকে অন্য স্থানে নড়ান যাইতে পারে, কেননা ইহা অচল মূর্ত্তি নহে, কেবল শিবলিঙ্গকে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার যো নাই। সুতরাং অন্যত্র রাম মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছু টাকা দিলেই চলিবে। কিন্তু বোর্ডের অন্যান্য অধিকাংশ মেম্বর পণ্ডিতদের ব্যবস্থা লইয়া মত দিলেন যে তত্রস্থ রামমূর্ত্তি অচল বিগ্রহ, নড়াইবার যো নাই। সুতরাং মন্দির বাঁচাইবার জন্য তাহার চারিধারে কিছু ২ স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হউক। মন্দিরকে বাঁচাইয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া জলের কল চলিয়া যাউক। ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। যদি কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়, তত্পূরণের জন্য হিন্দুরা চাঁদা করিয়া টাকা দিবার জন্যও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা রক্ষিত হইল না। ক্রমশঃ মন্দিরের চতুর্দ্দিক খোদিত হইতে লাগিল, সিঁড়ি পর্য্যন্ত খনন করা হইল। লোকের আশারজ্জু ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল, রাজা শিবপ্রসাদ, উকিল বীরেশ্বর মিত্র, বাবু সীতারাম এই কয়েক জনের পরামর্শে ম্যাজিষ্ট্রেট পরোক্ষ ভাবে মন্দির ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপাততঃ মন্দিরকে চূর্ণ না করিয়া তাহার চারিদিক খুঁড়িয়া ফেলা হইবে। তাহা হইলে বর্ষাকাল আসিলে তলদেশ জলে ধসিয়া মন্দির আপনা আপনিই পড়িয়া যাইবে। ইহাই মন্দির ভাঙ্গিবার ষড়যন্ত্র। লোকের মন ক্রমশঃ চঞ্চল—উদ্বেজিত—উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বোর্ডের যে সভ্যেরা মন্দির ভঙ্গে মত দিয়া ছিলেন, প্রকাশ্য বক্তৃতায় রাম চন্দ্রজীর উপর যাঁহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া ছিলেন তাঁহাদের উপর লোকের আক্রোশাগ্নি তীব্ররূপে জ্বলিয়া উঠিল। পাণ্ডা গণ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মন্দিরের চারিধারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়া রহিল, বলিতে লাগিল, আমাদের কণ্ঠ অগ্রে ছিন্ন কর পরে মন্দির ভাঙ্গিও। প্রাণ থাকিতে মন্দির ভাঙ্গিতে দিব না। এই রূপ উত্তেজনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধীরে ২ সমগ্র সহরে ছড়াইয়া পড়িল। একে কাশীধাম ধর্ম্মপ্রধান স্থান, তাহাতে এখানকার অধিবাসী হিন্দুস্থানীরা উষ্ণশোণিত, অল্প ক্রোধের উত্তেজনাতেই অধীর হইয়া উঠে। আবার মন্দির ভঙ্গের উত্তেজনা ও বিপক্ষ দলের ধর্ম্ম গ্লানি সূচক কথাতে সহর শাস্তিপ্রিয়ত আন্দোলিত হইতে লাগিল, সুতরাং ব্যাপার ক্রমশঃই ভয়ানক হইতে লাগিল। শুনিলাম কেহ ২ ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়াছিলেন, আপনি যদি লোক সমূহকে মন্দির ভাঙ্গা হইবে না এই রূপ শীঘ্র আশা না দেন,

ধর্ম্মপ্রচারকের শেষ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে এমন সময় নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম, উত্তর পশ্চিমের সদাশয় ছোটলাট মহাশয় বিভ্রাট মিটাইবার জন্য কমিস্যনের সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মন্দির ভাঙ্গা হইবে না এই রূপ অনুমতি তিনি দিয়াছেন। মন্দিরের যতখানি খোঁড়া হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। যাঁহাদের অদূরদর্শিতায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগকে ধমক খাইতে হইয়াছে। নিরপরাধ কয়েদি-গণও মুক্তি পাইবে। রামজীর মন্দির বাঁচিয়া গেল, আজ এই সংবাদে সমগ্র সহর আনন্দের হিল্লোলে ভাসিতেছে। সকলেই দয়ালু ইংরাজ রাজের গুণ গাথা প্রাণ ভরিয়া গান করিতেছে। ব্রাহ্মণ গণ দুই হাত তুলিয়া গবর্ণমেন্টকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত ভগবানের নিকটে প্রজারঞ্জক গবর্ণমেন্টের শুভ কামনা করিতেছি।

বেদবিদ্যালয়ে চৈত্র মাসের আয় ও ব্যয় (শঃ ১৮১২)।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রী দীননাথ পাত্র রায়পুর হাট্	৩।/০
" ক্ষেত্র বিহারী দাস ঘোষ পিপ্লন, মেমারী	১।/০
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট	২৸৵০
" মহিম চন্দ্র ঘটক ৺ কাশীধাম	৸৵০
" রমণীমোহন বসু দিনাজপুর	৯।৵০
" বিপিন বিহারী রায় গয়া	৵০
" উমেশ চন্দ্র মুস্তফি সুকরিয়া	২৲
" যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় সিরাট	২৲
" গঙ্গাদিনাথ মুখোপাধ্যায় বাঁকীপুর	৫৲
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সৈদাবাদ	৪৸০
" বংশীধর রায় মুর্শিদাবাদ	১৲
" মধুসূদন দাস গোয়াল পাড়া	৩৲
" তারিণী কুমার ভট্টাচার্য্য পাথিরাম	৩।৵০
" মনোহর রায় রুকন্যার	২৲
" চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য গোকুলবাড়ী	২।/০
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ	১/০
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১।৵০
" হরিনারায়ণ চৌধুরী কাশীধাম	।০
" প্রসন্ন কুমার দাস শিলচর	১০৲
" হরিনাথ বসু রাজসাহী	৫৲
" তারক ব্রহ্ম সেন গুপ্ত সাকিরা	৪।৵০
" মাধবমোহন দত্ত ঠাণ্ডাছড়ি, চট্টগ্রাম	৩/০
" উমেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কোলা, ঢাকা	৩৲

এক কালীন দান।

শ্রী রাধাগোবিন্দ দত্ত প্রভৃতি শ্রীহট্ট	১।০
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১৲
" সুরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র দিনাজপুর	৵০
" জনৈক আর্য্য সন্তানেন দাঁইহাট	২৲
" হরিমোহন দে রাম সাই হাট	৭৲
" কমল চন্দ্র ভদ্র শিলচর	১৲
" ঈশান চন্দ্র ঘোষ ৺ কাশীধাম	।১০

মাসিক বৃত্তি।

৺ লবঙ্গ সুন্দরী দেবীর বৃত্তি কাকিনীয়া	১০৲
মোট আয়	৯৩৸/১০

খরচ।

বৃত্তি দক্ষিণা ও গত শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছাত্রাবাসের বাড়ী ভাড়া, চাকরের বেতন ইত্যাদি	২২০৸৵১০
ছাপাই খরচ	৫৲
মাশুল খরচ	।১০
বাজে খরচ	২।/
	২২৮৸/
গত মাসের মজুদ তহবিল হইতে ব্যয়	১৩৪।৵১০

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

২ রা বৈশাখ ১২৯৮।

ধর্ম্ম প্রচারক

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥" শ্রুতিঃ

কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচি।

১৪শ ভাগ। ২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ মাস, শঃ ১৮১৩।

বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

বক্তৃতা।

২য় খণ্ড।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের ২য় খণ্ড বক্তৃতা পুস্তক এতদিনে প্রকাশিত হইল। এবার যে কয়েকটি বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়াছে, সে সমস্তই নূতন। নিম্নলিখিত চারিটি বক্তৃতা এবার সঙ্কলিত হইয়াছে। **প্রবৃত্তি মার্গ, ভারতে উৎসব, নির্জনিকেতন যাত্রা, আঁধারের মাণিক।** এবারকার বক্তৃতা পাঠে ভক্ত ভক্তির অমৃতময় আস্বাদে বিভোর হইবেন ভাবুক কবি উচ্ছ্বাসের লহরীলীলায় নিমগ্ন হইবেন, দার্শনিক তীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রের প্রতিভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন। আশা হীন ভরসা হীন জীব আশ্বাসের অভয় বাণী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত, হইবেন। পুস্তকের আকার ১ম খণ্ড অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। ১১৪ পৃষ্ঠায় পুস্তক পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।।০ আট আনা। ডাকমাশুল লাগে না। ১ম খণ্ডের মূল্য বেশী হইয়াছে এই রূপ অনেকে অনুযোগ করায় ২য় খণ্ডের মূল্য ১ম খণ্ড অপেক্ষা আকৃতি অনুসারে সস্তা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবে।

শ্রী ভূদেব কবিরত্ন
ধর্ম্মামৃত প্রেস
বারাণসী।

মহাত্মা ত্রৈলঙ্গী স্বামীর ফটোগ্রাফ্।

সাধু শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গী স্বামীকে জীবিত কালে অনেকেই দেখিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। তিনি আমাদের সকলেরই প্রণম্য এবং প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহার তেজোময়ী মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিলেও সাধু দর্শনের ফল লাভ হয়। যাহাতে ভক্ত হিন্দু মাত্রেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রাতঃকালে-দর্শন করিতে পারেন তাহার জন্য তাঁহার কতকগুলি ফটো সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য ।৵ ছয় আনা এবং ডাক্ মাশুল ৴১০ অৰ্দ্ধ আনা মাত্র। বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে আমার নামে বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে মূল্যাদি পাঠাইলে ফটো পাইতে পারিবেন। এবং সেই সঙ্গে ৺ অন্নপূর্ণার এক খানি ছোট ছবি উপহার দেওয়া যাইবে।

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

১৪শ ভাগ | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১৩
১ম সংখ্যা | শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥" | জ্যৈষ্ঠ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নং তথা।
কর্ত্তব্যা গ্রয়ণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি চৈব হি ॥

প্রতি বর্ষে সোম যাগ, নবান্নযাগ ও চাতুর্ম্মাস্য কর্ত্তব্য। প্রতি অয়নে কিম্বা প্রতি বর্ষে পশুযাগ বিহিত।

এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।
হীনকল্পং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যে ফলপ্রদম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপ যাগ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে বৈশ্বানর যজ্ঞ করিবে। কিন্তু ইহা হীনকল্প। ধনাদি সাধন বিদ্যমানে হীনকল্প আশ্রয় করিবে না। যে কাম্য কর্ম্মের অধিক ফল, তাহার হীনকল্প কখনই অনুষ্ঠান করিবে না।

চণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাৎ শূদ্রভিক্ষিতাৎ।
যজ্ঞার্থং লব্ধমদদদ্ভাসঃ কাকোঽপি বা ভবেৎ ॥

শূদ্র হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিলে যজ্ঞকারী চণ্ডাল হয়। যজ্ঞের জন্য প্রাপ্ত অর্থ যজ্ঞোদ্দেশে দান না করিলে শকুন্ত কিম্বা কাকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

কুশূলকুম্ভীধান্যো বা ত্র্যাহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ ॥

শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা (পতিত ধান্য কুড়াইয়া ভোজন) যে ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি তিন দিনের অন্ন সঞ্চয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এক কলস ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এক গোলা ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ন স্বাধ্যায়বিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ।
ন বিরুদ্ধপ্রসঙ্গেন সন্তোষী চ সদা ভবেৎ ॥

স্বাধ্যায় বিরোধী অর্থোপার্জ্জনে বিরত থাকিবে। অযাজ্য যাজনাদি ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না। সদা সন্তোষ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দাম্ভিহৈতুকপাষণ্ডবকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, রাজা অন্তেবাসী ও যজ্ঞ করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ধন ভিক্ষা করিবে। দাম্ভিক হৈতুক বাদপরায়ণ পাষণ্ড

নাস্তিক ও বকধার্ম্মিক প্রকৃতির লোকদের নিকট হইতে কখনও কিছু ভিক্ষা করিবে না।

শুক্লাম্বরধরো নীচ-কেশ শ্মশ্রুনখঃ শুচিঃ।
ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীয়ান্নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ॥

শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে। কেশশ্মশ্রু নখ ইহাদের কর্ত্তন করিবে। স্ত্রীর সম্মুখে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া, কদাচ ভোজন করিবে না।

ক্রমশঃ।

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি।

(সত্য ঘটনা সম্বলিত)

"শ্রীরাম প্রসাদে রটে,
মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি মেলি দেখ মা'কে,
তিমিরে তিমিরহরা॥"

মা থাকিতেও আমি এক রূপ মাতৃহীন। এক রূপ কেন, অনেক সময় মনে হয় সত্য সত্যই বুঝি মা নাই। মা খেতে পরতে দেন বটে কিন্তু বড় একটা ছোঁয়া খাওয়া দেন না এমন কি সর্ব্বদা কাছে থাকিয়াও একবার চোখের দেখা দেন না, তাই ভাবি—

"মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তবে কি ফল বলনা।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।"

মা যে একেবারেই কাছে আসেন না এমন নয়, কিন্তু যে সময় আসিলে আমি বুঝিতে পারি তখন কোন রূপেই আসেন না। এক লোকের মা দেখিলাম কিন্তু আমার মার মত মা কাহারও নয়। ছেলে জাগিলেই সকলের মা কাছে আসিয়া কোলে করেন কিন্তু আমার মার সকলই উল্টো, আমি জাগিয়া থাকিতে তিনি ভ্রমান্তেও কাছে আসিবেন না—দেখাও দিবেন না কিন্তু শুনিতে পাই আমি ঘুমাইয়া গেলেই তিনি আসিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লয়েন *। অনেক সময় শুনিয়া অনেকটা আশা হয়, ভরসা হয় কোন দিন না কোন দিন দেখিতে পাইব, মনে মনে ভাবি এক দিন হঠাৎ জাগিয়া মাকে দেখিয়া ফেলিব (?) কিন্তু কই সে আশা তো অদ্যাপিও পূর্ণ হইল না, মনের ইচ্ছা মনেই মিশাইতে চলিল। ভাবিতে ভাবিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ কে আসিয়া বলিল, মা আসিয়াছেন। আমি চমকিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, তবে কি আমি এখনও জাগিয়া আছি! কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ আর তখন সে ভাবনা না ভাবিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, পথে অনেকেরই মুখে [যাহারা মাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে] মায়ের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল, বেগে দৌড়িতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও মায়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু মার কাছে গিয়া দেখি আমার সব আশাই ফুরো! কত কথাই বলিব মনে করিয়া গিয়াছিলাম এখন সে কথা দূরে আস্তাম্ যা দেখিতে গিয়াছিলাম তাহাও হইল না, দেখিলাম মার কেবল কতক গুলি সাজ সজ্জা রহিয়াছে, ভাবিলাম, লোক গুলো কি এই দেখিয়াই ফিরিয়া গেল, সাজ দেখিয়াই ভুলিয়া গেল, ইহাদের এত দূর আশাই তবে সার। তখন সে বাটীর লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম কৈ যাহা দেখিতে এলাম তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না, এ ত কেবল সাজ গোজ দেখিতেছি। তাঁহারা কুবেরের দোষ দিয়া বলিলেন যে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা মাকে দেখাইবার কোনও

---

* সুষুপ্তি অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না থাকায় এবং অবিদ্যায় মনের লীনতা বশতঃ জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলন হইয়া থাকে, এই জন্য এই অবস্থায় একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব হয়; কিন্তু অবিদ্যা আবরণ বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ উপলব্ধি হয় না নতুবা সুষুপ্তি অবস্থাতেই প্রত্যেকের স্বরূপসাক্ষাৎকার হইত।

উপায় করিতে পারিলেন না, সমস্তই সাজে ঢাকিয়া গিয়াছে। এইরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পরস্পর কথার কথায় সর্গভিব্যহারী জনৈক মাতৃভক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইতি পূর্ব্বে সেই নবদুর্ব্বাদল-শ্যামা মুক্তকেশী মূর্ত্তি ঘোর মেঘবর্ণা দেখাইল কেন? তিনি বলিলেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য" চোখের দেখা কেবল কথার কথা, ভাবের দেখাই দেখা। মনে হইল হরি, হরি, সব ফাকি, কোনটাই কিছু নয়। চিত্রকরের কি চাতুর্য্য, মায়ার কি মনভুলান মহিমা, সব ভুলাইয়াছে, এমন সাজে সাজাইয়াছে, যে আসলের আদৌ অস্তিত্ব বোধ হয় না—অলঙ্কারের এতই ঔজ্জ্বল্য যে স্বর্ণের অনুমান মাত্রও উপলব্ধি হয় না। ভ্রমে লোককে ভুলাইয়া দেখা এযে দেখিতেছি "ভ্রম" দেখাইতে গিয়া লোকে আপনি ভ্রমে পড়ে, দিক্ ভ্রম হইয়া লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে। ভাবিলাম—

"বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, সড় দর্শনের অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা, মূলা, খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা॥"
(রামপ্রসাদ)

তখন ভক্তিমান্ ভাবুক বলিলেন—

"সে কেমন কে জানে তারে,
যেমন তারা তেমনি ভাল।
মায়ের অভয় চরণ ভাব রে মন,
অনুমানে তাঁর কি কাজ বল॥
নীল পীত সিত অসিত বর্ণ,
কি রূপ কি গুণ কে জানে অন্য।
ধন্য ধন্য রূপ লাবণ্য
ভব ভেবে যারে পাগল হল॥
পুরুষ প্রকৃতি অথবা শূন্য,
সেই যে সকল সকলি ভিন্ন,
স্বভাবে নির্ম্মল, সে কথায় কাল"॥
[কহে] কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব,
অনুমানে কেবা জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই,
নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥*

আমি ব্যাকুল হইয়া তখন জিজ্ঞাসা করিলাম কৈ কোন স্থানেই তো মাকে দেখিলাম না? তিনি বলিলেন সর্ব্বত্রেই তো মা রহিয়াছেন কিন্তু কুবেরের রাজসিক সাজে [মায়িক নাম, রূপ] মায়ের গা ঢাকিয়া গিয়াছে, নন্দীর মত একমনে ভক্তি ভাবে কমল কুসুমে (সাত্ত্বিক ভাবে) না সাজাইলে সে হেমবরণ চরণ প্রভা (অস্তি-ভাতি প্রিয়রূপ) ফুটিয়া উঠিবে না।

ভাবিলাম তবে মায়ের কোন্ বাড়ীতে যাই। সাধক তখন ভগবদ্বাক্যের অনুবাদ মাত্র করিয়া বলিলেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

শুনিয়া মনে হইল কি ভুলই করিয়াছি! এ তো অন্ধকারে হাতড়াইতেছি, তাকাইতে ২ চোক ফাটিয়া গেল, কিন্তু দেখার সুখ মিটিল না যাহা দেখিতে আসিলাম তাহা তো দেখা হইল না! এতদিন ভুলে যাহা আলো ভাবিতেছিলাম তাহা তো তবে অন্ধকার!

সাধক আবার বলিলেন—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতাঃ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

এই কথায় প্রাণ একেবারে শুকাইয়া উঠিল, যে আশা টুকু ছিল তাহাও উড়িয়া গেল। একটা সূর্য্যের দিকেই তাকাইতে পারি না, জন্মের মধ্যে সূর্য্যই একবার চোখ ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না, তবে আর মাকে দেখা হইল না, এ চোখে তো অত রূপ ধরিবে না!!!

সাধক তখন আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন এই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

* কুবের! দেখরে নয়নে! কি শোভা হয়েছে (রক্ত চন্দন আর জবা) রাঙ্গা চরণে। যে পদে হয় মোক্ষপদ, সাধকের সাধন পদ, সাজবে কিরে ঐ শ্রীপদ স্বর্ণ ভূষণে॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

সাধন রাজ্যের হরিভক্তের সুগম পথ না জানিলে মহামায়ার মায়া পুরাণ নিগূঢ় পথ দিয়া মায়ের বাড়ী যাওয়া যায় না—তত দিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না, মা কাছে থাকিলেও ছেলে ঘুমের ঘোরে একলা আছে ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠে। অন্তরে না জাগিয়া মোহমলিন চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেবল বাহিরে জাগিলে (বাহ্য দৃষ্টি থাকিলে) মাকে দেখিতে পাইবে না—কাঁদিতেই কাল কাটিয়া যাইবে। সাধকসন্তান চিরদিনই মার কোলে জাগিয়া খেলা করিতেছেন কেবল কতক গুলো জন্মান্ধ পড়া পাণ্ডিত সাকার নিরাকার লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে, আলোয় অন্ধকার দেখে দেখতে পায়না তাই নিরাকার বলে। সে আকার যে কি প্রকার তা এ বিকারযুক্ত চোখে বুঝা যায় না। যাহারা কিছুই দেখিতে পায় না তাহারা কেবল বাহিরে জাগিয়া আছে পশ্চাতে আলোক রাখিয়া দেখিতে চাহিতেছে, সম্মুখে যে আপনার ছায়ায় [অহংকার] "কোলের কাছে কেবল আঁধারে" হইয়াছে তাহা জানিল না। তাই কাঁটায় পড়িয়া যায় তাই তাহারা "চোখ থাকতে কাণা"। সাধক পাঠক! এ কথার এই খানেই ইতি করা ভাল। সাকার নিরাকারের গভীর রহস্য এই খানেই বুঝিয়া লইবেন অন্যের কাছে এ সকল কথা কেবল কথার কথা। সাধন তত্ত্বের কথা সাধারণের সমক্ষে একরূপ "দিল্লীকা লাড্ডু" বলিলেই বোধ হয় তাই ভাল, আর বেশী কথায় কাজ নাই তাহাতেও—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

"কেমন বলিবে বল কিরূপা তিনি। (ও মন) তুমি পারিবে চিনতে কি চিন্তামণি [যে যে চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি]।

তিনি সাকার কি নিরাকার, ও মন কেবা তত্ত্ব জানে তার, সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি (তিনি)।

তাই—

পরিব্রাজক বলে চাও যদি কেউ মাকে দেখিতে।
তবে নিজের ঘরের উল্টো কপাট হবে খুলিতে॥
মায়ের যে পূর্ণ বিকাশ রংমহলের উপর তলাতে।

"খুঁজিস মাকে আশে পাশে, মা যে রে তোর ঘরে বসে দেখেও দেখিস্ না। তোর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই, তবু দেখলি না। ওরে তুই যে মায়ের কোলে বসে ফিরে তাকানা। প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে। সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

দুঃখ।

দুঃখই সংসারের একমাত্র বিভীষিকা। সব কিছু উদ্যোগ, চেষ্টা, ভাবনা, উদ্বেগ এবং পরিশ্রম সকলই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। মনুষ্য অসাধ্য সাধন করিতেছেন, গিরি লঙ্ঘিতেছেন, সাগরের তলস্পর্শ করিতেছেন, কেবল দুঃখকে দূরে রাখিবার জন্য। "চির দুঃখী হও" ইহার ন্যায় মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত মনুষ্য সমাজে আর নাই; মহা শত্রু না হইলে এমন গালি দেয় না। মৃত্যু এত আশঙ্কার ব্যাপার হইত না যদি উহাকে আমরা অনন্তদুঃখ—সংযোগ বলিয়া না জানিতাম। কিন্তু দুঃখ কি; কাহাকে দুঃখী বলিতে পারি? কে-জানে কি! তুমি, আমি দেশ শুদ্ধ লোক এক সময়ে না এক সময়ে দুঃখের আস্বাদ পাইয়াছি, দুঃখী হইয়াছি; পরন্তু সাধারণতঃ দুঃখ পদার্থটা কি তাহা বলা অতি কঠিন। যে দেশে দুঃখ নাই, সে রাজ্যের প্রজা দুঃখ কাহাকে বলে জানে না, কখনও কোন দুঃখী হতভাগাকেও দেখে নাই, তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাইব দুঃখ কি। যাহা হইলে তুমি নিজেকে দুঃখী মনে কর, হয়ত আমি তেমন টি হইলে মহা সুখী হই, আবার তোমার সুখের

উপাদানকে অন্যে নাক্কারজনক বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে। ধনী শীতকালকে সুখের—বিলাসের সময় বলিয়া মনে করে, দুঃখী দরিদ্র গ্রীষ্মসমাগমে নিশ্চিন্ত হয়, তখন আর বস্ত্রাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। চাষা বুকড়ী চালের ভাত খাইয়া, হুড়ুক টানিয়া আম গাছের তলায় মহাসুখে নিদ্রা যায়, আর লক্ষপতি দুগ্ধফেননিভ কার্পাস-শয্যায় শয়ন করিয়া অনিদ্রায় উন্মস্তিষ্ক হইয়া শিরঃপীড়ায় ব্যথিত হয়েন। কিন্তু লক্ষপতি ধনীকে যদি বলা যায় যে আপনি প্রগাঢ় নিদ্রার প্রার্থনা করেন, আপনি চাষার ন্যায় লুণ মাখিয়া বুকড়ী চালের ভাত খাইয়া, হুড়ুক টানিয়া এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আমের শীতলছায়ায় গিয়া শয়ন করুন, আপনার দুঃখ দূর হইবে, আপনি নিদ্রিত হইবেন। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মহত্যা করা সহজ মনে করেন এবং এমন ভীষণ চিকিৎসা দূরে নিক্ষেপ করেন। যাহা চাষার পক্ষে সুখ অথবা সুখের কারণ, তাহা ধনীর ভীষণ দুঃখ। তবে কি বলিব যাহাতে লোকে অসুখী হয় তাহাই দুঃখ। গৌতমের ন্যায়সূত্রে আছে যে "বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি" [১অ, ১আ, ২১স] দুঃখের লক্ষণই বাধা। বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি এবং অন্যবিধ শারীর এবং মানসিক চেষ্টা বাধিত অথবা রুদ্ধ হইলে দুঃখ হয়। আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাই, অথবা ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তির পথে যদি কিছু বাধা কিম্বা বিপদ্ ঘটে তবেই আমি দুঃখিত হই, মর্ম্মাহত হই। শিশু জল কাদা লইয়া খেলিতে চায়, প্রাপ্তি মাত্রেই সকল পদার্থই বদনে দেয়, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের দুই এক খানি পাতা চিবাইয়া ভোজন করিবারও এক ২ বার চেষ্টা করে; কিন্তু তুমি তাহার পিতা, বালকের অমঙ্গল ভাবিয়া তাহাকে এই সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর; কিন্তু সে তাহা বুঝে না, মনে ২ অতিশয় দুঃখিত হয়। শেষে মনের বেগ না সামলাইতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভিতরে যখন কোন একটু চেষ্টা হয়, যখন আত্মার শক্তি সকল বহির্ম্মুখী হয়, প্রত্যেক স্নায়ুতে একটা যেন তড়িদ্বেগ প্রবাহিত হইতে থাকে, আবেগ এবং উদ্বেগজনিত উৎকণ্ঠায় মন সদাই চঞ্চল থাকে, আশার সামগ্রী পাইবার জন্য আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া আমরা কার্য্য করিতে থাকি। মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি যেন তদাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন যদি কোন অননুভূত অজ্ঞেয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদের আশাপথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, আর যদি বুঝিতে পারি যে শতচেষ্টা করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে না; তাহা হইলেই যে সকল আত্মশক্তি আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, যে চেষ্টার জন্য আমরা উৎকণ্ঠার ঘোরে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহারা যেন স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাহারা বাহিরের কার্য্যে শতমুখী হইয়া প্রধাবিত হইয়াছিল তাহারা হঠাৎ প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে শরীরেতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শরীর এবং মন, কিন্তু এই সংপ্রবাহিত বেগকে মধ্যপথে সম্বরণ করিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে শক্তি শক্তিদ্বারাই স্তম্ভিত এবং পরাভূত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কার্য্যশক্তিকে আত্মস্থ করিতে হইলে, আত্মার আর এক স্বতন্ত্র শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। প্রথম চেষ্টায় এবং উদ্যমে শরীরের অর্দ্ধ শক্তি ক্ষীণ এবং হীন হইয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন এবং বিপরীত শক্তির উদ্ভাবনায় যে আয়াস টুকু করিতে হয় তাহাতে আরও যেন মন ও স্নায়ুমণ্ডলী এলাইয়া পড়ে। এই বাধাগ্রস্ত এবং শক্তিহীন অবস্থাই দুঃখ। প্রবাসী বাঙ্গালী বাবু ছুটী লইয়া বাটী আসিবেন। অনেক দিনের পরে দেশে ফিরিতেছেন, তাই তথাকার নানাবিধ নূতন সামগ্রী সকল ক্রয় করিতেছেন, স্বর্ণগহনাও দুই এক খানা প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন, স্বর্ণকারের বাটীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন, এবং একখানি ছুটীর দরখাস্ত

করিয়াছেন, বড়বাবু সুপারীস করিয়া বড় সাহেবের নিকট উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, সাহেবও প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সকলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, উৎকণ্ঠায়, আবেগে বাবু এখন যাইবার দিন গণিতেছেন, ক্রমে অবসরের দিনও নিকট হইল, বাবু বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিদায় লইয়া আসিলেন; এমন সময়ে যদি তাঁহার জ্বর হয় এবং ডাক্তারে বলে যে তিনি কোন ক্রমেই দেশে যাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দুঃখে হতাশে শরীর যেন অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে। এই বাধিত অবস্থাই দুঃখ। স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বিপরীত যাহা তাহাই দুঃখ। অর্থাৎ স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বেগ অপ্রতিহত থাকিলে লোকে সুখী হয়। সুখ জীবনের সহজাবস্থা, দুঃখ বাধিত এবং বিরুদ্ধাবস্থা। তাই বলিয়াছিলাম যাহাতে লোকে অসুখী হয় তাহাই দুঃখ।

জিজ্ঞাসা করি যদি প্রবাহিনী সমতল ক্ষেত্রমধ্য দিয়া, সহজে বিনা বাধায় বহিয়া সাগরে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে উহা বেগবতী হইত কি না? তাহা হইলে উহা গভীর খাদ বাহিয়া গ্রাম, নগর পল্লী সকলকে সঞ্জীবন প্রদান করিয়া, স্নেহ-স্নিগ্ধ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে ছুটিতে পারিত,কি না? মনে হয় পারিত না। শক্তি বাধা না পাইলে সঞ্চিত হয় না, আবার সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত বেগবান্ অন্য কিছুই নাই। সুতরাং গতি, বাধিত শক্তিতেই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে শক্তি সংবদ্ধ, রুদ্ধ, সংপিষ্ট অথবা দুঃখিত তাহাই প্রবল প্রকাশশালিনী। এবং প্রবলতা না থাকিলে শক্তি কার্য্যহীন স্থাণু। তবেই বলি না কেন দুঃখ না পাইলে শক্তি প্রকাশিতা হয়েন না। বিন্দু ২ জল পর্ব্বত-পঞ্জরে সঞ্চিত হইয়া ধীরে ২ পাথর-চাপা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রজত সূত্রধারে গলিয়া পড়িতে লাগিল, তাহারা উপলখণ্ডের উপর পড়িয়া উলটি পালটি খাইতে লাগিল, দুঃখে যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল; শেষে পরামর্শ করিয়া দশজনে এক হইয়া প্রস্তর রাশির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া একটু সমতল ক্ষেত্রে অনায়াসে বহিয়া যাইতে পাইল, আবার বাধা, আবার বন্ধুর ভূমি, কত স্থানে বিশ্রামহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া স্থির হইয়া ব্যয়িত শক্তি পুনঃ সঞ্চয় করিল, এত পরিশ্রম চেষ্টা, উদ্যম, চিন্তা, ব্যথা, উৎকণ্ঠা কাটাইয়া, তোমার আমার ন্যায় তৃষিত কাঙ্গালগণকে স্নিগ্ধতা বিলাইয়া, নির্ম্মল পানীয় দান করিয়া, সঞ্জীবিত করিয়া, দুঃখে, কষ্টে তরঙ্গিনী তবে মহত্তর—বিশালের অঙ্গে মিশাইয়া যায়। তবে কি দুঃখই নদী সকলের উপাদেয়তার আদি কারণ?

তোমার আমার ক্ষুদ্র ২ জীবনেও কি এই মহাতত্ত্বের উপকারিতা দেখা দেয় না? দেয় বৈ কি! সে জীবন জীবনই নহে যাহা দুঃখের—দারিদ্র্যের অগ্নি-পরীক্ষায় নির্ম্মলীকৃত না হইয়াছে। সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে যে সদা সুখের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত—নিদ্রিত থাকে। সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে যাহা অভাবের পেষণে সুশাণিত না হইয়াছে। যেমন নদীজল বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনুষ্য প্রকৃতি দুঃখ দৈন্য দরিদ্রতার বিষম বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়। গভীর নদী পূতসলিলা, গভীর প্রকৃতি পুণ্য পরিমলযুক্তা। মনুষ্য চিরসুখী হইলে উদ্দেশ্যহীন, দিশাহারা হয়। নদী সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছিলে ছড়াইয়া পড়ে, স্থানে অস্থানে ঢলিয়া যায়, গোষ্পদ-গভীর হয় মাত্র। যে খানে গভীরতা নাই, প্রনালী বদ্ধ কার্য্য নাই, বেগ নাই, অধ্যবসায় নাই সেখানে উদ্দেশ্য সাধন হয় না, সে খানে বাস করিলে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়, সে দেশ যবন দেশ, নরকজ্ঞানে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। দুঃখ আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়, সংসারের অসারতা অলীকতা দেখাইয়া

মহান্ বিশাল প্রকাণ্ড অনন্তের মধ্যে ডুবিতে ইঙ্গিত করে। সংসারে কত বাধা পাও, কত ব্যথা পাও, যাতনায় মুখে রক্ত উঠিতে থাকে, দশদিক্ শূন্য দেখ, তবুও যেন মনে হয় কে বুঝি কানের কাছে চুপি২ বলিতেছে যে যাহা খুঁজিতেছ তাহা এই অনতিদূরেই অবস্থিত। দুঃখের বিরাট জ্বালায় যখন প্রবৃত্তি বাসনাবিলীন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায় তখন কে যেন স্বপ্নের ঘোরে বুঝাইয়া দেয় যে আমার শীতল সাগর সঙ্গম এই দৃষ্টির ভিতরে আসিয়াছে। বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য, সাহস, উদ্যম এবং ভরসা কোথায় পাইতাম যদি সংসারে দুঃখ না থাকিত, যদি লোকে দুঃখের বজ্রসূচি বিদ্ধনে উন্মত্ত উদভ্রান্ত না হইত। যদি বুঝি আমরা দুঃখী তবেই স্থির-শান্তি ও সুখের উৎস ফুট২ হইয়াছে। আমাদের দুঃখের উপাদানের অভাব নাই। যাতনাদায়ক অনুপান সংগ্রহ হইয়াছে, এখন বুঝিতে হইবে, প্রাণে২ ব্যথিত হইয়া, মর্ম্মে২ আঘাত পাইয়া অনুভব করিতে হইবে আমরা দুঃখী—চিরদুঃখী—মহাদুঃখী। তীব্র অনুভূতি হইলেই প্রবাহ আসিবে। সে কোটাল বাণে সব ভাসিয়া যাইবে, জীবনদী উজান বহিবে, মহাসাগরের শীতল জলে দুঃখদাবদগ্ধ হিন্দুহৃদয় কৃতার্থ হইবে। তবে কেন দুঃখকে ভয় করি, কেন দুঃখী দেখিলে সরিয়া দাঁড়াই! এস দুঃখ! ভারতের আপাদমস্তক তোমার বিষম বিষবেদনায় ব্যথিত করিয়া দেও, তোমার তাড়নায় লোকে যেন অস্থির—উন্মত্ত হইয়া উঠে। এস তুমি, সর্ব্ব মঙ্গলবিধাতা, সর্ব্ব সম্পৎদাতা! ভারতের গৃহে ২ আসিয়া দেখা দেও! রাজা, মহারাজা, নবাব, উজীর, ছোট, বড়, ধনী নির্ধনী সকলকে তোমার তড়িৎশক্তি দ্বারা বিকম্পিত করিয়া দেও। এ অসাড় নিষ্পন্দ জাতিকে উদ্যম দেও, উত্তেজনা দেও, উন্মত্ততা দেও।

তীর্থযাত্রা।

হরিদ্বার-কুম্ভমেলার বিবরণ গত বারের "ধর্ম্ম-প্রচারকে" মান্যবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে পাঠকবর্গ বিদিত হইয়াছেন। কুম্ভযোগের স্নানের দিন মা ভাগীরথীর বিশেষ করুণা দেখা গিয়াছিল। দিবাভাগে তপন তাপে বালুকাময় হরিদ্বারক্ষেত্র কৃশানু কণিকাবৃতবৎ ও বায়ু মণ্ডল জ্বালামালাপূর্ণ বোধ হইত। স্নানের দিন সুবিপুল জনতায় ভক্তগণের অতিশয় ক্লেশ হইবে জানিয়াই মা সে দিন অতি প্রত্যুষ হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত আকাশমণ্ডল অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্নানার্থীগণের প্রতি মায়ের এরূপ দয়া না হইলে কত লোক যে শর্দ্দি গর্ম্মিতে প্রাণ ত্যাগ করিত, তাহা বলা যায় না। অতি জনতাপূর্ণ তীর্থে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য রাজকীয় সুব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছ ও মুশলমান প্রহরী গণ গঙ্গাতীরে প্রহরী থাকায় স্নানার্থীগণ অস্পৃশ্য স্পর্শ বশতঃ পূতশরীরে নিজ নিবাসে যাইতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট হিন্দুতীর্থে ঈদৃশ পর্ব্বকালে কেবল হিন্দু প্রহরীর ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় যাত্রীদিগের রেলওয়েতে বড় কষ্ট হইয়াছিল, হরিদ্বার হইতে নিয়মিত দৈনিক গাড়ী ব্যতীত ২০০ স্পেশিয়াল ট্রেন চলিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত প্রায় ১৫ দিন সকল ট্রেনেই অতিরিক্ত যাত্রীর ভীড় হইয়াছিল।

হৃষীকেশ।

হরিদ্বারে স্নান ও শ্রীগুরু চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া প্রাচীন তপোভূমি হৃষীকেশ দর্শনে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ অন্যূন ১২ ক্রোশ হইবে। সৎ সমভিব্যাহারী বর্গ সহিত নানা প্রসঙ্গে সদালাপ করিতে ২ এই পথ টুকু পদব্রজে দুইদিনে গমন করিলাম। পথে পাহাড়, বন ও অনেক গুলি নদী অতিক্রম করিতে হয়। দুইটি নদী অতি খরতর বেগ-

বড়া স্ফটিক স্বচ্ছ জল কল কল কল্লোলে নাচিতে ২ ছুটিয়াছে। বনে বনকুক্কুট ও ময়ূরের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়, বন ফুলের মনোহর সৌরভ ভুর ভুর করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অল্প পথে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও সেতু এবং পথের মধ্যে ২ কয়েক স্থানে যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান ও ধর্ম্মশালা আছে। হৃষীকেশ, হরিদ্বারা ভাগীরথীর তটভূমি। এখানে বহু শত সাধু শান্ত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একান্তে বাস করিয়া থাকেন। ৫। ৭টি সত্রালয় থাকা বশতঃ সাধু সন্ন্যাসী গণের ভিক্ষার কোন রূপ অসুবিধা হয় না। আমরা চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের নিকট একটি কুটীরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, দেখিলাম সেখানেও একজন সাধু প্রত্যহ শতাধিক অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসীকে সাদরে উত্তমরূপে ভোজন দিতেছেন। হৃষীকেশ মন্দিরের সমীপে, "কম্বলিয়া বাবা" (ইনি কৌপীন ও একখানি কম্বল ব্যবহার করেন) নামক একজন পরমহংস অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় শিষ্টাচারী, মৃদু মধুর ভাষী ও বিবেক বিচারবান পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার অত্যন্ত অনুরোধে কয়েক ঘণ্টা তাঁহার ধর্ম্মশালায় আমরা বিশ্রাম করিলাম। তিনি অতি যত্ন সহ আমাদিগকে পুরী, মোহন ভোগ আদি ভোজন করাইলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত অনেক সদালাপও হইল। এই স্থানে গোরক্ষিণী সভার তুমুল আন্দোলনকারী শ্রীমান স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সদ্যুক্তিপূর্ণ সদালাপ হইল। গোরক্ষার জন্য বিলাতে মহা আন্দোলন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তথায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কম্বলিয়া বাবা তাঁহাকে শান্ত ভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ করিলেন।

হৃষীকেশের মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও রমণীয়। স্থানটিতে গমন ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে প্রাণ মন জুড়াইয়া যায়। শঙ্খ, চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শনে হৃদয় শীতল হইল;

[illegible]

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

হৃষীকেশ পূর্ব্বে যেমন বিজন তপোবন ছিল, এখন "সদাব্রত" আহারের ব্যবস্থা থাকায় অনেক রকমের সাধুর বিপুল সমাগমে স্থানটি কিছু জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাচ প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইলে হৃদয় মধ্যে ভগবৎ ভাবাবেশের তীব্র অঙ্কুর সঞ্চার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

তপোবন

হৃষীকেশ হইতে লছমন ঝোলা পর্য্যন্ত ভাগীরথী তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান টুকুর মত পরমানন্দকর মনোহর দৃশ্য আর কখনও কোথাও দেখি নাই। বন, পর্ব্বত, শুভ্র বালুকাময়ী সৈকত ভূমির মধ্য চারিণী, পতিত পাবনী সুরধুনীর কল কল নিনাদে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হয়, প্রাণ মন নাচিয়া উঠে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই অনেক ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। একান্ত বন মধ্যে গঙ্গার তীরের পর্ণকুটিরে সাধু মহাত্মা গণ নিবাস করিয়া থাকেন। সেখানে বিবাদ, বিসম্বাদ, দ্বেষ, হিংসা, খলতা, কলহ নাই—আছে কেবল গঙ্গার কল কল কল্লোল, স্বচ্ছ শীতল সলিলের হিল্লোল আর আছে পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমস্তক সৌম্য মূর্ত্তির কায়া, বিজন বনের কুসুমদামামোদিত পত্র পল্লব শোভিত তরু রাজির বিকাশময়ী ছায়া। কুটির-নিবাসী সন্ন্যাসী যোগী গণের এই পবিত্র আরাধনা-ক্ষেত্র দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। পথিমধ্যে শত্রুঘ্ন ও বদরী নারায়ণের মন্দির,—দেখিতে অতি সুন্দর। এ স্থানটী পরিশ্রান্ত পথিকের পবিত্র বিশ্রাম ভূমি। এই তপোবন অতিক্রম করিয়া কেদারনাথ বদরী নারায়ণ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী আদি দুর্গম তীর্থ দর্শনে যাইতে হয়।

লছমন ঝোলা।

কথিত আছে, রামানুজ লক্ষণ তীর্থযাত্রা কালে এই স্থানে ঝোলা রাখিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপোবন হইতে কেদার নাথের পার্ব্বত্যপথ ধরিতে হইলে পার্ব্বতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহিত প্রবল ধারা পার হইতে হয়। এ স্থান নৌকায় পার হওয়া যায় না। এই জন্য এত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তটে সুদৃঢ় দারুস্তম্ভে অতিশয় স্থূল রজ্জু রাজি রচিত সেতু নির্ম্মিত ছিল; লোকে তাহারই উপর দিয়া গঙ্গাপার হইত, সেতুর মধ্যস্থলে গমন করিলে সেতু অতিশয় দুলিত, নিম্নে সুগভীর গঙ্গার দিকে তাকাইলে শরীর কাঁপিয়া উঠিত, মস্তক বিঘূর্ণিত হইত; এই জন্য এই স্থানটি পারগামী গণের পক্ষে অতিশয় দুর্গম ছিল। অনেকে সাহস পূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া যাইতে পারিত না। গো মহিষাদির পক্ষে পর পারে গতি নিরতিশয় ক্লেশকর ছিল, তাহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া পর পার হইতে বলবান লোকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিত, তবে তাহারা পার প্রাপ্ত হইত; গঙ্গার দুর্নিবার্য্য প্রবল বেগে সন্তরণ কোন কার্য্যকারী হয় না, কত পশু কত মনুষ্য সেই প্রবল ধারায় যে প্রাণ পরিত্যাগ করিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু এক্ষণে সে সকল আশঙ্কা মিটিয়াছে। পুণ্যাত্মা সূর্য্যমল শিব প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৫ হস্ত। এক্ষণে মনুষ্য পশ্বাদি অনায়াসে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সেতুর বিনির্ম্মাতা মহাত্মা যে লোকের কিরূপ আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি কথা হিন্দুগণ শত মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা যখন লছমন ঝোলায় গিয়াছিলাম, তখন কেদার নাথ আদি যাইবার পথ, উন্মুক্ত হয় নাই। রাজকীয় প্রহরীগণ তীর্থযাত্রী গণকে আর অগ্রসর হইতে দিতেছে না। তথায় আমরা এক রাত্রি বাস করিলাম ও ক্রুণ ঘাটে স্নান করিয়া এবং লক্ষ্মণ (লছমন) জীর প্রতি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃষীকেশে ও হৃষীকেশ হইতে হরিদ্বারে গুরু স্বামী মহারাজের আশ্রমে পুনরাগত হইলাম।

জ্বালামুখী।

হরিদ্বার হইতে রেল পথে রুর্‌কি আসিলাম। তথায় কয়েকজন বাঙ্গালী বিষয় কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন। রুর্‌কির কলেজ ও জলের নহর আদি দেখিলাম। যে স্থানে নদীর উপর সেতু করিয়া প্রবল বেগে গঙ্গার নহর চলিয়াছে, সেই দৃশ্যটি দেখিতে অতি সুন্দর। নদীর উপর নদী দেখিয়া মনে বড় উল্লাস হইল। এই গঙ্গার নহর হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া কোথাও কোন নদীর উপর দিয়া এবং কোথাও কোন নদীর নিম্ন তল দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার কাণপুরে আসিয়া ভাগীরথী সহ সম্মিলিত হইয়াছে। রুর্‌কি হইতে রেল পথে জলন্ধরে আসিয়া নামিলাম। জলন্ধর হইতে এক্কা বাহনে হুঁশিয়ারপুর ও তথা হইতে পাহাড়ে ২ জ্বালামুখীর পথে চলিলাম। প্রথমে একটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মৃন্ময় পাহাড় ও তাহার পর প্রস্তরময় পাহাড় অতিক্রম করিয়া জ্বালামুখী পাহাড়ে আরোহণ করিতে হয়। পাহাড়ে চড়াই ও উতরাই (উঠিতে ও নামিতে) যে ক্লেশ তাহা অবর্ণনীয়। পথ পার্শ্ববর্ত্তী সুগভীর শৈলতল-ভূমির দিকে তাকাইলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। শুনিতে পাই গোযান অশ্বযান সহিত কত লোক এই গভীর খড্ডে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পথে যে যে স্থানে জলাশয় বা জল প্রবাহ নাই, সেই ২ স্থানে পাহাড়ী পুণ্যাত্মা লোকে পিপাসার্ত্ত পথিক গণের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫।৬ ক্রোশ অন্তর এক এক "পড়াও", এই সকল স্থানে দোকান ও পথিক দিগের থাকিবার স্থান আছে। কোথাও ২ বা ৩।৪ ক্রোশ অন্তরও বিশ্রাম স্থান ও ধর্ম্মশালা আছে। পাহাড়ে ২ গবর্ণমেণ্ট "ধর্ম্মশালা"

" পালমপুর," " ডালহৌসী," " পাঠানকোট " পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই পথ দিয়াই যানাদি গমন করে, কিন্তু পাহাড়ী গণ প্রায়ই প্রাচীন পাকদণ্ডীর দুর্গম পথ দিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহাতে একটু স্থান সকল নিকট হয়। ৩ দিনে আমরা জ্বালামুখী পাহাড়ে পৌঁছিলাম। জ্বালাজী একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, মা দাক্ষায়ণীর জিহ্বা-পীঠ।

মার মন্দিরটি অতি সুন্দর মর্ম্মরাদি খচিত ও মন্দিরের উর্দ্ধাংশ মহারাজা রণজিৎসিংহের প্রদত্ত স্বর্ণাচ্ছাদনমণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দেওয়ালে মা জ্বালাদেবীর অগ্নিশিখা স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। চারিদিকে নীল আভা, মধ্য ভাগে জ্বলন্ত শিখা দীপ্তি পাইতেছে। লোকে সেই খানে পুষ্প, পেড়া, বাতাসা আদি দান করিতেছে। কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া গেলে অবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া থাকে। মন্দিরের বাম কোনে হিংলাজ শিখা লক্ লক্ করিয়া প্রবল ভাবে জ্বলিতেছে। লোকে ঘটি বা বাটীতে দুগ্ধ দিবা মাত্র ঐ শিখা তন্মধ্যে আসিয়া পড়ে ও দুগ্ধাদি পান করিতে থাকে; কিঞ্চিদবশেষ থাকিলে লোকে প্রসাদ লইয়া আসে। মন্দির মধ্যেই হোমকুণ্ড, তাহার ভিতর একটি প্রবল ও আর কয়েকটী সামান্য২ শিখা জ্বলিতেছে। লোকে সেই খানে হবনাদি করে। মন্দির মধ্যে কোন সময়ে ৫ টি, কখন ৯ টি, কখন ও বা ১৫।২০ টি জ্বালা মালা প্রকাশ পায়। মন্দিরপ্রাচীরের বহির্ভাগে ও মধ্যে ২ শিখা দেখা যায়। পাহাড়ের আর একটু উপরে কুণ্ড আছে, সেটি গোরক্ষ বা রুদ্র কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে একটি জলকুণ্ডের পার্শ্বে শিখা জ্বলিতেছে। অপর পার্শ্বস্থ জলকুণ্ডে ধূপ জ্বালিয়া ধরিবা মাত্র ভয়ানক জ্বালামালা প্রচণ্ড ধ্বনিসহ প্রকাশিত হয়। এই কুণ্ডের বাহিরে২ আরও কয়েক স্থানে মধ্যে ২ শিখা জ্বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই পাহাড়ের নীচে গন্ধকের খনি আছে, এ সকল শিখা তাহারই গ্যাস মাত্র। যে যাহাই বলুক, আমি বলি এ সমস্তই মহামায়ার অদ্ভুত বিভূতি। গন্ধকের একটি দীপ শলাকা জ্বালিলে ঘর দুর্গন্ধময় হয়, কিন্তু এতগুলি প্রচণ্ড গন্ধকের শিখা যে মন্দিরে অনাদি কাল হইতে জ্বলিতেছে, সেখানে দুর্গন্ধ নাই কেন? আগ্নেয় প্রস্তরাদি দগ্ধ হইয়া চূর্ণক হইয়া যায়, কিন্তু কত কাল হইল যে প্রস্তরের পা দিয়া প্রচণ্ড জ্বালামালা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে সকল পাথর চূর্ণক বা ভস্ম হয় না কেন। এই জ্বালা মালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য আরংজিব নহর কাটিয়া জল আনিয়া মন্দির পরিপূর্ণ করিয়াছিল, শিশা ঢালিয়া জ্বালা দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কৈ সে শিখা নিবিল কই। পাহাড়ের উপর হইতে জলধারা আসিয়া মা'র ভবনের যে কুণ্ডে পড়িতেছে, তাহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। জল অতিশীতল, সুপেয় ও উপাদেয়। পাহাড়ের উপরি ভাগে উন্মত্ত ভৈরব, অম্বিকেশ্বর মহাদেব অর্জ্জুনের তপস্যা স্থান ও সাধু দিগের থাকিবার অনেক কুটীর নির্ম্মিত আছে। জ্বালাজী স্থানটি অতি রমনীয়। এখানে পাণ্ডা মণ্ডলী উপদ্রবী নহে, যথা সাধ্য দানেই পরিতৃপ্ত হয়। আমরা এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিলাম। জলন্ধর হইতে যাত্রা করিয়া জ্বালাজি পৌঁছিবার কিঞ্চিদ্দূর পথে চিন্তা পূরণী নামক আর একটি দেবী স্থান আছে, উহা "ছিন্নমস্তার" স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাংড়া উপত্যকা।

জ্বালাজী হইতে মা দাক্ষায়ণীর স্তনপীঠ দর্শনার্থ কাঙড়া নামক স্থানে পাহাড়ী পথে যাত্রা করিলাম। জ্বালাজী হইতে কাংড়া ১২ ক্রোশ ব্যবধান। অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্ কালে পৌঁছিলাম। কাংড়ার পথ বড় ভীষণ দৃশ্য, পথের একদিকে সুগভীর খড্ড, অপর দিকে পতনোন্মুখ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ, বামে বা দক্ষিণে যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই ভয়াবহ

বলিয়া বোধ হয়। কাংড়া উপত্যকায় আজকাল অনেক চা বাগিচা হইয়াছে। কাংড়াতে প্রাচীন দুর্গ আছে, উহা এক্ষণে ইংরাজাধিকৃত, তন্মধ্যে পাহাড়ী রাজা নজর বন্দী আছেন। শৈল শিখরে কাংড়া ক্ষুদ্র সহরটি দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। এইখান হইতে "ভাগসু" পাহাড় অতি নিকট, তথায় "ভাগসুনাথ" মহাদেব আছেন। তাহার পরেই বরকান্ পাহাড়। এই পর্ব্বতটির অভ্রভেদী উত্তুঙ্গশৃঙ্গমালা শুভ্রাতিশুভ্র তুষার রাশিতে আচ্ছাদিত। বরফ গলিয়া প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হইয়া কাংড়ার চারিদিক্ দিয়া কল কল রবে দৌড়িতেছে। এই পাহাড়টির দিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন, কোন কৃষ্ণবর্ণ বিরাট পুরুষ শুভ্র জটাজূট মণ্ডিত মস্তকে ব্রহ্মধ্যান করিয়াছেন ও তাঁহার প্রেমাশ্রু ধারা সবেগে বহিতেছে। কাংড়া-উপত্যকা ভূমি অতি শস্যবতী। দেখিলে, লক্ষ্মীকে চির-বিরাজমানা বলিয়া বোধ হয়।

মায়ের স্তনপীঠ পিণ্ডাকার প্রস্তরময় সুবিশাল মন্দির মধ্যে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গন অতি বিস্তীর্ণ ও মর্ম্মরাদি নানা প্রস্তর খচিত। এখানেও মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ স্বর্ণাবৃত। রণজিৎ সিংহের এখানেও পবিত্র কীর্ত্তির পরিচয়। মায়ের প্রাঙ্গনে চণ্ডী, মহাদেব, বিষ্ণু আদির মন্দির, হবনকুণ্ড, ধর্ম্মসভা আদি আছে। এস্থানে কিয়ৎ কাল থাকিলে মনে শান্তির সঞ্চার হয়। জ্বালা-জীতে মায়ের জিহ্বা ও কাংড়াতে মায়ের স্তন; জ্বালা-জীতে "খাইবার" ও কাংড়াতে "খাওয়াইবার" অঙ্গ পড়িয়াছে। আমরা ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ক্ষুদ্র জীব, আমাদের যেন মায়ের স্তনপীঠটি অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হইল। বস্তুতঃ কাংড়ার ন্যায় শান্তিপ্রদ স্থান অতি অল্পই আছে। তথায় একদিন থাকিয়া মায়ের যথাসাধ্য পূজা করিলাম। এখানকার পাণ্ডারা জ্বালাজী অপেক্ষাও ভাল। অতি অল্পে সন্তুষ্ট। এখানে মা "বজ্রে-শ্বরী" নামে বিখ্যাত। জ্বালাদেবী ও বজ্রেশ্বরী দেবীর শয়নসজ্জা অতি উৎকৃষ্ট। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি যেমন স্বর সহ গীত হয়, এখানেও মার শয়নার্থ পালঙ্কে শয্যা রচনা কালে পাণ্ডাগণ সুস্বরে স্তবাদি পাঠ করে, শুনিলে শ্রবণ, মন জুড়াইয়া যায়। আমরা কাংড়া হইতে পাঠানকোটের পথে চলিলাম অর্থাৎ জলন্দর হইতে পাহাড়ে ১ প্রায় ১৬০ মাইল পথ ভ্রমণ করিলাম। পরে পাঠান কোটে রেলওয়ে যোগে অমৃত-সরে আসিলাম তথায় গুরু নানকের "সরোবরে স্বর্ণকমলবৎ "দরবার সাহেব" আদি দেখিয়া জলন্ধরে পুনরাগত হইলাম। ইতি।

ভারত ও মোক্ষমূলর।

সকলেই জানেন ভারত ও মোক্ষমূলর, এই দুইটী নাম একত্রে থাকিবারই যোগ্য। ভারতের ভাষা, ভারতের নীতি, ভারতের রীতি, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের অধিবাসী, ভারতের মাটী, মোক্ষমূলরের বড়ই প্রিয়; এবং বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মোক্ষমূলরও ভারতের বড়ই আপনার লোক। ইংরাজী মত—শিক্ষার সংস্কার বাদ দিয়া, বিদেশীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত একজন লোক, ভারতবর্ষ যিনি কস্মিন্ কালেও দেখেন নাই, এমন ব্যক্তির নিকট হইতে এই অধঃ-পতিত জাতি, ও দেশ এত অনুরাগ আকর্ষণ করিল, ইহা বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি ভারতকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, একজন খৃষ্টান বিদেশীর নিকট তত খানি আশা বাস্তবিকই কল্পনার অতীত। খৃষ্ট-ধর্ম্মই যাঁহার মতে সার ধর্ম্ম, জগৎ এই ছয় হাজার বৎসর সৃষ্ট হইয়াছে, বৈদিক কালে লোকসকল অগ্নি, বায়ু ঊষা, আদির উপাসক ছিল, ক্রমে পরকাল ও একেশ্বরের তত্ত্ব লাভ করে, ইংরাজ, হিন্দু জর্ম্মান, গ্রীক, একই মহান আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখাবিশেষ; সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিনাদি ভাষা, একই মৌলিক ভাষা-প্রসূত, ও পরস্পর ভগিনী সম্বন্ধ যুক্ত, বৈদিক কালে জাতিভেদ, জন্মান্তরাদির কোনও বিশ্বাস ছিল না,— এরূপ তত্ত্ব সমুদায় ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দৃঢ় ধারণা, তাঁহাদের নিকট হইতে এত সহানুভূতির আশা করা কখনও

যাইতনা, যদি মোক্ষমূলর দেবপ্রকৃতির লোক না হইতেন। সকল দেশেই দেব প্রকৃতির ও দানব-প্রকৃতির লোক আছে। দেবপ্রকৃতির যে কেহই ভারতবর্ষ দেখিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ভারতের অনেক গুণের কথাই বলিয়াছেন। বাঁকী সকলেই কেবল দোষই দেখেন। পূর্ব্বোক্ত সংস্কার গুলি চসমা স্বরূপ হইয়া যাহাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে তাহারা যে সকল বস্তুকেই বিরূপ দেখিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। নতুবা আজ হিন্দুর ছেলেও কি বেদকে চাষার গান বলে? আবার এহেন মহাত্মাদের লিখিত পুস্তক পড়িয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে রাজপুরুষ হইয়া আসিতে হয়। তাঁহারা ভারতবর্ষে বাসকে Moral exile [নীতি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন] ও ভারতবাসীকে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী—মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা পূর্ণ জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য মোক্ষমূলর [১] ভারতবর্ষ কি শিক্ষা দেয়? [২] হিন্দুর সত্যনিষ্ঠা, [৩] সংস্কৃত ভাষায় মানবের প্রয়োজনীয়তা [৪] আশাজ [৫] বেদতত্ত্ব [৬] বৈদিক দেবতা [৭] বেদ ও বেদান্ত,—এই কয়টী অমূল্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রোক্ত সংস্কারাধীন হইয়া অবশ্যই তিনি বেদে জড়বাদ, বহু ঈশ্বরবাদই দেখিয়াছেন, এবং আর্য্য জাতিকে "অপরিণত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল দুর্ব্বলতা বাদ দিলে, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, কয়জন হিন্দু আজ সেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে? তাঁহার সেই বক্তৃতা গুলি একবার সকলে ঢেঁকীদের পড়িতে বলি। যাঁহাদের তত অবকাশ নাই তাঁহাদের জন্য দুই একটী স্থল মাত্র উদ্ধৃত হইল; সকল স্থলে বিস্তার ভয়ে অনুবাদ দেওয়া গেলনা; কারণ যাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ, তাঁহাদের তত খানি ইংরাজী জ্ঞান সম্পূর্ণ আশা করা যায়। মোক্ষমূলর সংস্কৃতবিৎ বিদেশীয় পণ্ডিতদের জন্য দুঃখ করিয়া বলিতেছেন:—'ব্যালান টাইন, 'বুকানান কেরী, ক্রফর্ড, ডেভিস, এলিয়ট, এলিস, হাউটন, ড লোটেন, ম্যাকেনজী, মারসডেন, মুইর, প্রিন্সেপ, রোবেল, টারনার, টউকাম, ওয়ালিচ, ওয়ারেণ, উইলকিন্স, উইলসন, এবং অন্যান্য পণ্ডিত বর্গ, প্রাচ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর বাহিরে অতি অল্পই পরিচিত। অনেকের ধারণা, মনু, শকুন্তলা, এবং হিতোপদেশ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে আর কি আছে? মোক্ষমূলর, ভারতকে ভূলোক-স্বর্গ, ভারতবাসীর মন অত্যুন্নত জ্ঞান করিয়া থাকেন—

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, — in some parts "a very paradise" on earth— I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them, which will deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant — I should point to India."

হিন্দুকে মিথ্যাবাদী বলায় তিনি বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেছেন:—"Are all these 253 millions of human beings to be set down as liars, because some hundreds, say, even some thousands of Indians, when they are brought to an English court of law on suspicion of having committed a theft or murder do not speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth?"—

তাঁহার ধারণা, প্রকৃত হিন্দু গ্রাম্য মণ্ডলিতে মিলে, সভ্যতালোকিত সহরে পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিন্দু, সরল সত্যবাদী দয়ালু, মানবোচিত বহুগুণ সম্পন্ন। তাহাকে কোর্টে লইয়া গেলে সে আর সে রূপ থাকেনা। তিনি নানা প্রমাণ দ্বারা ভারতবাসীর সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়া, কত কত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া শেষে বলিতেছেন "I do wish it to be understood and accepted as a fact, that the damaging charge of untruthfulness, brought against the people is utterly unfounded with regard to ancient times. It is not only not true, but the very opposite of truth." আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—"The 'self within was drawn towards the Highest self, it found its true self in the Highest self and the oneness of the subjective with the objective self was underlying all reality, as the dim drawn of religion—as the pure light of philosophy." তিনি Schopen-hauer হইতে তুলিয়াছেন:—"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life—it will be the solace of my death."

রাম মন্দির ব্যাপার উপলক্ষে যে সমস্ত নির্দ্দোষী নিরীহ কাশীবাসী কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই মুক্ত পাইয়াছে। যাহাদিগকে সনাক্ত করা হইয়াছিল, তাহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিচার চলিতেছে। যাহারা টেলিগ্রাফ আপীস লুঠ করিয়াছিল প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ২ চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ কেহ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

কাশীনিবাসী কুমার শ্রীযুক্ত স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজক মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের গুরুদত্ত নাম) ৺জ্বালামুখী হইতে প্রত্যাগমন কালে জলন্ধর নগরে আগমন করেন এবং অত্র স্থানের বাঙ্গালি ও সম্ভ্রান্ত স্থানীয় লোকের দ্বারা বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ছাউনীর ৺কালীবাটীর প্রাঙ্গনে দুই দিবস ও সহরের ধর্ম্মসভায় একদিন ধর্ম্ম বিষয়ণী বক্তৃতা করিয়া যে কি পরিমাণ আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তাহা সামান্য পত্রে লেখা অসাধ্য। জলন্ধর বাসীগণ তাঁহার উপদেশপূর্ণ ধর্ম্মকথা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইতি

অনুগত
শ্রীহরিদাস বসু।

বিগত হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যে ভারত ধর্ম্ম মণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে দ্বারবঙ্গের মহারাজ নিম্নলিখিত ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিতগণকে সম্মান-পদক দান করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দকিশোর দেব শর্ম্মা	মথুরা
" পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী	জলন্ধর
" গোস্বামি মধুসূদনাচার্য্যজী	বৃন্দাবন
" গোস্বামি পণ্ডিত রঘুবর দয়ালু বেদান্ত ভূষণ	কপুরথলা
" পণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী	বরেলী
" পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস	ভাগলপুর
" পণ্ডিত দেবী সহায় শর্ম্মা	কলিকাতা
" পণ্ডিত রামজী লাল শর্ম্মা	রোহতক
" পণ্ডিত গিরিধারী লাল শাস্ত্রী	অমৃতসর
" পণ্ডিত গোকুল প্রসাদ শর্ম্মা	কানপুর
" পণ্ডিত বুলাকী রাম শাস্ত্রী	অমৃতসর
" পণ্ডিত বনমালী দত্ত শাস্ত্রী	অমৃতসর
" পণ্ডিত মোহন লাল শর্ম্মা	জগাধরী
" পণ্ডিত শ্যাম লাল শর্ম্মা	অমৃতসর
" পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী	দিল্লী
" পণ্ডিত মুরলী ধর শর্ম্মা	ফরুরুখ নগর
" পণ্ডিত রামচন্দ্র বেদান্তী	দিল্লী
" পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মা	লাহোর
" পণ্ডিত অমানন্দ শর্ম্মা	বরেলী
" পণ্ডিত রাম সহায় পেড়া পত্তি	রিওয়াড়ী
" পণ্ডিত ভাগীরথজী শর্ম্মা	রিওয়াড়ী
" পণ্ডিত ভোলা লালজী শর্ম্মা	ভরতপুর
" পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় বিএ,	এলাহাবাদ
" পণ্ডিত সেবারাম জ্যোতির্বিদ	পটিয়ালা
" পণ্ডিত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব ,	নদিয়া

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম নিম্নলিখিত স্থানের ধর্ম্মসভা সমূহের উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যথা বনগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, জামালপুর, মিরাট, ব্রাহ্মণ শাসন।

হাওড়া শালিখাগ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালদাস বসু মহাশয়ের উদ্যোগে একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা সুসংবাদ বটে। আশা করি সভ্যগণ সভার কার্য্য নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব নামক এক খানি পুস্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউরোপীয় নব্য দর্শনের সমুচ্চ রশ্মিতে লোকের মন দিন২ বিশুষ্ক হইয়া উঠিতেছে এ দুর্দ্দিনে ভক্তির শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়। প্রাণকৃষ্ণ বাবু পুস্তক খানিতে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণাদি বিবৃত করিয়াছেন। দুই চারিটি ভক্তের জীবন চরিতও লিখিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি কথামৃত-পূর্ণ পুস্তক যতই প্রকাশিত হইবে ততই ধর্ম্ম সাহিত্যের পুষ্টি হইবে।

ধর্ম্ম প্রচারক

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ

কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচি।

আষাঢ় মাস, শঃ ১৮১৩।

বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাশুল সহ মূল্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামী-কৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপনী' নামক উপাদেয় ভাষাতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত।	৭৲
ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ) ...	॥/০
নিত্য কর্ম্মেন্দু কৌমুদী (২য় সংস্করণ)	৸০
স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ...	৶০
রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ) ...	।০
মনিরত্ন মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ)	/০
শ্রাদ্ধতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ)	/১০
হরের্নামৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ)	/১০
সন্ন্যাসী	৶০
পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১ম২য়৩য়৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ)	৶০
গীতা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ) ...	/১০
একতারত কাব্য ...	৶০
নীতিরত্ন মালা ...	।০
বক্তৃতা ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় কর্তৃক কৃত) ...	।৵০
অন্নপূর্ণাদির স্তোত্র (২য় সংস্করণ)	/১০
গৌড় পাদীয় আগম (বঙ্গানুবাদ সহ)	।৵০
যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ) ...	।৵০
ধর্ম্ম প্রচারক (মাসিক পত্র)	
উত্তম কাগজে মুদ্রিত ... বার্ষিক	৩।৵০
মধ্যম ঐ ঐ	২।৵০
সাধারণ ঐ ঐ	১।৵০
পঞ্চামৃত	।/০
শিবলিঙ্গ-পূজনবিধি (২য় সংস্করণ)	১৲
শ্রীমতি ও সুমতী উপাখ্যান (যাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩)	/১০
গীতাঞ্জলি	।০
তন্ত্রতত্ত্ব	৵
৺ অন্নপূর্ণার ছোট ছবি (কার্ডের উপর সুন্দর রূপে চিত্রিত—৫ খানির অধিক লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না।)	৶০
মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ফটোগ্রাফ	।৶১০
ষট্‌চক্র	।০
বক্তৃতা ২য় খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত)	।০

চিঠি লিখিবার কাগজ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত প্রত্যেক পাকেটে ৫ দিস্তা।

বড় আকারের মূল্য ।১০ ডাক মাশুল—/১০ মোট—।৶০

ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।৵১০ মাশুল /১০ মোট—॥০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ৶১০ মাশুল /০ মোট—।১০

ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।১০ মাশুল /০ মোট—।/১০

মূর্ত্তি হীন কেবল প্যাডরজা ৫ দিস্তা প্যাকেট

বড় আকারের মূল্য ৶০ মাশুল—/১০ মোট—।১০

ছোট আকারের মূল্য ৶১০ মাশুল /০ মোট—৶১০

নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

যন্ত্রাধ্যক্ষ

কাশী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৪শ ভাগ | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১৩
৩য় সংখ্যা | শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" | আষাঢ় মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ন সংশয়ং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিয়ং বদেৎ।
নাহিতং নানৃতং চৈব ন স্তেনঃ স্যান্নবার্দ্ধুষী॥

যাহাতে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়, তেমন কার্য্য করিবে না। সহসা কঠোর কথা বলিবে না। অহিতজনক এবং মিথ্যা কথা বলিবে না। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে না এবং সুদখোর হইবে না।

দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেব মৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্।

স্বর্ণকুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ করিবে। প্রতিদিন দেবতা নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে মৃত্তিকা, গো, বিপ্র, এবং বনস্পতি, ইহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে।

নতু মেহেন্নদীচ্ছায়াবর্ত্মগোষ্ঠাম্বুভস্মসু।
ন প্রত্যগ্ন্যর্কগোসোমসন্ধ্যাম্বুস্ত্রীদ্বিজন্মনঃ।

নদীতটস্থিত ছায়াময় পথ, গোশালা, জল ও ভস্ম মধ্যে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। সূর্য্য, অগ্নি, গো, চন্দ্রমা, জল, স্ত্রী, এবং দ্বিজ ইহাদের সম্মুখে এবং সন্ধ্যাকালে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

নেক্ষেতার্কং ন নগ্নাং স্ত্রীং নচ সংসৃষ্টমৈথুনাং।
নচ মূত্রং পুরীষং বা নাশুচী রাহুতারকাঃ।

সূর্য্য, মূত্র, পুরীষ, উলঙ্গ ও কৃতমৈথুনা স্ত্রী ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। অশুদ্ধদেহে রাহু ও তারকার দিকেও দৃষ্টিপাত করিবে না।

"অয়ং মে বজ্র" ইত্যেবং সর্ব্বং মন্ত্রমুদীরয়ন্।
বর্ষত্যপ্রাবৃতো গচ্ছেৎ স্বপেৎ প্রত্যক্শিরা নচ।

বৃষ্টির সময় কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইলে মস্তকে ছত্র না দিয়া "অয়ং মে বজ্র" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতেই চলিয়া যাইবে, ইহাতে বৃষ্টিজনিত গ্লানি হইবে না। পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করিবে।

ষ্ঠীবনাসৃক্‌শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ নচৈতমভিলঙ্ঘয়েৎ।

শ্লেষ্মা, রক্ত, মূত্র ও বীর্য্য জলমধ্যে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন ও পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ব্যাধিতৈর্ব্বা ন সংবিশেৎ।

অঞ্জলিপুটে জলপান করিবে না। অকারণে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। দ্যূতক্রীড়া করিবে না। রোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্।
কেশভস্ম তুষাঙ্গার কপালেষু চ সংস্থিতম্।

দেশ কুলাদি বিরুদ্ধ আচার বর্জ্জন করিবে। শবদাহের ধূম আঘ্রাণ করিবে না। নদীতে সন্তরণ করিবে না। কেশ, ভস্ম, তুষ, কয়লা ও খাপ্‌রার মধ্যে বসিবে না।

ক্রমশঃ।

আমার নিজস্ব।

নয়ন মন-রঞ্জন কত পদার্থ জগতে সজ্জিত রহিয়াছে, সম্মুখে কত সুশোভন বিচিত্র সামগ্রী পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে, এ সমস্ত পাইয়াও মন ত তৃপ্ত হয় না। ইহা অপেক্ষা আরও কি যেন কামনার সামগ্রী সে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা অপেক্ষা মন যেন আরও কি চায়? আবার যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাই না, মন বুদ্ধির অতীত স্থানে যাহার তত্ত্ববার্ত্তা লুক্কায়িত, তেমন জিনিষকে পাইয়াও ত মন তৃপ্ত হইতে চাহে না। যাহাকে আমি আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, যাহাকে পাইলে মনঃ প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বত এব তৃপ্তোস্মি বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তেমন জিনিষকে পাইবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা লালায়িত। যাহাকে আমার জিনিষ বলিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে পারি, আমার সাজে সজ্জিত হইয়া আমার ভাবে "আমার" হইয়া যাহা আমার কাছে আসে, তাহাকে লইয়াই আমি জুড়াইতে চাই। আমার হৃদয় যাঁহার মোহন মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে, আমার ক্ষুদ্র প্রকৃতি যাঁহাকে "নিজস্ব" বলিয়া অধিকার করিতে পারে, আমি তাঁহারই চারুচরণ-রশ্মির ভিখারী।

জানি আমি পাপী তাপী নরাধম। এই পাপীর দেবতা হইয়া এই অগতির গতি হইয়া এই অনাথের নাথ হইয়া যিনি দেখা দেন, আমি তাঁহাকে চাই। সাধকের হৃদয়মন্দির যিনি আলো করেন, আমি তাঁহাকে লইয়া কি করিব? সাধকের যাহা সাধের ধন, আমার মত অসাধকের হৃদয় তাহাকে কি ধারণা করিতে পারে? ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়ের যিনি সম্পত্তি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? উপাদেয় রাজ-অন্ন আমার মত ব্যাধিগ্রস্তের উদরে পরিপাক পাইবে কেন? সুতরাং ধ্রুব প্রহ্লাদের ঈশ্বরকে আমি চাহি না। কেননা সে হৃদয় আমার নাই। জ্ঞানীর ঈশ্বর—যোগীর ঈশ্বর—সাধকের ঈশ্বরকে আমি চাহি না, আমি আমার ঈশ্বরকে চাই। আমার প্রিয়তম সামগ্রীকে "আমার" ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া লইতে চাই।

আপনার ২ ভাবে জগতের সকলেই আপনার জিনিষকে ভাল বাসে। পরের চক্ষু লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে ভাল বাসে না। পরের হৃদয় লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে সুন্দর দেখে না। আপনার চক্ষে যাহা ভালবাসার সামগ্রী, পরের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, তুচ্ছ হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কুৎসিত কদাকার পুরুষ পরের চক্ষে ঘৃণিত হইতে পারে কিন্তু তাহার সতীস্ত্রীর পক্ষে সে ভালবাসার জিনিষ—স্নেহ আদর মায়া মমতার অনন্ত প্রস্রবণ। সতী যে হৃদয়-দর্পণ দিয়া তাহার পতিকে দেখে, সেই হৃদয় খানি লইয়া যদি তুমি দেখিতে, তাহা হইলে সেই বিকট কদাকার পুরুষে অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিতে পাইতে। সুতরাং নিজত্ব লইয়াই ভালবাসা। মদ্ভাব-ভাবিত হইয়া যাহার আমার অধিকারে আসে, আমার আসক্তি কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া সেই দিকে শতধারে ছুটিয়া থাকে। এই মদ্‌ভাবের সহিত যাহার সংস্রব নাই, জগতের লোক তাহাকে এক মুখে সুন্দর—উত্তম—উপাদেয় বলিলেও আমার ভালবাসার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই "আমার ভাবের" সহিত ভগবানের যত খানি সম্বন্ধ, তিনি তত খানি আমার ঘনিষ্ঠ। "আমার" বলিয়া ভালবাসার জিনিষকে যদি পুরো অধিকার করিতে না পাইলাম

তবে তৃপ্তি পাইব কেন ? তাই "তোমার" ঈশ্বরের কাছে যাইতে আমি ভয় পাই। আমার আমিত্ব যাঁহার চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, সেই প্রাণ-সখার কথা বলিয়া দাও! আমার মরমের কাহিনী যাঁহার দরবারে পৌঁছিতে পারে, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব-বার্ত্তা বুঝাইয়া দাও! দুঃখে শোকে যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বাষ্পগদগদ লোচনে যাঁহার দিকে তাকাইলে যিনি দুর্গতি হরা মা হইয়া দৌড়িয়া আসেন, তাঁহার চরণরেণুর সহিত আমার আমিত্ব যাহাতে মিলিত হইতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দাও! জানি তিনি ত্রিজগতের মা, কিন্তু তাহাতে আমার কি? তাঁহার সে ব্যাপক মূর্ত্তিকে নিজস্ব বলিয়া আমার এ ক্ষুদ্র প্রকৃতি ধারণা করিতে পারিবে কেন? ত্রিজগতের মা যদি আমার মা হইয়া দেখা দেন, তবেই ত আমার ভরসা। জগন্নাথ যদি আমার হৃদয়নাথ হইয়া অবতীর্ণ হন, তবেইত দুঃখী জীব তৃপ্ত হইতে পারে। আমার ক্ষুধায় যিনি অন্নপূর্ণা, রোগে যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, কামনায় যিনি কল্পতরু, তাঁহাকে লইয়াই আমার কথা। তোমার "সত্যং শিবং সুন্দরং" লইয়া আমার আশা মিটিবে না।

পদার্থ যত ক্ষণ মৌলিক, ততক্ষণ তাহা ব্যাপক। পদার্থ খণ্ডিত হইলে আর তাহার ব্যাপকতা থাকে না। প্রকাণ্ড এক খানি বস্ত্র যত ক্ষণ পর্য্যন্ত মৌলিকাবস্থায়—অখণ্ডিতাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যাপকতা থাকে অর্থাৎ নিজ ২ প্রয়োজনানুসারে সেই বস্ত্র হইতে কেহ বা জামা, কেহ বা পাজামা, কেহ বা উষ্ণীষ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু যখনই তাহা খণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তাহাতে জামা আদি প্রস্তুত হইবে, তখন সেই খণ্ডিত মূর্ত্তি হইতে ব্যাপকতা চলিয়া যাইবে। তোমার গায়ের জামা আমার গায়ে হইবে না, আমার পাজামা তোমার উপযুক্ত হইবে না। কিন্তু তাহাদের মৌলিকাবস্থায়—বস্ত্রাবস্থায় স্বেচ্ছানুসারে নিজ২ মনোমত জামা আদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম। জামা আদির মৌলিকাবস্থা—বস্ত্র যেমন অনেকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, জামা আদি তেমন পারে না। সুতরাং তোমার গায়ের জামা যেমন আমার গায়ে হয় না, তেমনই মৌলিকাবস্থা পরব্রহ্ম হইতে খণ্ডিত সগুণ ব্রহ্ম—তোমার মনোমত ঈশ্বর "আমার" পক্ষে উপযুক্ত হইবে কেন? মৌলিকাবস্থাচ্যুত জামা আদি যেমন প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন২, সেই রূপ পরব্রহ্মচ্যুত সগুণ ব্রহ্ম—উপাস্য দেবতা প্রত্যেক হৃদয়ে ভিন্ন ২। পরব্রহ্ম হইতে নিজ২ মনোমত উপাস্য দেবতাকে গুরুর সাহায্যে আমরা বাছিয়া লইতে পারি, কেননা তিনি ব্যাপক। সুতরাং যাহা তোমার মনোমত প্রিয়তম আত্মীয়, তাহাকে "আমার" ভাবিয়া বুকে রাখিয়া জুড়াইতে পারিব কেন? তোমার "নিজস্বকে" আমার "স্ব" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব কেন? যাহা তোমার শান্তিদায়ক, তাহাতে আমিও যে শান্তি পাইব এমন কোন কথা নাই। যে ঔষধে তোমার ব্যাধির শান্তি হয়, আমার তাহাতে কিছুই না হইতে পারে। তুমি হয় ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্ম, তীর্থের কত কথাই বলিলে, কিন্তু আমার হৃদয় তাহাতে যদি না মানে, তবে আমি তাহা লইয়া কি করিব! আমার জিনিস আমাকে দিলে আমি তৃপ্ত হইতে পারি ইহাই আমার অন্তরের ভাষা।

সংসার যদি আমার ভালবাসার জিনিস দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে লইয়াই তৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সংসারে ভালবাসার জিনিস পাওয়া অসম্ভব। কেননা আমার ভালবাসার বিচিত্র গতি। আমার মনঃ প্রাণ তিল মাত্র স্থির নহে। বায়ুমণ্ডল যেমন অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে, আমার মনঃ প্রাণ সেই রূপ অবিরত মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই মাত্র যাহার পিপাসু আমি, এই মাত্র যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল আমি, হয় ত পর মুহূর্ত্তে আমি আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। মুহূর্ত্তমধ্যে

আমার যে পিপাসা—সে ব্যাকুলতা কোথায় চলিয়া যায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের সে ভাব কোথায় ডুবিয়া যায়। এই মাত্র যাহার আকাঙ্ক্ষী হইয়া বাজারে ক্রয় করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইলাম, তুমি তাহা আনিতে না আনিতে আমার মন হয়ত বদ্‌লাইয়া গেল, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেও আর ইচ্ছা হইল না। অদ্য যাহাকে প্রিয়তম বলিয়া বুকে রাখিয়া সোহাগ করিতেছি, কল্য হয় ত তাহাকে কালসর্প ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। অদ্য যাহার মিলন-প্রত্যাশায় আনন্দের মধুর স্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, কল্য তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই সম্ভাবিত প্রিয়তম বস্তুকে জীর্ণ কঙ্কাল বোধে পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং সংসার আমার মনোমত জিনিস দিতে পারে কৈ? সংসার যেমন পরিবর্ত্তনশীল,—চঞ্চল, আমার মনও সেই রূপ চঞ্চল। চঞ্চল পদার্থ চঞ্চল মনকে তৃপ্তি দিতে পারিবে কেন? যখন উভয়েই চঞ্চল, তখন উভয়ের সমসূত্রপাতে মিলন অসম্ভব। পদার্থদ্বয় একত্র স্থির হইলেই মিলন সম্ভব। অস্থিরের কি কখনও মিলন হইতে পারে। অস্থির মন ও সংসারের যদি সমসূত্রপাতে মিলনই হইতে পারিল না, তবে সংসারকে "আমার জিনিস" ভাবিয়া মনোমত করিয়া লইতে পারিব কেন? যেখানে অস্থিরতা নাই, চঞ্চলতার ছায়া মাত্র যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পরিবর্ত্তনের কলঙ্ক যেখানে বিন্দু মাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, সেই অচঞ্চল পরম পুরুষের আশ্রয়াঞ্চলে মন যে দিন লুক্কায়িত হইবে, সে দিন তাহার সমস্ত অস্থিরতা বিনষ্ট হইবে, চপলতা চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যাইবে। সেই নিশ্চলতার সাগরে নিমগ্ন হইয়া মন সমাহিত হইয়া যাইবে। মন তখন মনের মানুষের সহিত এমনই সম্মিলিত হইয়া যাইবে, যে আর তাহার কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। চির অবিচ্ছেদই ত ভালবাসার লক্ষ্য। সংসার ভালবাসার এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে না। তাই সংসার আমার নিজস্ব হইবার উপযুক্ত নহে।

ভালবাসা নহিলে জীব সুখী হইতে পারে না। পরকে ভাল বাসিয়াই জীব সুখী হইতে চায়। সুতরাং নিজের সুখের সামগ্রীকে জীব পরের উপরই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। পরের মুখাপেক্ষা করিয়াই জীব জগতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী স্বামীর উপর নিজের সুখের ভার চাপাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, স্বামী স্ত্রীর উপর সুখের বোঝা অর্পণ করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ জীব পরের হাতে নিজের সুখভাণ্ডারের চাবি দিয়া নিশ্চিন্ত হয় কেন? যাহা জীবনের অবলম্বন, সেই সুখ-সুধাকে পরহস্তগত করিতে আমরা লালায়িত কেন? নিজের মূল্যবান্ সম্পত্তিকে নিজের অধিকারে না রাখিয়া আমরা পরের উপর নির্ভর করিতে চাই, এবড় আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! যাহা আমার শান্তির—তৃপ্তির—আনন্দের আধার, তাহা যতই আমার অনায়াসলভ্য হয় ততই ত আমার পক্ষে মঙ্গল। শয্যাশায়ী—তৃষ্ণার্ত্ত—পীড়িতের শিয়রে যদি জলপূর্ণ কলস বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জলের জন্য তাহাকে চিন্তা করিতে হয় না। সুখের কলস যদি আমরা শিয়রে রাখিতে জানিতাম তাহা হইলে দুঃখের কসাঘাতে আমরা কখনই পীড়িত হইতাম না। বাস্তবিক সুখদুঃখ যাহা কিছু সমস্তই আমাতে। অবিদ্যা বশে ভ্রান্তির ঘোরে পরের উপর সুখ দুঃখ আমরা চাপাইয়া ফেলি। তাই সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

আমার সুখের জিনিস আমার ভালবাসার জিনিষ-আমার আপনার হইতেও আপনার জিনিষ আমার সহিত নিত্যনিয়ত বিদ্যমান। আবার আমার দুঃখদায়ক শত্রু হইতেও পরম শত্রু আমারই ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা, আত্মা ও অনাত্মা এই দুই লইয়াই ত আমি। অবিদ্যা আমার শত্রু, বিদ্যা আমার মিত্র। দুঃখমূল অবিদ্যাকে আমার ভিতর হইতে উৎপাটিত করিতে পারিলে আমি দুঃখের হাত হইতে

পরিত্রাণ পাই। সুখস্বরূপ আত্মস্বরূপিণী বিদ্যাকে পাইলে আমি নিত্য সুখের অধিকারী হই। সুতরাং সুখ দুঃখ সমস্তই আমাতে। সুতরাং যাহা আমার আমন্তের মধ্যে, তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হই কেন! আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, আমার নিজের ঘরেই রহিয়াছে, সেই গৃহের দ্বার খুলিতে জানিনা বলিয়াই বাহিরে সুখ প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই। আমার অন্তরে অপূর্ব্ব রত্নের দিব্য শোভার ভরপূর হইলেও বাহিরের রত্নান্বেষণে লালায়িত হই, আমার অন্তর্জগতে শত চন্দ্র নিঙড়ান সুধার ধারা অবিরত প্রবাহিত হইলেও তাহার আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া বাহ্য সুখের মরু মরীচিকায় দৌড়িয়া যাই। যিনি আমার নিজ হইতেও নিজ, আপনার হইতেও আপনার, অথচ পরমসুন্দর, তাঁহাকে ভাল বাসিতে ক্ষণেকের জন্যও ইচ্ছা হয় না, কিন্তু যাহা আমার পর হইতেও পর, যাহার সহিত আমার দূর হইতেও দূরতর সম্পর্ক, আমার ভালবাসা তাহাকে লইয়াই চরিতার্থ হইতে চায়! যাহা আমার প্রকৃত নিজস্ব তাহাকে ছাড়িয়া, পরের চরণে আমরা ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিতে চাই, নিজকে পর ভাবিয়া পরকে নিজস্ব ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই। অহো! বিড়ম্বনা!

স্বর্গের সিঁড়ি!

স্বর্গের না কি সিঁড়ি আছে? লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিবার জন্য অতি উচ্চ, অতি দৃঢ় এবং অত্যন্ত অপ্রশস্ত সোপানাবলি নির্ম্মিত রহিয়াছে। সে সোপান শ্রেণী অতি দুরারোহ, উঠিবার চেষ্টা করিলে কোমর ভাঙ্গিয়া যায়, অস্থি পঞ্জর খসিয়া যায়। অতি কষ্টে, বিশেষ যত্নে এবং বিস্তর পরিশ্রমে যদি কেহ কিছু দূর উঠিতে সমর্থ হয়, বিশ্রাম আশায় এ দিক্ ও দিক্ তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া আবার ধরাতলে পড়িয়া যায়। শুনিয়াছি সকল সিঁড়ি বাহিয়া স্বর্গে উঠা মনুষ্য শক্তির অতীত। এমনও প্রবাদ শুনা যায় যে প্রথম দুই চারি সোপান অতিক্রম করিবার উদ্যম করিলে পশ্চাৎ হইতে কোটী২ মনুষ্য কণ্ঠে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকে, কত লোকে হাসিয়া থাকে—বিদ্রূপের হাঁসি হাঁসিয়া তাহাকে সাধু সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, কত তীব্র এবং অসহ্য ব্যঙ্গোক্তি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। অনেক বীর, ধনী এবং রাজেন্দ্র সদর্পে এবং স্পর্দ্ধার সহিত এই সিঁড়িতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কখনও সকলকাম হইতে শুনা যায় নাই।

আবার শুনা যায় স্বর্গ না কি অতি মনোরম স্থান। তথায় অন্ধকার নাই, উত্তাপ নাই, তীব্র জ্যোতিঃ প্রভা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষাধারে সকল প্রাণিকে হয় না, তড়িচ্ছটায় সঘন গর্জ্জনে কিছু কম্পিত ও ভীত হয় না, যাহাকে কষ্ট, যাহাতে যন্ত্রণা, যাহাতে উন্মত্ততা জন্মে তাহার কিছুই তথায় নাই, আছে কেবল আনন্দ, সুখ এবং শান্তি। এমন মনোহর, পবিত্র পুণ্যময় স্থানে যাইতে হইলে এ কষ্ট কেন স্বীকার করিতে হয়? নন্দন কাননের পথে এত বিঘ্নরাশি কেন, পারিজাত সৌরভের দ্বারে পূতিগন্ধ কেন, মায়ের কোলের কাছে মৃত্যুর ভীষণ আলিঙ্গন কেন? তোমাদের কাছেই সংবাদ পাইলাম যে, স্বর্গ শান্তি নিকেতন, আমার এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, এই সব মর্ম্মভেদী হৃদয় শোষক ভাবনার বৃশ্চিকদংশন তথায় পবিত্র শীতল জল দিয়া জুড়াইয়া যাইবে। আমি নিশ্চিন্ত হইব; ব্যথাহীন হইব, সুখী হইব তথায় যাইলে আমার আনন্দের আর পরিশেষ হইবে না। পরন্তু পথে ও বিপদ্ ভার। সংসারী জীবের পীড়িত, দলিত, দুর্ব্বল প্রাণ সে দুর্গম পথে দিশাহারা হইয়া পড়িবে। তাই কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে দীন হীন আমাদের অমূল্য নিধি দেখাইয়া কেন উহা উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে লুকাইয়া রাখিলে। যাহা দেখিলে আমার

দশহাত বুক ফুলিয়া উঠে, যাহা পাইব মনে করিলে ক্ষীণ শরীরে অযুত হস্তীর বল আসিয়া জুটে, যাহার বিষয় আলোচনা করিলে শুষ্ক হৃদয়ে আহ্লাদের লহরী বাহিয়া যায়, তাহাকে এমন করিয়া দৃষ্টির বাহিরে রাখিলে কেন, এত দুঃখ এবং বিপত্তির বেড়া দিয়া রাখিল কেন? এই লক্ষ যোজন বিস্তৃত দুর্গম সোপান-শ্রেণী, সংসার দুঃখদাব দগ্ধ, শিথিল শরীর আমি কেমন করিয়া অতিক্রম করিব? যদি স্বর্গ আমার পরিত্রাণের জন্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে তবে বলিয়া দেও কি উপায়ে আমি তথায় যাইতে পারিব, কি করিলে, কাহার কাছে কি গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা করিলে আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে, আমি সহজে সুখে সদানন্দময় নিকেতনে পঁহুছিতে পারিব।

কত লোকের কত কথা শুনিব কাহার কথায় বা বিশ্বাস করিব! আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে স্বর্গ নামে কোন পৃথক স্বতন্ত্র প্রদেশ নাই, তথায় যাইবার দুর্গম পন্থাও নহে। স্বর্গ অবস্থা বিশেষ মাত্র। পবিত্র কর্ম্মে পবিত্র ব্যবসায়ে পুণ্যময় ভাবনায় চিত্তের যে একটা প্রসাদ জন্মে, কেমন যেন নিশ্চিন্ত, নির্দ্বন্দ, নিরাময় ভাব হয়; প্রাণে কেমন যেন অনির্ব্বচনীয় উৎফুল্লতা হয়, মনে হয় যেন কোন অনন্ত, শীতল, অগাধ সরোবরে ডুবিতেছি। এ নিমজ্জনে নিশ্বাস অবরোধ নাই, কষ্ট নাই, ভয় নাই; শীতলতার উপর শীতলতা আসিয়া অন্তরে ২ প্রবেশ করিতেছে, এই স্বচ্ছন্দতা এবং সদাসুখের অনুভূতিই স্বর্গ। সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তি কর্ম্ম জন্য; কর্ম্মানুরক্তি প্রবৃত্তি জন্য। প্রবৃত্তি শিক্ষা এবং সৎসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়। মানিলাম স্বর্গ অবস্থা বিশেষের নাম মাত্র। কিন্তু স্বর্গ লাভের পন্থা অতি কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যা সাধ্য। কেন তাহাই পরে বলিতেছি।

স্বর্গের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হইলে কর্ম্ম, প্রবৃত্তি, সৎসঙ্গ এবং শিক্ষা এই কয়টি বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় লইতে হইবে। পরিচিত হইলে বুঝা যাইবে এ সিঁড়ি দুরারোহ কি না! স্বর্গলাভ হেতুক কর্ম্ম তাহাই যাহা দ্বারা মনুষ্য নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, নির্দ্বন্দ, নির্লেপ হইতে পারে; যে ব্যবহারে কখনও পাপময়, উৎকণ্ঠাময়, উচ্ছ্বাসময় চিন্তা প্রবাহ মনুষ্য মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে না পারে; যে বিষয় ব্যাপারে মানববুদ্ধি-কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত না হয়; যাহা হইতে চিত্ত আশঙ্কিত ও ভয় বিহ্বল হইয়া সংক্ষুব্ধ এবং স্তম্ভিত না হয়। কর্ম্ম তাহাই, যাহা দ্বারা সংস্কার এবং পূর্ব্বজ স্মৃতি বিনষ্ট হয়। আমি যতই কেন পুণ্য কর্ম্ম করি না, পূর্ব্বাজ্জিত দুষ্ট স্মৃতি সময়ে ২ দেখা দিয়া বিশেষ মানসিক কষ্টের কারণ হইবে। যতই কেন সৎচিন্তায় ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু রক্ত মাংসের জবরদস্তিই এমন সময়ে অসময়ে, শয়নে স্বপনে কোথা হইতে পাপের পূতিগন্ধ আসিয়া তোমাকে বিকল করিয়া তুলিবে। স্বর্গ পুণ্যময় স্থান, পাপের বাতাস সে দেশে প্রবাহিত হইতে পায় না, তুমি পাপের অঙ্গরাগ করিয়া কেমনে সে পথে চলিতে সাহস কর? অতএব স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম তাহাই, যদ্দ্বারা মনুষ্য একেবারে পাপ শূন্য এবং পাপ প্রবৃত্তি শূন্য হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি রুচি থাকা আবশ্যক। স্বভাবতঃই পাপ কর্ম্মে, বিলাস বিভ্রমে, অপবিত্র চিন্তায় কেমন একটা মনোহারিত্ব আছে। মনুষ্যের এই রক্ত মাংসের শরীর যেন আপনা হইতেই সেই দিকে দৌড়িয়া যায়। কাযেই পাপের আপাত-মনোহর ছবি হইতে প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া সিদ্ধি সাধন পূর্ণ পুণ্যের ভৈরবী মূর্ত্তির প্রতি কেহ সহজে দৃষ্টিপাত করে না। তবেই হৃদয়ে পবিত্রাকাঙ্ক্ষা জন্মান অতি কঠোর এবং দুশ্চর তপশ্চারণ-সাধ্য বিষয় বলিতে হইবে। যে যে দেশে থাকিয়া যেমন হীন কর্ম্মই করিবার ইচ্ছা করুক্ না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঐ কর্ম্মে একটা প্রবৃত্তি না হইবে, তাহার

মনমুগ্ধকর কিছু যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাতে না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ সেই কর্ম্ম করিতে সে কিছুতেই বদ্ধপরিকর হইবে না। মেথরের কার্য্যে মেথরের দৃষ্টিতে এমন কিছু মনোহর ব্যাপার আছে যাঁহার জন্য সে বিনা আপত্তিতে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে উহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বালক যত দিন পর্য্যন্ত বিদ্যার আস্বাদ না পাইবে ততদিন তাহাকে মারিয়া, ধরিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। সেই প্রকার মনুষ্য যত দিন পুণ্য কর্ম্মের মহত্ত্ব না বুঝিবে, স্বর্গের নন্দন-বন কুসুম পরাগবাহী সমীর সংস্পর্শের স্নিগ্ধতা যত দিন না পাপ দেহে অনুভব করিতে পারিবে, ততদিন কোনমতেই পুণ্য কর্ম্মে মনোযোগ দিবে না। সুতরাং পুণ্যবান হইতে হইলে পুণ্যের পরিচয় আবশ্যক। পুণ্যের বিষয় জানিতে হইলে সাধু সজ্জনের সেবা করিতে হইবে। কেননা তাঁহারা পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্যের প্রজা, যে দেশের সংবাদ লইতে হইলে, খাস মহলের রায়তের নিকট সকল তত্ত্বানুসন্ধান করাই বিধেয়। তবেই বুঝা গেল সাধুসঙ্গই সকলেরই মূলভিত্তি। কিন্তু সাধু সঙ্গ করে কে? ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধু সন্ন্যাসী আমার যদি ভাল না লাগে, সভ্যজাতির দেখা দেখি আমি যদি সাধুগণকে বর্ব্বর বলিয়া বুঝিতে শিক্ষা করি, ধর্ম্ম কর্ম্ম কুসংস্কার বলিয়া জানি, তাঁহাদিগকে দেখিলে সে সকল কথার প্রসঙ্গ উঠিলে ঘৃণার ও অবজ্ঞার হাঁসি হাসিয়া দশযোজন দূরে পলাইয়া যাই; তাহা হইলে কেমন করিয়া আমার পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি তেমন সাধু পাই কোথায়; যিনি স্বর্গবাসী, যিনি পবিত্র ভাবগ্রাহী, যিনি পথের সংবাদ জানেন, যিনি সরল, শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, তেজস্বী এবং করুণাময় এমন মহাপুরুষের সঙ্গ কোথায় যাইলে পাইব; কেই বা তাঁহার সমাচার বলিতে পারে? আরও একটি গোল আছে। সাধুসঙ্গই এক মহাতপস্যা। যিনি অবিচলিত চিত্তে এই তপস্যা করিতে সাহসী, তিনি কর্ম্মের দূর বগাহ ভীষণ সাগরেও ঝম্প প্রদান করিতে পারেন। একেত আমার ধর্ম্মবুদ্ধিই নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম শাক কি কচু তাহাই জানি না; তাহার উপর কষ্ট, যন্ত্রণাদি, দুশ্চর তপস্যার বাধা বিঘ্ন। পক্ষান্তরে যদি বা অনিচ্ছায়ও দশজনের কথায় একটু সাধুতার অনুকরণ করিতে অগ্রসর হইত অমনি কোটী ২ নরকণ্ঠে আমাকে কত বিদ্রূপের কথাই শুনাইবে। কাযেই সংসারে থাকিয়া, অপার্থিব সেই স্বর্গ রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, সেই অমরাবতীর অমরত্ব পাইবার আশায় ধর্ম্ম যোগের পথে, অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাওয়া একপ্রকার বাতুলের কার্য্য।

এখন শিক্ষার কথা বুঝা আবশ্যক। লিখিতে, পড়িতে বলিতে পারিলে দশ দেশের দশটা সংবাদ রাখিলে আধুনিকের চক্ষে শিক্ষিত পদবাচ্য হওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্ম কার্য্যের শিক্ষা তাহাই, যদ্দ্বারা সদসৎ বিবেচনা শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুদ্ধি গোচর হয়, নিজের প্রবৃত্তির গতি দেখিয়া মানসিক ভাবী অবস্থা স্থির করা যায়। স্বর্ণকারের বিদ্যা যেমন অলঙ্কার প্রস্তুত করায় প্রকাশ পায়, অন্যান্য ব্যবসায়োপজীবী গণ নিজ ২ কর্ম্মের পারিপাট্য দেখাইতে পারিলে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তেমনি স্বর্গকামী নিরক্ষর হউন, বিষয় কর্ম্মে মহামূর্খ হউন কিন্তু সাধন মার্গে উপযুক্ত হইলেই তিনি সুশিক্ষিত। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যত চরিত্রবান হওয়া, বাক্যে সত্যপ্রিয় হওয়া, তেজস্বী, স্বাধীন এবং পবিত্র হওয়া। কিন্তু এই সকল মনের দৃঢ় অবলম্বন না লইলে স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম সোপানে চরণ রাখিতে পারিবে না। স্বর্গারোহণ বিদ্যার ইহাই 'ক' 'খ'। মসীমুখী লেখনী লইয়া সৌষ্ঠবযুক্ত অক্ষর বিন্যাস করায় আমাদের যেমন বাহাদুরী, সাধক তেমনি যতশীঘ্র চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া যত স্বর্গের সিঁড়িতে উঠিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন ততই তাঁহার বাহাদুরী। তবেই বুঝিতে হইবে সাধনা জগতের শিক্ষা এক অপূর্ব্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী। সৎবুদ্ধি

ইহার বর্ণ-পরিচয়; শম, দম ইহার ব্যাকরণ, আচার এবং নিষ্ঠা ইহার অলঙ্কার, জ্ঞান ও ভক্তি ইহার বৈদিক প্রকরণ। জগতের যত প্রকারের গুপ্ত এবং প্রশস্ত বিদ্যা আছে সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই কঠিন এবং দুঃসাধ্য। এ বিদ্যার প্রধান উপকরণ যে ইহাকে মাতৃজারবৎ গোপন করিয়া রাখিবে। ধীর এবং সহিষ্ণু হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে হৃদয়ের গুপ্ত মন্দিরে এ বিদ্যার সাধনা করিতে হইবে।

স্বর্গের সিঁড়িতে উঠিবার আয়োজনই ত এক বৃহৎ ব্যাপার। না জানি উঠিতে হইলে কতই অপরিজ্ঞাত বিষম যন্ত্রণা [illegible]বিতে হয়। কিন্তু শুনাযায় যে কিছু উর্দ্ধে উঠি[illegible] আর তত কষ্ট বোধ হয় না। স্বর্গদ্বারের যত [illegible]টবর্ত্তী হওয়া যায়, সুরপুরের পবিত্র পবন সঞ্চালনে পাপদেহ যতই পূত হইয়া উঠে, ততই স্বর্গারোহণ অনায়াস সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে সংসারের বিকট শব্দ যতক্ষণ কর্ণগোচর হয়, যতক্ষণ জগতের মোহময়, পাপময়, স্থূল বাতাস শরীরকে বেদনাপূর্ণ এবং দুর্ব্বল করিতে থাকে ততক্ষণ স্বর্গারোহণ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ততক্ষণ মনে হয় বুঝি স্বর্গের সিঁড়ি অসীম আকাশের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোটী ২ জীবন একমনে, অনন্য-বৃত্তিক হইয়া চেষ্টা করিলেও পরিশ্রম সার্থক হইবে না। সংসারী আমরা আমাদের চক্ষে স্বর্গের পথ বাস্তবিক লক্ষযোজন বিস্তৃত। অতি কৃচ্ছ, অতি কঠোর দুশ্চর তপশ্চারণ করিতে ২ সহস্র ২ নরজীবন অতিবাহিত করিয়া তবে সে পরমপদ লাভ করা যায়। যে অপূর্ব্ব, চমৎকার, মনোরঞ্জন পতিতপাবন স্বর্গের চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্তি আমাদের ন্যায় অধম জীবের পক্ষে যে দুরাবাধ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরন্তু এমনিই সময়ের গুণ যে সকল ব্যাপারে সকল কার্য্যেই একটা না একটা সহজ অনায়াস সাধ্য উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেও সিদ্ধি সাধনের ও সহজ পন্থা বাহির হইয়াছে। এমন কঠোর তপস্যা পাপ বলিয়া কথিত, উৎকট আত্মসংযম আত্মহত্যা বলিয়া প্রকাশিত। আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সকল পাশবপ্রবৃত্তিই তোমার বজায় থাকুক, তুমি বিলাসী হও, শত পুত্রকন্যার পিতা হও, উচ্চাঙ্গের স্ত্রৈণ হও, কোন ক্ষতি নাই, হে ঈশ্বর আমি মহাপাপী বলিয়া একটু চোখের জল ফেল, আর তোমার মহা-মহাপাপ এক মুহূর্ত্তেই বিমোচিত হইয়া যাইবে। কাযেই স্বর্গ এখন কোন প্রদেশ নহে, মনের অবস্থামাত্র। ইংরাজের আইন আদালত; তুমি নির্ভয়ে কোম্মা, কট্‌লেট, কবাব কোপ্তা ককারাদি ভোজন কর; রেসমী, পশমী, কোমল মসৃণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান কর, স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর, আর মাঝে ২ সে কালের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ধর্ম্ম কথা মুদ্রিত করিয়া, ভজনালয়ে উপাসনা করিয়া, "মহর্ষি" খেতাব গ্রহণ কর, কেহ একটি কথাও বলিবে না। এমন দিনে স্বর্গ সহজ লভ্য হইবে না কেন?

পরন্তু হিন্দু বুদ্ধিতে শত গ্রন্থি সম্পন্ন, স্মৃতি সংস্কার সমন্বিত মানব জীবনকে ধন্য করিতে হইলে শান্ত, দান্ত, ত্রিদিবনিবাসী হইতে হইলে মহাতপস্যা করিতে হইবে। কষ্ট না পাইলে, সুখ নাই, যে যত অসাধারণ কষ্ট পাইয়াছে সে তত প্রগাঢ় আনন্দ ভোগ করিয়াছে। স্বর্গানন্দ অমূল্য, অপূর্ব্ব, অসাধারণ। তুমি স্বর্গকামী, সদানন্দের ভিখারী, তোমাকে অসহ্য, তীব্র, মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, বিষম পরিশ্রম করিতে হইবে; তবে সে সুখে সুখী হইবে। একবার স্বর্গের বাতাস গায়ে লাগিলে তোমার শরীরের সুধাসৌরভে জগৎ ধন্য হইবে, তোমার তেজে পাপ ভস্মসাৎ হইবে, যে দেখিবে সেই বলিবে, তুমি গুরু, পরম গুরু পরম দেবতা।

বালা সরস্বতী।

আমি যখন ৮ হরিদ্বারে গিয়াছিলাম এবং তথায় যে স্থানে নিবাস করিয়াছিলাম, সেই গৃহেরই এক প্রান্তে চন্দ্র ভাগা নদী তট নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সস্ত্রীক স্নানার্থ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সঙ্গে সরস্বতী নাম্নী তাঁহার একটী ৪র্থ বর্ষীয়া রূপবতী কন্যা ছিল। পণ্ডিতজী জ্ঞানবান ও অতি সৎসঙ্গ প্রিয়, তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া ও কন্যাটির বিচিত্র সংস্কার দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। কন্যাটীকে আমার শিশু গার্গী বলিয়া বোধ হইল। পণ্ডিতজী বাটীতে সাধু সেবা করেন, তাই অনেক অবধূত, পরমহংস, পরিব্রাজকাদি শুভাগমন পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ পবিত্র করিয়া থাকেন। সরস্বতী তাঁহাদের নিকট বসিয়া, তাঁহাদের সদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিভা লাভ করিয়াছে। সরস্বতীর প্রকৃতিতে চাপল্য নাই; গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যই সরস্বতীর মুখের শোভা। তাহার গুটিকতক সংস্কার ও সারণীর কথা তত্ত্বজ্ঞানানুরাগী পাঠক বর্গকে আমার হরিদ্বার যাত্রার উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি।

রাত্রি ৮টার সময় যখন নীলাকাশ ফুটিয়া হাঁসিতে কুটি কুটি হইয়া চন্দ্র কিরণ মালা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, পণ্ডিতজী গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত বিবস্ত্রা বালা সরস্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর শয়ন করিয়াছেন ও আমি সেই সুদীর্ঘ ছাদে পাদ চারণা করিতেছিলাম। পণ্ডিতজী সাধু সম্ভাষণে আমাকে সরস্বতীর দিব্য বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, আমি আশ্চর্য্য বোধে সেই স্থানে বসিয়া সরস্বতীকে আদর ও স্নেহ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলাম। সরস্বতী আমার দিকে তাকাইয়া কর যোড়ে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া উঠিয়া বসিল। আমি তাহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে আসিতে সঙ্কেত করিলাম, সরস্বতী ঈষৎ হাঁসিয়া বহুদিন পরিচিতবৎ আসিয়া ক্রোড়ে বসিল। পাঠক! তৎপরে বার্ত্তালাপ শুনুন—

আমি। সরস্বতি! তুম সো গয়ীথি? [সরস্বতি! তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে]?

সরস্বতী। মৈঁ নহী সোতী হুঁ, বুদ্ধি সো জাতী হ্যায়; মৈঁ সদৈব জাগী রহতী হুঁ। ["আমি" (আত্মা) ঘুমাই না, বুদ্ধির ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেই জীব আপনাকে নিদ্রিত মনে করে, উহা বুদ্ধির সংস্কার মাত্র, "আমি" সদাই জাগ্রত থাকি]।

আমি। এ সরস্বতি! তেরী অবস্থা ক্যা হ্যায় (তোমার বয়স কত?)

সর। মেরী অবস্থা না কভী বাড়্‌তী হ্যায় য়া ঘাট্‌তী হ্যায়, মৈঁ নিত্যকাল একরস বিদ্যমান্ হুঁ। (আমার বয়স কখন কমেও না, বাড়েও না, আমি (আত্মা) চিরদিন এক ভাবে বিরাজমান থাকি)।

আমি। সরস্বতি! তুম্‌হারা পিতা কৌন হ্যায়? (তোমার পিতা কে?)

সর। ন কই মেরা পিতা হ্যায়, ন মেরী কই মাতা হ্যায়, ন মৈঁ জনমতী হুঁ, ন মৈঁ মরতী হুঁ। ("আমার" পিতাও নাই, মাতাও নাই, "আমি" জন্মিও না, আমি মরিও না)।

আমি। তুম কিস্‌কী লড়্‌কী হো? (তুমি কাহার কন্যা?)

সর। ন মৈঁ লড়কী হুঁ, য়া লড়কা হুঁ, মৈঁ চেতন রূপ হুঁ। ("আমি" কন্যাও নহি, পুত্রও নহি, আমি চৈতন্য স্বরূপ)

আমি। তুম ক্যা খাতী হো? [তুমি কি খাও]

সর। ন মৈঁ খাতী হুঁ, য়া পীতী হুঁ, ন মৈঁ চলতী হুঁ, য়া বৈঠ্‌তী হুঁ ["আমি" ভোজনও করি না, পানও করিনা "আমি" চলিও না, বসিও না]।

আমি। সরস্বতি! চারো ওর জো কুছ দেখ পড়্‌তা হ্যায়, য়ে সব্ ক্যা হ্যায়? (চারি দিকে যে সকল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্ত কি?)

সর। সব্ জড়্ হ্যায় (সমস্তই মায়া, সমস্তই অপদার্থ, জড়)

আমি। সরস্বতি! ভলা, মুঝে য়হ তো বাতাও, অগর

সবহী জড় হ্যায়, তো তুম কৌন্ হো ? (ভাল, বল তো, যদি সকলই জড় হইল, তবে তুমি কি ?)

সর। মঁয় সব্‌সে আলগ্, বিকার সে রহিত চেতনরূপ হুঁ। (" আমি " সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ)

আমি। যে ধরিত্রী, সূর্য্য চন্দ্রমা আদি লে কর অনগিন্তি চীজেঁ শূন্যপর ক্যায়সে ঠহরী হুই হ্যায় [পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র আদি অগণ্য পদার্থ শূন্য মণ্ডলে কেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে ?]

সর। জ্যায়সে সূত মেঁ মণি গুঁথে জাতে হ্যায়, ওয়েসাহী চেতন আত্মারূপ সূত মেঁ সারা জগৎ ভাসিত হোতা হ্যায়। (যেমন সূত্রে মণি মালা গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ চৈতন্যরূপ আত্মাতে তাবৎ সংসার প্রতিভাসিত হইতেছে)

আমি। য়হ জড় জগৎ কা স্বরূপ ক্যা হ্যায় ? [এ জগৎ স্বরূপতঃ কি ?]

সর। স্বরূপ করকে জগৎ কুছ হ্যায় নহি, কেবল মায়াসে য়হ দেখ্ পড়তা হ্যায়। জ্যায়সা কুণ্ডল করকে কই পদার্থ নহি হ্যায়, সোনেহী মেঁ কুণ্ডলকা ভ্রম হোতা হ্যায়, ওয়েসাহী চেতন রূপ আত্মামে নাম আউর রূপ করকে জগৎ ভাসিত হোতা হ্যায়। (স্বরূপতঃ জগৎ কিছুই নহে, কেবল মায়া বশতঃ ইহা সত্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কুণ্ডল বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, স্বর্ণেতেই কুণ্ডল ভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে এই নাম ও রূপময় জগৎ ভাসিত হইয়া থাকে।

আমি। তুম্ সাদী করোগী [তুমি বিবাহ করিবে ?]

সর। ময় স্ত্রী য়া পুরুষ নহি হুঁ, সাদী কেঁউ করুঙ্গী ? (আমি স্ত্রীও নহি পুরুষও নই, তবে বিবাহ করিব কেন ?)।

অতঃপর সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতীর অংশাবতার বোধে মনে ২' ভক্তি করিলাম ও গীতার একটি শ্লোক শিখাইয়া দিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলাম। পণ্ডিতজী বলিলেন " আজ্ মেরী সরস্বতী ভী ধন্য হুই, কেঁউ কি আপ য়্যায়সে মহাত্মাকে মুখারবিন্দ্ সে হরিদ্বার ক্ষেত্র মেঁ গীতাজীকা পঠন প্রারম্ভ উস্‌কা হুয়া "।

দীনাতিদীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

মন বল দেখি

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার !

আমি বহু দিবস হইতে, এ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু তাহা এ জড় বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠেনা ; সুতরাং অবশেষে আমাকে ব্যাকুল হইতে হয়, তখন যেন আমি অকুল সাগরে ভাসমান হইতে থাকি, এবং বহু বিধ শাস্ত্রের পথানুসরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে ; পুনরায় কিয়ৎ দিবস অতীত হইলে সে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি হয়। এই রূপে বোধ হয়, বহু জন্মান্তর বাদানুবাদে ক্ষেপণ করিয়াছি। আর অনর্থক কূট তর্কে কাল হরণ করিতে গেলে, কালও নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহা হইলেই যে আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? অতএব কেহ জান তো বলিয়া দাও ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার। যৎ কালে বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠ করিতাম, তৎকালে শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিতেন যে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়না, তিনি সকল স্থানেই আছেন, আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান, আমরা যাহা মনে ভাবি তিনি তাহা জানিতে পারেন, তিনিই সকল জীবের আহার দাতা ও রক্ষা কর্ত্তা, অর্থাৎ তিনিই ধাতা, হন্তা এবং নিয়ন্তা। কিন্তু তিনি নিরাকারই বা কি প্রকারে, তিনি কি প্রকারেই বা দেখিতে পান, কি প্রকারেই বা জানিতে পারেন, কি প্রকারেই বা তিনি আহার দেন, তাঁর কি

সদাব্রত আছে, কেনই বা তিনি দেন? এ সকল বিষয় শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় হইত। সুতরাং ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, এ বিষয়ের সন্দেহ তখন আমার হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই, অতএব কেহ যদি জান তো বলিয়া দাও, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? সাধু, মহাত্মা, যোগী, অনুভবী! তুমি যাহা বলিবে তাহা অন্যকে বলিব না, কারণ তাহা হইলে পুনরায় ঘোর তর্ক জালে আমাকে জড়ীভূত করিবে, তুমি যাহা বলিবে তাহা অতি গোপনে হৃদয়ের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিব, অতএব তুমি বল, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার। নিরাকার হইলে কি আকার থাকা সম্ভবে না? তাঁহাতে যদি আকারের বীজ না থাকিত, তিনিই যদি এতদাকারাকারিত না হইতেন, তাঁহা হইতেই যদি আকার রাশি নির্গত না হইত; তবে আকারাবলি কোথা হইতে আসিল? সেই জগৎ পাতা বিধাতা কখন কোন্ ভাবে কোথায় অবস্থিতি করেন, কোন সময়ে কোন আকার ধারণ করিয়াছিলেন এবং কোন সময়েই বা কোন আকার ধারণ করিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা তিনি ভিন্ন কোন মানব প্রকৃতির স্থির করিবার সাধ্য নাই। তবে যিনি তাঁহার ভক্ত তিনিই তাঁহার অপার মহিমা বর্ণনে সক্ষম, কেন না, ভক্তাধীন গোবিন্দ, ভক্তকেই সমস্ত বিষয় অবগত করান। জগৎ পাতার নিরাকার আকারের মধ্যে সাকার দর্শন করা কি বাহ্য জ্ঞানের দ্বারা সম্পাদন হইতে পারে? এবং নিরাকার বিধাতার যে আকার ধারণ করা অসম্ভব নহে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? যে গোলাকার একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে পর তাহাতে কুসুম কলিকা প্রকাশিত হইয়া মন হরণ করে, এবং কুসুম কলিকা সকল যে বহু মূলের উৎপাদক হয় তখন কি এক বিশ্ববীজ বিধাতা বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত গণের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন না? আর যখন তিনি "একোহং বহুস্যাম্" এক হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি আকার ধারণ করেন নাই? আরও বলি, যে 'আমার' এই দুইটি চক্ষু, সংসারের মধ্যে কোন বস্তুকে নিরাকার ভাবে দর্শন করিতেছে? ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতাত্মক পৃথ্বীর মধ্যে কোনটী নিরাকার? যদ্যপি স্বীকার কর যে কোন বস্তুই নিরাকার নয়, সকল বস্তুই সাকার, তাহা হইলে আমার ঈশ্বর কি প্রকারে নিরাকার হইলেন, তিনি ত সকল বস্তুতেই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার সৃষ্ট অসংখ্য বস্তুতে অসংখ্য আকার রূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণু রূপে বিদ্যমান আছেন, আর যদ্যপি সকল বস্তুতেই ঈশ্বর থাকিলেন, তাহা হইলে আমি যে সকল বস্তুকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিব, তাহাতে কি জগৎপাতার বাসকরা তোমার নিকট অসম্ভব হইতে পারে? এখন বুঝিয়া লও, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার। আমি দেখিতেছি সাকার নিরাকারে ও নিরাকার সাকারে বিরাজ করিতেছেন।

বাউলে সুর! তাল গড় খ্যামটা!

"কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি [ও মন]। তুমি পারিবে চিন্‌তে কি চিন্তামণি [সে যে চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি]। তিনি সাকার কি নিরাকার, ও মন, কেবা তত্ত্ব জানে তার, সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি [তিনি]॥ গহন বিজন বনে, যোগে—বসিয়া একান্ত মনে, পায় না সমাধি ধ্যানে, ঋষি কি মুনি [তাঁরে]॥ প্রেমময় করুণাসিন্ধু, হরি—অনাথের নাথ দীনবন্ধু, যাঁর প্রেমে পাগল শম্ভু, ত্রিশূল পাণি। কুবাসনা পরিহর, ও মন, প্রেমের হার গলায় পর, হইবে হৃদয়ে সেরূপ উদয় আপনি [দেখ্‌বে]॥

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

ধর্ম্মোৎসব।

জলন্দর শহর ও বস্তী।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয়

জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্টে দুই দিন জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিলে পর তথা হইতে ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরের ধর্ম্ম সভায় উপদেশ দিবার জন্য সভ্য ও সম্ভ্রান্ত-বর্গ কর্ত্তৃক আহূত হয়েন। সহরে ৩ দিন ও সহর হইতে ক্রোশেক দূরবর্ত্তী বস্তী নামক স্থানে ১ দিন পরিব্রাজকের সুধাময়ী বক্তৃতায় লোক মণ্ডলী বহু দিনের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিয়াছিল। মূর্ত্তি পূজার সার্থকতা, যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা প্রদর্শন এবং ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাসে এই চারিদিন পঞ্জাব নিবাসী বর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবী শিক্ষিত ধর্ম্মাত্মগণ পরিব্রাজক মহোদয়কে যথোচিত সৎকার করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে প্রত্যহ সহরে যে চেরিয়ট গাড়ীতে পরিব্রাজক মহাশয় সহচর বর্গ সহ যাইতেন, তাহার পশ্চাতে চামর ব্যজন ও আগে২ ইংরাজি বাদ্য হইত, দুই পার্শ্ব হইতে ধর্ম্মাত্মাগণ ও দ্বিতলস্থ বাতায়ন হইতে পুরমহিলাগণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্ব্বক ভগবদ্গুণ-ব্যাখ্যাতা কুমারের সম্মানার্চ্চনা করিয়াছিলেন। কপুরথলা রাজ ও অন্যান্য কতিপয় স্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় যত্ন হইয়াছিল, কিন্তু অনবকাশ বশতঃ উক্ত পরিব্রাজক যাইতে পারেন নাই। পঞ্জাব প্রদেশে কোন বাঙ্গালীকে ইতি পূর্ব্বে আর এরূপ সম্মানিত হইতে দেখা যায় নাই। জলন্ধর বাসী গণের আকাঙ্ক্ষা, আর একবার যেন কুমার-পরিব্রাজক এ প্রদেশে শুভাগমন করেন। ইতি

শ্রীহরি দাস বসু।

কলিকাতা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হইতে চারি দিবস "চালদা বাগান সাধারণ হরি সভার নবম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সুললিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণের পূজা, অষ্ট প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা এবং অন্ধ আতুর দিগকে অন্ন বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ কর এবং ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ কর মহাশয় দ্বয়কে তাঁহাদিগের যত্নপূর্ণ এতদ্ব্যাপারের বহন জন্য, আমরা শতশঃ সাধুবাদ প্রদান করি। ইতি

পায়রাগাছা।

৩১ এ বৈশাখ হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এখানকার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার অষ্টম বার্ষিক মহাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব কালে শ্রীমন্নারায়ণের যোড়শোপচারে পূজা, প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবতীয়া কথা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, কয়েক দিন শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন ও দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ হইয়াছিল।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সিমলাপাহাড়।

সিমলা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কুমার-পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী জলন্ধর হইতে এখানে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে ১২ দিন মাত্র অবস্থিতি করেন এবং যুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ ৭ টা মধুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা ৩ টা বাঙ্গালা ভাষায় এবং হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবী গণের অনুরোধে অপর চারিটী হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। স্বধর্ম্ম রক্ষা, আশ্রম ধর্ম্ম, আর্য্য শাস্ত্র, কৃষ্ণ লীলা, মুক্তি ও ভক্তি, প্রভৃতি মধুরাশয়-পূর্ণ ব্যাখ্যান রাশি সিমলা নিবাসী গণকে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছে। দয়ানন্দী দল তাঁহার সুতীব্র সদ্যুক্তিপূর্ণ মূর্ত্তী পূজাদির অনুকূল বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়াছে। বলিতে কি, সিমলা পাহাড়ে হিন্দু ধর্ম্মের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী বিপুল আন্দোলন আর কখনও হয় নাই। স্বামীজীর বক্তৃতার মাধুর্য্যে এখানকার কি বাঙ্গালী কি পঞ্জাবী সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিয়োগ-বৈধুর্য্য ক্লেশ অনুভব করিতে-

ছেন। এখানে অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশ শুনিবার জন্য আফিস হইতে বাটী যাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই আফিসের পরিচ্ছদে রাত্রি ৮ টা, ৯ টা পর্য্যন্ত একাগ্র চিত্তে সভায় উপস্থিত থাকিতেন। স্বামিজীর শুভ সমাগমে পঞ্জাবী দিগের " সনাতন ধর্ম্ম সভা" ও বাঙ্গালী দিগের "সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভায়" একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জ[illegible]ছে। ৺ কাশীধামে পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের পুষ্টিবদ্ধ-নাথ এখান হইতে যথা সাধ্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বরেই পাঠাইবার বাসনা আছে। ইতি

শ্রীউপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বারাণসী।

১৯ এ হইতে ১২ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত হরিনাম প্রদায়িনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব অতিসমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উৎসবে অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথাদির পূজা, বেদ পাঠ, পণ্ডিত বিদায়, শ্রীযুক্ত দীন নাথ বেদান্ত বাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক "ধর্ম্মরাজ্য" বিষয়িণী বক্তৃতা এবং নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। আর হইয়াছিল, সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক সভার বার্ষিক বিবরণ ও যুগধর্ম্ম ও যুগাবতার বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ এবং "মধুরেণ সমাপয়েৎ" কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজী পরিব্রাজক কর্ত্তৃক "ভবৌষধ" বিষয়িণী জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিরস মাখা বক্তৃতা।

বেদ বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় মাহ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

মুষ্টি ভিক্ষার আয়।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
শ্রীঈশানচন্দ্র রায় সরারচর মৈমনসিংহ	৩৷০	
" জগবন্ধু দত্ত লালাবাজার শ্রীহট্ট	১৷০	
" গৌরসুন্দর সেন ফতেপুর দুমকা	১৫৲	
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	১৫৷৵০	
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসত	৸৶০	
" লালা শিতলপ্রসাদ দুমকা	২।০	
" রাখালদাস সেন জামালপুর	৩৲	
" দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পালরা কেন্দুয়া	২৲	
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল ভালুকা রামগোপালপুর	১৸০	
" হরিদাস সরকার ভেরিয়াডেঙ্গি পূর্ণিয়া	১।০	
" আদ্যনাথ বিশ্বাস লোকনাথপুর	১৷০	
" হরিমোহন সেন শিলচর	৪৲	
" বিপিন বিহারি রায় গয়া	৶০	৶০
" প্রসন্নকুমার দাস কাছাড়	১০৲	
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৬৷৴১০	৪৷০
" কালীপদ্ম পাল শ্রীফলা ঐ	।৴১০	
" মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী দুর্লভপুর বীরভূম	৪৸৴০	
" হরলাল দাস গুপ্ত ধুবড়ি	৬৸৶০	
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	।৴০	
" বনমালী মুখোপাধ্যায় সেনড়া মুজাপুর	১৸৶০	
" রমনীমোহন বসু দিনাজপুর	৮৷৶০	
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ভালাইপুর নদিয়া	৭৲	
" বকসি রামদাস গোলা হাজারিবাগ	১৮৷৶০	
" গোবিন্দচন্দ্র সুর শ্যামপুর বরীশাল	৩৷৶০	
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর ঢাকা	১৷০	
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল		১০৲
৺ কাশীধামের ফাল্গুণ ও চৈত্র মাহার		৩৪৴৫
শ্রীতারকব্রহ্ম সেনগুপ্ত সালিখা		১০৲
" জগবন্ধু মজুমদার নারায়ণগঞ্জ		১৸০
" বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত পাটুয়াখালী বাখরগঞ্জ		৩৲
" মধুসূদন দাস গোয়ালপাড়া		১০৲
" প্রসন্নকুমার পায়ঙ্গা চাকলা ২৪ পং		৮৸৶০
" নবীনচন্দ্র দে হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট		৫৲

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
" যামিনী মোহন ঘোষ কোন্নহাটী ঢাকা		১॥৶০
" কৃষ্ণচরণ ধর শ্রীহট্ট		১/০
" কৈলাসচন্দ্র মৈত্র ও যদুনাথ সাহা চৌধুরী ডাঙ্গা পাড়া		৭৲
" রামসুন্দর দে নেত্রকোনা ময়মনসিংহ		১৲
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা বীরভূম		২৪৲
" যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইরিকাটী ফরিদপুর		১৸৶০
" যোগীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কলিকাতা		।০
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া		৫৲
" নবিনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তেজপুর		২৲

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
শ্রী কালীচরণ সেন গৌহাটী	১/০	
" কালীচরণ পাল শ্রীহট্ট	/০	
" ভূতনাথ হালদার শিবপুর	২৲	
" সুরেন্দ্রকিশোর দাস [illegible]	৶০	
" মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়া	১৲	
" গোবিন্দচন্দ্র সুর শ্যামপুর বরীশাল	৩৲	
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর		১৲
" সারদাসুন্দরী দেবী কাশীধাম		১৲
" মাতাময়া দেবী ঐ		১॥০
" সামান্যদান রামপুরহাট		॥০

মাসিক বৃত্তি।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গাধীশ দং মার্চ্চ ও এপ্রেল ও মেই	৪০৲	২০৲
" কাকনীয়াধীশ দং লবঙ্গসুন্দরী বৃত্তি চৈত্র ও বৈশাখ		২০৲
" বসন্ত কুমার মৈত্র দং ১২৯৬ ফাল্গুন হইতে ১২৯৭ চৈত্র তক	১৫৲	
	১৮৪॥৶০	১৭৮৸/৫

ব্যয়।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
মাসিক দক্ষিণা	৩৩৲	২৭॥০
ছাত্র বৃত্তি	১১৲	৩৪৸১০
নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারি	৮৲	১০৲
মাসুল	১৸৶০	৸০
ক্ষুদ্র ব্যয়	১১।৫	৯৶১০
জমা	৮০০৲	১৫০
ছাত্রাবাস খরচ		৩৩৶১৫
ছাপাই খরচ		১৲
	৮৬৫৶৫	২৩৬।৶১৫

মোলাসা।

জমা		খরচ	
মাহ বৈশাখ	১৮৪॥৶	মাহ বৈশাখ	৮৬৫৶৫
চৈত্র মাহার উদ্বৃত্ত	৮১৮/৫	মাহ জ্যৈষ্ঠ	২৩৬।৶১৫
মাহ জ্যৈষ্ঠ	১৭৮৸/৫		১১০১।৶
	১১৮১॥১০	মজুদ তহবীল	৪৯৸৶১০
			১১৮১॥১০

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।

ধর্ম্ম প্রচারক

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥" শ্রুতিঃ

কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচি।

১৪শ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।
শ্রাবণ মাস, শঃ ১৮১৩।

বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাশুল সহ মূল্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামীকৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপনী' নামক উপাদেয় ভাষাতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত।	৭৲
ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ) ...	॥/০
নিত্য কর্ম্মেন্দু কৌমুদী (২য় সংস্করণ)	৷৶০
স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ...	৶০
রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ) ...	।০
মনিরত্ন মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ)	/০
শ্রাদ্ধতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ)	/১০
হরের্নামৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ)	/১০
সন্ন্যাসী	৶০
পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১ম২য়৩য়৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ)	৶০
গীতা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ) ...	/১০
একতারত কাব্য ...	৶০
নীতিরত্ন মালা ...	।০
বক্তৃতা ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক কৃত) ...	।৶০
অন্নপূর্ণাদির-স্তোত্র (২য় সংস্করণ)	/১০
গৌড় পাদীয় আগম (বঙ্গানুবাদ সহ)	।৶০
যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ) ...	।৶০
ধর্ম্ম প্রচারক (মাসিক পত্র)	
উত্তম কাগজে মুদ্রিত ... বার্ষিক	৩।৶০
মধ্যম ঐ ঐ	২।৶০
সাধারণ ঐ ঐ	১।৶০
পঞ্চামৃত	।/০
শিবলিঙ্গ-পূজনবিধি (২য় সংস্করণ)	১৲
শ্রীমতি ও সুমতী উপাখ্যান (যাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩)	/১০
গীতাঞ্জলি	।০
তন্ত্রতত্ত্ব	৩৲
৺ অন্নপূর্ণার ছোট ছবি (কার্ডের উপর সুন্দর রূপে চিত্রিত—৫ খানির অধিক লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না)	৶০
মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ফটোগ্রাফ	।৶১০
ষট্‌চক্র	।০
বক্তৃতা ২য় খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত)	।০

চিঠি লিখিবার কাগজ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত প্রত্যেক পাকেটে ৫ দিস্তা।

বড় আকারের মূল্য ।১০ ডাক মাশুল—/১০ মোট—।৶০

ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।৶১০ মাশুল /১০ মোট—॥০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ৶১০ মাশুল /০ মোট—।১০

ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।১০ মাশুল /০ মোট—।/১০

মূর্ত্তি হীন কেবল পাচরঙ্গা ৫ দিস্তা প্যাকেট

বড় আকারের মূল্য ৶০ মাশুল—/১০ মোট—।১০

ছোট আকারের মূল্য ৶১০ মাশুল /০ মোট—৶১০

নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

যন্ত্রাধ্যক্ষ

কাশী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

—·····○❀○·····—

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৪শ ভাগ
৪র্থ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১৩
শ্রাবণ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্র বর্ত্তিনঃ॥

জলপান নিরত গাভীকে উত্যক্ত করিবে না, কুপথ দিয়া কোথাও প্রবেশ করিবে না এবং লুব্ধ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ-পথচারী রাজার দান গ্রহণ করিবে না।

প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যা নরাধিপাঃ।
দুষ্টাদশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথাক্রমং॥

কসাই, তৈলকার, শৌণ্ডিক, বেশ্যা ও রাজা এই পাঁচ জনের দান গ্রহণে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়ে ও দ্বিতীয়াপেক্ষা তৃতীয়ে এই রূপ ক্রমান্বয়ে দশ দশ গুণ অধিক দোষ হইয়া থাকে।

অধ্যায়ানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।
হস্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু॥

বেদাধ্যয়ন বা ঔষধ সেবন আরম্ভ করিতে হইলে শ্রাবণী পূর্ণিমা বা শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত অন্য দিনে অথবা হস্তানক্ষত্র যুক্ত শ্রাবণী পঞ্চমীতে করিবে।

পৌষ মাসস্য রোহিণ্যাং অষ্টকায়ামথাপি বা।
জলান্তে ছন্দসাং কুর্য্যাত উৎসর্গং বিধিবদ্বহিঃ॥

পৌষমাসীয় রোহিণী নক্ষত্রে অথবা অষ্টমী তিথিতে গ্রামের বহির্ভাগে জলাশয় সমীপে বিধি পূর্ব্বক বেদোৎসর্গ করা কর্ত্তব্য।

ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিক্ গুরু বন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখা শ্রোত্রিয়ে তথা॥

শিষ্য, ঋত্বিক গুরু ও বন্ধুর মরণ উপস্থিত হইলে বা মরিলে বেদের নিজ বা পরকীয় শাখার পাঠনারম্ভ বা উৎসর্গ কালের তিন দিন অনধ্যায় করিবে।

সন্ধ্যাগর্জ্জিত নির্ঘাত ভূকম্পোল্কা নিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যক মধীত্য চ॥

সন্ধ্যাগর্জ্জন বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা উল্কাপাত হইলে, বেদাধ্যয়ন সমাপ্তই হউক অথবা আরণ্যক শেষই হইয়া যাউক, একদিবা রাত্রি অনধ্যায় করিবে।

পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ, ঋতু সন্ধিকালে এবং যদি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন বা দান গ্রহণ করিয়া থাক, তবে এক দিবা রাত্রি বা অনধ্যায় করিবে।

পশুমণ্ডুক নকুল মার্জ্জার শ্বাহিমুষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে॥

'শক্রোষ্ট্র গর্দ্দভোলুক,সামবীণার্ত নিঃস্বনে।
অমেধ্যশব শূদ্রান্ত্য শ্মশান পতিতান্তিকে ॥
দেশে শুচাবাত্মনি চ বিদ্যুৎ স্তনিত সপ্লবে।
ভুক্তার্দ্রপাণি রম্ভোন্তরর্দ্ধরাত্রেতি মারুতে ॥'
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে সন্ধ্যানীহার ভীতিষু।
ধাবত পূতি গন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহে মাগতে ॥
খরোষ্ট্রযান হস্ত্যশ্চ নৌবৃক্ষে রিণ রোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেতাং স্তাৎকালিকান্ বিদুঃ ॥

অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার সময় যদি পঠন পাঠনশীল ব্যক্তি গণের মধ্যে দিয়া পশু, ভেক, নেউল, কুক্কুর, মার্জ্জার, সর্প চলিয়া যায় আর ইন্দ্রধ্বজ উচ্চ বা নিম্ন করে, তবে এক অহোরাত্র অনধ্যায় করিবে। যদি কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেচকের ও সামবেদবংশীর ধ্বনি বাকাহারও আর্ত্তনাদ শ্রুতি গোচর হয়, কিংবা যদি শূদ্র, অন্ত্যজ, শ্মশান, আর পতিত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হয়, অথবা স্থান ও দেহ যদি অপবিত্র থাকে, বারম্বার বিদ্যুদ্বিকাশ মেঘ গর্জ্জন হয় বা ভোজনান্তে আর্দ্রহস্ত বা জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, যদি অর্দ্ধ নিশিতে অতি-বাত প্রবাহিত হয়, যদি ধূলি বৃষ্টি বা দিগ্দাহ হয়, যদি প্রাতঃ সন্ধ্যায় নীহার পাতের আশঙ্কা হয়, কেহ দৌড়িতেছে, বা দুর্গন্ধ আসিতেছে, অথবা কোন ভদ্র অভ্যাগত যদি কেহ সমাগত হইয়া থাকেন আর যত দিন গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রথ হস্তী, অশ্ব, নৌকা আদিতে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, এই ৩৭ ব্যাপারে অনধ্যায় করিবে।

ক্রমশঃ।

জীবন ও মরণ।

মনুষ্য বাঁচিতে চায় কেন ? কি সুখে কি আশা ভরসায় মোহিত হইয়া মানুষ এ কর্ম্মক্ষেত্রে দীর্ঘ জীবী হইতে চায়, একথার সদুত্তর কেহ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারে না। দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির বজ্রাঘাতে মনঃ প্রাণ অবিরত শীর্ণবিশীর্ণ হইতেছে, অবসাদ নৈরাশ্যের নিবিড় কালিমাস্তূপে অন্তরাত্মা ডুবিয়া রহিয়াছে, দুশ্চিন্তার তীব্র বৃশ্চিক দংশনে অন্তস্তল জ্বলিয়া ২ যাইতেছে, তথাপি মানুষ বাঁচিবার জন্য লালায়িত ! সংসার সংগ্রামের ভীষণ ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত্ত নিপতিত তৃণের ন্যায় এ জীবন তরণি প্রতি নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, কর্ম্মরাশির ঘর্ঘর চক্রে অবিশ্রান্ত মনুষ্য-জীবন পিষ্ট পেষিত হইতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষণেকের জন্যও স্থির হইবার যো নাই, কেবল চাঞ্চল্যময় পরিবর্ত্তন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে, তথাপি মনুষ্য প্রাণে বাঁচিবার সাধ ! আশ্চর্য্য প্রহেলিকা ! প্রতি পলে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনের তীব্র প্রবাহ জীব জীবনকে কোথায় উধাও করিয়া লইয়া যাইতেছে, আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, ছড় ২ ছড় ২ করিয়া দুকূল ভাঙ্গিয়া কাল প্রবাহ মনুষ্য জীবনকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কত মরু প্রান্তরের উপর দিয়া কত শবকঙ্কাল পূরিত শ্মশান ভূমির উপর দিয়া কত কৃমিকীটের কিলিবিলিময় প্রেত পল্লির, কত জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের উপর দিয়া ভিতর দিয়া দুর্নিবার্য্য অদৃষ্ট চক্র কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মনুষ্য জীবনকে হড় ২ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এত যাতনা এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও মনুষ্য সংসারে স্থিতিশীল হইতে চায়, চিরদিন দারুণ দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়াও মনুষ্য জীবনের ভিখারী ! তপ্ততৈল পূর্ণ কটাহে চির দিন কাটা কৈ মাছের মত ছটপট্ করিয়াও মানুষ বাঁচিবার বাসনা কেন করে, একথার উত্তর কেহ দিতে পারে না।

মনুষ্যের জীবন একটি কঠোর তপস্যা। এমন তপস্যা বুঝি আর হয় না। আর্য্য ঋষি যে তপস্যা করিতেন, আমাদের মত সংসারী জীবের জীবন তপস্যা তাহাকেও হারাইয়া দিয়াছে। কৃচ্ছ্র সাধনাই ত তপস্যা, গভীর কষ্টের হ্রদে নিমগ্ন হইয়া কোন

উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টাই ত তপস্যা। ইহাই যদি তপস্যার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমাদের মত সংসারী জীব অপেক্ষা তপস্বী আর কে আছে ? ধনজন সম্পত্তিরূপ সুখময়ী-বিকার আশায় আমরা কিনা করি ? আমরা সাগর ছেঁচিয়া মাণিক উঠাইতে চাই, শত বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াও আমরা অর্থোপার্জ্জন করিতে লালায়িত হই। সংসারের প্রখর সূর্য্য কিরণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা সর্ব্বদাই ত পঞ্চতপা। আমরা এই তপস্যার বিনিময়ে চাই সংসারের ক্ষণিক সুখ। আর্য্য ঋষি তপস্যার বিনিময়ে চাহিতেন নিত্য স্থির সুখ। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সুখের তুলনায় তাঁহার তপস্যার কষ্ট লঘুতর, অতএব তাঁহার তপস্যা ততটা গুরুতর কঠোর নহে। কিন্তু আমরা যে সুখের ভিখারী, তাহার তুলনায় আমাদের তপস্যার কষ্ট অনেক গুরুতর, সুতরাং এমন কঠোর তপস্যা আর হইতে পারে না, তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর্য্য ঋষি অপেক্ষা আমরা কঠোর তাপস। এক জন সম্রাট এক জন ফকীরকে বলিয়াছিলেন আপনি বেশ ত্যাগী পুরুষ, আপনার মত ত্যাগী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে ফকীর হাঁসিয়া বলিলেন, আমি ত্যাগী পুরুষ নহি, আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ। আপনার ত্যাগশক্তির কাছে আমরাও পরাজিত। সম্রাট বিস্মিত হইয়া বলিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি ? আমার মত পরম ভোগী পুরুষকে আপনি ত্যাগী বলিলেন কিরূপে ! ফকীর বলিলেন, আমরা অমূল্য সম্পত্তি ব্রহ্মপদ পাইবার জন্য সামান্য তুচ্ছ সংসার সুখকে ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র ত্যাগ, কিন্তু আপনি অমূল্য ব্রহ্মপদকে তুচ্ছ বোধে ত্যাগ করিয়া সামান্য সংসার সুখে রত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ বড়। আপনি ক্ষুদ্র সম্পত্তির জন্য মহান্ সম্পত্তিকে ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ শক্তির কাছে আমাদের ত্যাগ শক্তি পরাজিত। ফকিরের ভাবে বুঝিতে হয়, সংসারী জীবের জীবন তপস্যাই প্রকৃত কঠোর ; কেননা ইহা বর্ত্তমান ও উত্তরকালে চারিদিকেই কষ্টময়। আর্য্য ঋষির তীব্র তপস্যা ততটা কঠোর নহে, কেননা তাহার পরিণামে সুখ আছে।

ভোগ কালে ও পরিণামে যাহা কেবলই দুঃখময় সেই জীবনের প্রেমে কি জানি কেন জগৎ মুগ্ধ। জীবন জীবন করিয়া জগৎ পাগল ! পশু পক্ষী তরু লতা, পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী গ্রহ নক্ষত্র চেতন অচেতন সকলেই জীবনের জন্য লালায়িত। সকলেই স্থিতিশীল হইতে চায়, ধ্বংস কেহ চাহেনা। সকলেই অবিনশ্বর হইতে চায়, অমর হইতে চায়। বুঝি না জীবনে কি অমৃত আছে, কি কুহক আছে, তাই তাহার টানে জগৎ মাতোয়ারা। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সম্রাট কি ভিখারী সকলেই সমান ভাবে জীবনকে ভালবাসে। কুষ্ঠ রোগে যাহার সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়াছে, তীব্র যন্ত্রণায় মর্ম্মগ্রন্থি যাহার খসিয়া যাইতেছে, আজীবন অন্তর্নিহিত অগ্নিরাশির জ্বালা মালায় যে পুড়িয়া খাক্ হইতেছে তাহার পক্ষেও জীবন যেমন স্পৃহনীয়, কলকণ্ঠী কামিনীর ভুজপাশে জড়িত বিলাসী যুবারও জীবন তেমনই স্পৃহনীয়, জীবনের মিষ্টতা জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, জীবনের মাধুরী জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ভিখারীর জীর্ণ কুটির হইতে রাজরাজেশ্বরের বিলাস মন্দির পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বত্র সমান আধিপত্য। ধনজন পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে জীবনের দীপশিখা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, জীবনের উপকরণ রাশি যেমন প্রতিভাত হইয়া থাকে, ঘোর গহন কাননের নিবিড় নীরবতার মধ্যেও সেইরূপ সমান ভাবে জীবনী শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। জীবনকে পাইবার জন্য জীবনের ক্ষেত্রকে পরিসর করিবার জন্য জীবনের অনুপান রাশিকে বাড়াইবার জন্য জীব জগৎ অবিরত চেষ্টা পরায়ণ ; মরণকে তাড়াইবার জন্য জগতে চির দিন সংগ্রাম চলিয়া

আসিতেছে। মরণের ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তির দিকে জগৎ সভয় চকিত নেত্রে তাকাইয়া থাকে। মরণের নিমাক্ত স্পর্শে দুর্ভেদ্য প্রস্তরময় প্রাচীর দিয়া জগৎ আটকাইয়া রাখিতে চায়। মরণকে দূরে রাখিয়া জীবনকে সাদরে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য জগৎ ব্যস্ত।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মৃত্যু এত ভয়ের জিনিষ! মৃত্যু রাজ্য বাস্তবিকই কি এতই ভীষণ। কে জানে! কে বলিতে পারে? মৃত্যু ধাম হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত মৃত্যুর ভয়ানকত্বের সাক্ষ্য দিত, তাহা হইলে সে প্রত্যক্ষপ্রমাণের উপর আর কোন কথা চলিত না। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর একটা বিকট মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে যদি ধরা হইয়া থাকে, ত সে অনুমান সে যুক্তি কতটা টেকসই, কতটা অখণ্ডনীয়, তাহা একবার দেখা চাই। প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই দুরবগাহ। পরিবর্ত্তন শীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তভিত্তি স্থাপন করা আর বালুকাস্তূপের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা। আজ তোমার কল্পনা অপরিপুষ্ট চিন্তা যে তত্ত্বকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিল, কল্য দেখিতেছি তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তোমার অপরিপুষ্ট চিন্তার উপর অনুমিতির উপর বিশ্বাস কি? নিজের মনকে এবং অপরকে কোনরূপে বুঝাইতে পারিলেই যে সেই বুঝান জিনিসটা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে এমন কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। মৃত্যু সম্বন্ধেও সেই কথা। আজ মৃত্যু-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে রূপ চিন্তা, যে রূপ ধারণা প্রবাহিত হইতেছে, কল্য যে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না কে বলিল? সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধে যে যুক্তি লইয়া তুমি একটা বিভীষণ চিত্র খাড়া করিয়াছ, তাহাই যে ঠিক, তাহাই যে অকাট্য সত্য, একথা তুমি শতবার বুক ফুলাইয়া বলিলেও আমি মানিতে পারি কৈ?

এখন মৃত্যু তত্ত্ব একটু বিচার করা যাক। আর্য্য শাস্ত্র বলেন, আত্মার (লিঙ্গ শরীরের) সহিত দেহে-ন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম জন্ম, আর দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইতে বিচ্যুতির নাম মৃত্যু। সুতরাং সোজা কথায় আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে। আত্মার ভৌতিক দেহ অবস্থায় স্থিতির নাম জন্ম, আর তদ্বিচ্যুতির নাম মৃত্যু। মৃত্যু কালে আত্মা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যায় মাত্র, একটা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ নূতন বস্ত্র গ্রহণ করেন, সেই রূপ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা নূতন দেহ ধারণ করেন। সুতরাং বস্ত্রান্তর গ্রহণের ন্যায় আত্মার দেহান্তর গ্রহণের নাম মৃত্যু। অতএব পরিবর্ত্তন ছাড়া অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে। এই পরিবর্ত্তনকে মানুষ এত ভয় করে কেন? যে পরিবর্ত্তন যে পরিণাম-বাদ সৃষ্টি তত্ত্বের মূল নীতি, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতি অণু পরমাণুতে যে পরিণাম রেখা বিজড়িত, সেই স্বভাব সূত্রে চির অভ্যস্ত চির পরিচিত নিয়মের উপর মানুষের এত ভয় কেন? বাল্যাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন যৌবনাবস্থার উদ্ভব হয়, আবার যৌবনাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন বৃদ্ধাবস্থার উৎপত্তি হয়, তখন সে অবস্থা পরিবর্ত্তনকে ত মানুষ ভয় করে না। বালক যৌবনাবস্থায় মরিয়া যায়, যুবা বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়া যায়, কৈ এ মৃত্যুকে ত কেহ ভয় করে না। সেই রূপ বৃদ্ধাবস্থা মরিয়া গিয়া আত্মা যদি কোন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হন ত তাহার জন্য ভয় হইবে কেন। দেহ ছাড়া যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহাদের মতে দেহের ধ্বংস হইলেই সব ফুরাইয়া গেল, মরণকে তাঁহারা ভয় করিতে পারেন, কিন্তু আত্মবাদী হিন্দু আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস-শীল হিন্দু মরণকে ভয় করিতে পারেন না। যাঁহার দৃষ্টি শক্তি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া থাকে, তাঁহার

চক্ষে সূর্য্য যেমন কখনও অস্ত যান না, এক স্থানে অস্ত যাইলেও অন্য স্থানে সূর্য্য যেমন উদিত হইতেছেন, সেই রূপ আত্ম-চক্ষু হিন্দুর চক্ষে আত্মা এক দেহে এক স্থানে অস্তমিত হইলেও অন্যস্থানে অন্যদেহে অন্য যোনিতে উদিত হইতেছেন। সূর্য্যের উদয় অস্ত যেমন ব্যাপার, আত্মার দেহ ধারণ ও দেহ পরিত্যাগ রূপ জীবন মরণও তেমনই একটা ব্যাপার মাত্র, সুতরাং আস্তিকের পক্ষেত কোন ভয়ের কারণ নাই। মৃত্যুর পর পাপীর নরক যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে, পুরাণ এই রূপ একটা ভয়ের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই তাহাতেও ত কোন ভয়ের কারণ নাই। আমরা মনুষ্য হইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন পাপাংশ ও পুণ্যাংশ উভয়েই আমাদের আছে। যদি পাপাংশ কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে দেবতা হইয়া জন্মিতাম, যদি পুণ্যাংশ কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে পশুপক্ষী কীটাদি নীচ যোনিতে জন্মিতাম। সুতরাং পাপ ও পুণ্যের অংশ লইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন পরজন্মে এই পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে। বর্ত্তমান জীবনে যেমন পূর্ব্ব-জন্মের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছি, আগামী জন্মেওত সেই রূপ পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিব। ইহ জীবনে যেমন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, পর জীবনেও তেমনই সুখ দুঃখ ভোগ করিব। ইহ জীবনে যেমন কামিনী কাঞ্চন লইয়া সুখ ভোগ করিতেছি, আগামী জীবনে সেই রূপ রম্ভা তিলোত্তমা পারিজাত লইয়া আনন্দ ভোগ করিব। আবার ইহ জীবনে রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণায় যেমন পুড়িয়া মরিতেছি, আগামী জীবনে সেই রূপ কুম্ভীপাক রৌরবের দুঃখ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিব। ইহ জীবনের দুঃখ যাতনা যেমন আমাদের সহ্য হইয়া যাইতেছে, তেমনই পর জীবনের দুঃখকষ্টও সহ্য হইয়া যাইবে। ইহ জীবনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য যেমন আমাদের অনুভব শক্তি তদুপযোগী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, পর জীবনেও সেই রূপ হইবে। মনুষ্য হইয়া বিষ্ঠার রস অনুভব করিতে গেলে দারুণ কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু বিষ্ঠার কীট হইয়া বিষ্ঠার রস আস্বাদ করিলে তাহাতে দুঃখ হইবে কেন? সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করিতে হইবে কেন? বর্ত্তমান জীবনে এমনি কি সুখের সাগরে ভাসিতেছি, যে পর জীবনে তাহা ঘটিবেনা বলিয়া ভীত হইবার কারণ আছে। দুঃখ চারিদিকেই ত আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, বিষাদের প্রেত মূর্ত্তি চারিদিকেই ত নৃত্য করিতেছে। যখন যে দুঃখ আসে, তখনই তাহা তীব্রাতিতীব্র বলিয়া বোধ হয়। তোমার এক মাত্র পুত্র মরিয়া গিয়াছে, তোমার এক মাত্র জীবনের ধ্রুবতারা কালের বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তোমার সাধের মণি তোমার বক্ষে শূলাঘাত করিয়া কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি যে যাতনায় পুড়িতেছ, বল দেখি তোমার সে যাতনা সে কষ্ট শত সহস্র রৌরব নরকের যাতনা অপেক্ষা গুরুতর কি না? তোমার হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাণের প্রণয়িনী স্ত্রী আজ হয়ত মারা গিয়াছে, তোমার হৃদয়োদ্যানের ফুটন্ত ফুল কালহস্তীর পদতলে হয়ত বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তোমার প্রেমের পুতলী সোহাগের সামগ্রীকে দুরন্ত দস্যুতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, যে মুখপদ্মের দিকে তাকাইতে তোমার দাব-দগ্ধ হৃদয় মরুক্ষেত্রে শীতল জল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত, আজ সেই শ্মশান তলবিলুণ্ঠিত মুখখানিকে বুকে রাখিয়া মরমের অশ্রুজলে তুমি ভূমি তল সিক্ত করিতেছ, বল দেখি নরকের কোন্ কষ্ট তোমার এ মর্ম্ম বেদনার সমান হইতে পারে? তাই বলিতেছি, দুঃখ আমাদের পক্ষে কোন নূতন জিনিস নয়, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত। এই জানা শুনা চেনা পদার্থের সহিত পরলোকে যদি আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহার জন্য ভয় কিসের?"

মৃত্যুর সাগরে আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। এক তিলার্দ্ধ সময় আমরা মৃত্যু ছাড়া নই। কল্য যে আমি বিদ্যমান ছিলাম, অদ্য সে আমি আর নাই। সে আমি মরিয়া গিয়াছি। আবার অদ্য যে আমি বর্ত্তমান আছি, আগামী কল্য ও আমি থাকিব না। সুতরাং মুহুর্মুহু আমার মৃত্যু হইতেছে, বিষম কাল সর্প আমাকে মুহুর্মুহুঃ গ্রাস করিতেছে। মৃত্যু রূপ অজাগর সর্পের প্রকাণ্ড উদরে আমরা ধীরে ২ প্রবেশ করিতেছি। আমার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স হইয়াছে, যদি আমার পরমায়ুর উর্দ্ধসংখ্যা পরিমাণ পঞ্চাশ বর্ষ হয়, তাহা হইলে কাল অজাগর আমাকে অৰ্দ্ধেক গিলিয়া ফেলিয়াছে। এই রূপ কাহাকেও বা সিকি, কাহাকেও বা অৰ্দ্ধেক, কাহাকেও বা পূর্ণরূপে মৃত্যু গ্রাস করিতেছে। সুতরাং একটু ২ করিয়া ক্ষণে২ মৃত্যু আমাদিগকে কবলিত করিতেছে। অতএব মৃত্যুর কামড় আমরা সর্ব্বদাই ত সহ্য করিতেছি। তবে শেষ কামড়ের জন্য এত ভয় কেন? যে মুহূর্ত্তে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আমাদিগকে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং মৃত্যুর মুখে আমরা সর্ব্বদাইত রহিয়াছি. মৃত্যু যদি বাস্তবিকই আমাদের ভয়ের জিনিস হয় তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগকে এত খানি গিলিয়া ফেলিলেও আমরা ভয়ে আঁত্‌কাইয়া উঠি না কেন? আমাদের এত খানি বয়স চলিয়া গিয়াছে, অথচ জীবনের প্রকৃত কোন কার্য্যই হইল না। কৈ ইহার জন্য ত ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে না। সুতরাং মৃত্যুর জন্য ভয় আমাদের ভ্রমবশতঃই হইয়া থাকে। মৃত্যুকে ভয় করিবার তেমন কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যে মৃত্যু সদাই আমাদের সঙ্গে ২ রহিয়াছে, এমন চির-সঙ্গী চির-পরিচিত প্রিয়মিত্রকে ভয় করিতে হইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এক মুহূর্ত্তের তরেও যাহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ নাই, এক নিমেষের জন্যও যাহার বিরহ যন্ত্রণা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয় না, এমন চির দিনের সাথী চিরাভ্যস্ত প্রিয় বান্ধবকে ভীতি সঙ্কুচিত নয়নে দেখিতে হইবে, ইহা বড়ই বিচিত্র কথা। জগতের চক্রে মৃত্যু বিরাজ করিতেছে, ফলে ফুলে পল্লবে, মৃত্যুর সুষমা জাগিয়া উঠিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুর বিজয় দুন্দুভি জগতে ঘোষিত করিয়া কালের অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, সুতরাং মৃত্যুর সহিত জগতের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও মৃত্যুরাজ্য একটা অপরিচিত, কি জানি, কিম্ভূত-কিমাকারময় বলিয়া জগৎ তথায় যাইতে ভীত হয় কেন?

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, শরীরের ধ্বংস হইলেই সব ফুরাইয়া যায়, মৃত্যুর পর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর আমাদের চিহ্ন মাত্র থাকে না, তাঁহাদের মতেও ত মৃত্যুকে ভয় করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। মৃত্যুর পর আমার যদি একবারেই অস্তিত্ববিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ত আমি বার ২ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কঠোর যন্ত্রণার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তাহা হইলে আর আমাকে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া বার ২ দুঃখ যন্ত্রণা ত ভোগ করিতে হয় না। সংসারে পুনরাবৃত্তির নামই ত বন্ধন। বার ২ জন্ম পরিগ্রহ করার নামই ত বন্ধন শৃঙ্খল। এই বন্ধন হইতে যদি আমি ত্রাণ পাই, তাহা হইলেইত আমি মুক্তি সুখের অধিকারী হইলাম। আর্য্যশাস্ত্র ইহাকেই ত "মুক্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই যদি ভৌতিক শরীরের ধ্বংস হইলে, "আমার" ধ্বংস হইত, তাহা হইলে আর কোন ভাবনা ছিল না। যে দিন আমার মনোময় শরীর ধ্বস্ত হইয়া যাইবে, যে দিন আমার এ ক্ষুদ্র আত্মা অনন্ত পরমাত্মায় ডুবিয়া যাইবে, যে দিন এ ক্ষুদ্র বুদ্বুদ অনন্ত সাগরের উন্মুক্ত বক্ষে বিলীন হইয়া যাইবে সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন ঘটভগ্ন হইয়া গেলে, অনন্ত আকাশে

মিশিয়া যায়, সেই রূপ আমার শরীর ও অন্তঃকরণাদি, ছিন্ন আত্মা শরীরাদি বিনষ্ট হইয়া গেলে যে দিন অখণ্ড পরমাত্মার সত্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইবে সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু। যে দিন আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম মরিয়া যাইবে, যে দিন আমার বুদ্ধিরাশি বিলুপ্ত হইয়া মনোপ্রাণের সহিত আত্মার সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে যে দিন শরীর চির দিনের জন্য ঘুচিয়া যাইবে, সেই দিনই বুঝিব আমার প্রকৃত মরণ হইয়াছে। যে মৃত্যু হইলে সংসারে আসিয়া আর পুনরায় জন্মিতে বা মরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে শরীরেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণের সাহায্যে আত্মাকে ভবঘুরে সাজিয়া আর কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঘুরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে আসক্তি, মায়া, মমতার বিরহ যন্ত্রণায় আর অনন্তকাল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় না, তেমন মৃত্যুর ভিখারি নয় কে? যে মৃত্যু পাইবার জন্য যোগী যোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জ্ঞানী জ্ঞান নীরে ভাসিয়াছেন, তেমন মৃত্যুর কাঙ্গাল জগতে নয় কে? মৃত্যুই ত অমৃত ধাম, মৃত্যুই ত অমর মন্দির। মৃত্যুই জগতে অক্ষয় পদার্থ। মৃত্যুর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আর্য্য শাস্ত্রই জগতে প্রথমে অঙ্কিত করিয়াছেন। বেদান্তের অদ্বৈত বাদ মৃত্যুধামে অগ্রসর হইবার জন্যই জীবকে গভীর তত্ত্ব কথায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, বেদান্ত শাস্ত্র ছাড়া মৃত্যুর শাস্ত্র আর নাই। বেদান্তের ভাষা ছাড়া মৃত্যুর ভাষা আর নাই। বেদান্তের ভাব ছাড়া মৃত্যুর তেমন ভাব আর কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই।

মৃত্যুর জন্য বাস্তবিকই ততটা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। ভৌতিক দেহের মৃত্যু কালে ইন্দ্রিয়াদি সংমূর্চ্ছিত হইয়া যায়, অনুভূতি শক্তি অভিভূত হইয়া যায় সুতরাং বাহিরের লোকে মনে করিলেও মুমূর্ষু মরণের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে পায় না। ঘোর সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হওয়ায় যেমন সুখ দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না, মরণ কালেও সেই রূপ হয় না, ইহাই ত বিধাতার বিচিত্র লীলা। অতএব মৃত্যুকালে ঘোর কষ্ট হইলেও তাহা যখন অনুভূত হয় না, তখন কষ্ট হওয়া না হওয়া একই কথা। সুতরাং মৃত্যু কালীন কষ্টের যে একটা ভয়, তাহা অমূলক। কিন্তু ইহার উপর আর একটা ভয় আছে। আসন্ন মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যদি মনে হয়, হায়! এত প্রিয় সংসারকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছি, যাহা-দিগকে "আপনার" বলিয়া এত দিন ভাল বাসিয়া আসিয়াছি, ও আমার অভাবে তাহাদের কি দশা হইবে, এই গাছ পালা ঘর দুয়ার বিষয় আশয় কত কষ্টে তৈয়ার করিয়াছি, এই সমস্ত আমার সাধের সম্পত্তি কি হইবে, কে ভোগ করিবে, ইত্যাদি দুর্ভাব-নায় মুমূর্ষুর চিত্ত যদি ব্যাকুল হয় তাহা হইলে বাস্ত-বিকই সে ভয় সাংঘাতিক সে কষ্টের আর তুলনা নাই। প্রকৃততঃ মায়া মমতার কষ্টই মৃত্যুকালে ভয়ের সামগ্রী। ইহা ছাড়া মৃত্যুতে আর ভয়ের অংশ কিছুই নাই। এই টুকু কাটাইতে পারিলেই মৃত্যুর বিভীষিকা আর কিছুই থাকে না। সংসারী জীবের পক্ষে মায়া মমতা থাকা অবশ্যম্ভাবনীয়। মায়া মমতা না থাকিলে সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বলিয়া বোধ হইত। মায়া মমতাই সংসারের দুঃখময় অংশকে আবৃত করিয়া মধুর করিয়া রাখিয়াছে। মায়া মমতাই সংসারের বিকট মূর্ত্তিকে স্বর্গের বরণীয় করিয়া উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। বৈদান্তিক মায়া মমতার মস্তকে পদাঘাত করিতে পারেন, কিন্তু সংসারী জীব মায়া মমতার আশ্রয় লইতে বাধ্য। যে স্বভাবের সূত্রে আমরা মায়া মম-তাকে পাইয়াছি, সেই স্বভাবের বশেই যদি ইহ সংসারের মায়া মমতার বন্ধন আমাদিগকে পরিহার করিতে হয়, ত তাহার জন্য আমাদের দুঃখ বা ভয় হইবে কেন? মায়া মমতায় মুগ্ধ হওয়াটা যেমন আমা-দের স্বাভাবিক সহজসিদ্ধ, মায়া মমতার পরিহার টা

সেই রূপ সহজ সাধ্য করিয়া লইতে পারিলে আর ত কোন জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। পার্ব্বতীয় লতা যদি প্রস্তরের তলদেশ ভেদ করিয়া গভীর ভাবে বদ্ধ মূল হয়, ত সে গাঢ় সংবদ্ধ শিকড়কে উঠান বড় সহজ কথা নহে, কিন্তু সেই লতা বালুকাস্তুপের উপর বদ্ধমূল হইলে তাহাকে উপড়াইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। সেই রূপ মায়া মমতাকে সংসারের গভীর গর্ভে বজ্রবৎ দৃঢ় রূপে প্রোথিত না করিয়া যদি তাহাকে বালুকাময় স্তূপের উপর ভাসা ভাসা রূপে বসাইয়া রাখি, তাহা হইলে কার্য্যকালে তাহাকে উৎপাটন করিতে আর কোন দুঃখ হয় না। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতেছে যখন কোন সিভিল-য়ান্ সাহেব জেলার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন, তখন তাঁহাকে বসবাস করিবার জন্য একটি মনোমত বাংলার আশ্রয় লইতে হয়। কত পছন্দসই ঘর কন্নার আস্বাব তাহাকে কিনিতে হয়। গাড়ি ঘোড়া পছন্দ করিয়া রাখিতে হয়। মনোহর উদ্যানটি পছন্দ করিয়া পুষ্পবৃক্ষে সাজাইতে গুজাইতে হয়। প্রিয়তম চাকর বাকর খানসামা আদিকে শিখাইয়া পড়াইয়া কার্য্যোপ-যোগী করিয়া লইতে হয়। তাঁহাকে একটি রীতিমত সংসার পাতাইতে হয়। কিছু দিন বাদে সাহেবের কার্য্যকাল ফুরাইয়া যখন বিলাত যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন সাহেব ঘর কন্নার সমস্ত জিনিষ পত্র সিকি-মূল্যে নিলামে বিক্রী করিয়া তিনি বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। তাহার সাধের জুড়ি গাড়ি তাঁহার আদরের ঘোড়া তিনি অম্লান বদনে বিদায় করিয়া দেন। কত যত্নে যে সমস্ত জিনিস বাছিয়া ২ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সাহেব নির্ম্মম হৃদয়ে সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যান। সে গুলির দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করেন না। এই সমস্ত জিনিস পরিত্যাগে সাহেবের বিন্দু মাত্র কষ্ট হয় না। কেননা সাহেব জানিতেন, যত দিন তাঁহাকে কার্য্য ক্ষেত্রে থাকিতে হইবে, ততদিনই ঐ সমস্ত জিনিষ পত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। কার্য্য কাল ফুরাইলেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে। সুতরাং ঐ সমস্ত জিনিসের উপর তাঁহার মায়া মমতা ছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সর্ব্বদাই সূক্ষ্মভাবে বিজড়িত থাকিত। কাযেই তাঁহার মায়া মমতা ততটা বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে গুলি পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার ততটা দুঃখের উদ্রেক হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মত সংসারী জীব আমরাও এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি। কর্ম্মকাল ফুরাইলেই আমা-দিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইবে। আমাদের যদি স্মরণে থাকে যতদিন সংসারে কর্ম্ম করিব ততদিনই সংসারের জিনিষ পত্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, কর্ম্ম কাল ফুরাইলেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে। এই চিন্তা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত আমাদের অন্তরে জাগরূক থাকিলে মায়া মমতা বদ্ধমূল হইতে পায় না। তাহা হইলে মরণ কালে ঘর দুয়ার স্ত্রী পুত্র পরিবার পরি-ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যুৎকট বিভীষিকায় ভীত হইতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত চিন্তার বালুকাময় স্তূপে মায়া মমতার ভিত্তি যদি রচনা করিতে পারি, তাহা হইলে মরণকালে সে ভিত্তিকে টলটলায়মান করিতে আর বেশী বেগ পাইতে হয় না। মায়া মমতার ঐন্দ্রজালিক প্রলোভনের হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আসক্তির মোহন ছবি আলিঙ্গন করি-বার জন্য যেমন আমরা ব্যস্ত, তেমনই প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিহার করিবার জন্যও আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। সংসারী জীবমাত্রেরই এ অভ্যাস টুকু প্রয়োজনীয়। এই অভ্যাস টুকু থাকিলেই আর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে হয় না, সংসারের কোন জ্বালাই তাহা হইলে আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কর্ম্ম দর্শন।

আদিরহিত চৈতন্য ধাতু ওঁকারাত্মক আত্মা, কাল, দিক্ ও পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম) দ্রব্য পদার্থ হেতু গুণ ও ক্রিয়াান্তর যোগে মাতৃ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ২ ও মিলিত সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে প্রভাব বিস্তার করিলে, মন আদি-রহিত চৈতন্য ধাতু আত্মার সদীয় একটী দ্রব্য পদার্থ হেতু তৎকালে সময় পাইয়া সৎ সংজ্ঞক চেতঃ রূপে জানিয়া মিলিত হইলে তাহাদের স্বীয় ২ ও মিলিত সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয়াদি অবস্থানোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়া, চেষ্টার প্রবৃত্তি করিলে, নিবৃত্তির হেতু তাহাদিগেরই সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে মাতৃ গর্ভ হইতে বহির্গত হওনান্তর প্রথমতঃ শব্দ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃ ক্ষেত্রানুযায়ী ইন্দ্রিয় গঠিত অথবা ইন্দ্রিয় ঘটিত কার্য্যের তারতম্যানুসারে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য অভাবনীয় অচিন্তনীয় ভাবে ভাবময়ীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ভাবধাত্রী, কর্ত্রী বিধাত্রী সাবর্ণি সাবিত্রী, বেদমাতা গায়ত্রী, শক্তি রূপা ব্রহ্মাণীর " একোহং বহুস্যাম্ " এই মূল সার্থক কথার প্রত্যক্ষ ফল প্রত্যেক পদার্থ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই সৎ সংজ্ঞক চেতঃ মন একটী দ্রব্য পদার্থ। শরীরের কর্ত্তা, অথবা ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত। প্রত্যেক জীব দেহে একই ভাবে ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত হইয়া ইন্দ্রিয় গঠিত এবং ইন্দ্রিয় ঘটিত কার্য্যের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য জীব দেহে করিয়া বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয় কার্য্য হইতে ক্ষণেক সময়ের জন্য নিবৃত্ত হইলেই স্বীয় ভাবে অবস্থান হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেও সক্ষম হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় কি ইন্দ্রিয় কার্য্য না থাকিলেই যে মনের কার্য্য হয় না, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভূতার্থ। স্পর্শন শক্তি দ্বারা ইহার কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। মন সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে ষড় ধাতু (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং আত্মা) গঠিত লিঙ্গ পুরুষও বায়ু অগ্নি সোম, অথবা মনুষ্য দিগের দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত হইয়া পুরুষ কর্ম্মের চিন্তা কার্য্য করিয়া থাকে। যে হেতু মনঃ সংযোগ করিলেই ইন্দ্রিয় কার্য্য করনে সমর্থ হইয়া থাকে। পরন্তু ভৌতিক পদার্থ শ্রেষ্ঠ বায়ু অগ্নি সোম, তদ্ধেতু সাক্ষাৎ ভোগ সম্বন্ধে বায়ু পিত্ত কফ, যখন যে পুরুষে যে ভাবে অবস্থান করে মনের চিন্তা কার্য্যও সে পুরুষে সেই ভাবেই হইয়া থাকে। বায়ু অগ্নি সোম, তদ্ধেতু বায়ু, পিত্ত কফ, গুণান্তর যোগে দূষিত হইয়া ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রদায়িনী সূক্ষ্ম ২ স্নায়ু পুঞ্জের স্পর্শন শক্তি কার্য্যের গতি রোধ করিয়া বুদ্ধি বিঘাতের কারণ হওয়া বশতঃ, পুরুষ কর্ত্তৃক সদসৎ কার্য্য সম্পাদনের কার্য্য চিন্তা মন সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের বাধ্য হইয়া করিয়া থাকে। আপাচ দেখাও যায়, বধির ও অন্ধাদি জীবের মন ইন্দ্রিয় হীন হইলেও জ্ঞান নিহিত পঞ্চতত্ত্ব চিন্তা অথবা পাপ পুণ্যের চিন্তা কার্য্যের কোন ব্যত্যয় হয় না। সেই প্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয় লোপ হইলেও মনের স্বীয় চিন্তা গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না। মন, বায়ু, অগ্নি সোম তদ্ধেতু বায়ু পিত্ত কফ, ও সংবৎসর রূপ কালের সানুকূল সাহায্যে, দেহে বিরাজমান থাকিয়া পঞ্চতত্ত্ব ঘটিত অনন্ত জ্ঞান চিন্তা কার্য্যে নির্লিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব ভাবে ভাব সাগরে ভারত রত্নোপরি নিশ্চল নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় হইলে, আত্মা ভাবময়ীর ভাব দর্শন করিয়া ভোলা হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে। আর এই মন, বায়ু অগ্নি, সোম, সাক্ষাৎ ভোগ সম্বন্ধে বায়ু পিত্ত কফ এবং কাল গুণান্তর যোগে বিরুদ্ধ হইয়া স্নায়ু সকলের স্পর্শন শক্তি উদ্ভব ইন্দ্রিয় বুদ্ধির লোপ করিয়া জ্ঞান হীন করিলে, বায়ু পিত্ত কফেরই ধর্ম্মানুসারে নিরালম্ব হেতু পুরুক

স্মৃতি উদয় হয়, এবং কারণের হেতু পাইয়া পুরুষ কর্ম্ম ফলের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই, বায়ু পিত্ত কফ হইতে বিচ্যুত হয়। মনের এই প্রকার ভয়ঙ্কর দেখার অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। কর্ম্ম পাশে বদ্ধ জীবের এই প্রকার অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া বড়ই দুর্লভ। এই ভয়ঙ্কর অসত্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কার্য্যের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ) প্রজ্ঞাপরাধ, (অর্থাৎ বাচনিক, মানসিক এবং শারীরিক কর্ম্মের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ) এবং পরিণাম, (অর্থাৎ কালিক বিপর্য্যয়) হইতে উৎপন্ন হেতু অভ্রান্ত পুরুষ-নির্দ্দিষ্ট উপদেশ এবং স্বকীয় বুদ্ধির উৎপত্তি দ্বারা ক্রমে দোষের ক্ষয় গুণের যোগ করিয়া দোষের ক্ষয় করিয়া গুণের বৃদ্ধি করিবে; এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের অনুপতাপের নিমিত্ত এবং উপতপ্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত ভাবে যত্ন করিবে; যাহাতে প্রকৃতি বিকৃত হইয়া বুদ্ধি বিনাশের কারণ না হয়। মন আহার, আচার এবং চেষ্টা দ্বারা বায়ু পিত্ত কফের অথবা বায়ু অগ্নি, সোমের বিকৃত স্বভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, দীর্ঘায়ু, সুপ্রকৃত সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পাদন করে, এবং সেই পুরুষকে ধর্ম্ম, অর্থ কামনা উত্তম রূপে আচরণ করাইয়া ইহকাল এবং পর কালের মঙ্গল ভাগী করে। আর বায়ু পিত্ত কফের সহিত বিকৃতি প্রাপ্ত থাকিলে, পুরুষের দ্বারা উক্তার্থ সকলের বিপরীত ভাব আচরণ করায়, এবং সেই ধর্ম্ম অর্থ কমনা, বিরুদ্ধ রূপে আচরিত হইলে, ও বিরুদ্ধ ধাতু হইলে, কুপিত বায়ু পিত্ত কফাদি কর্ত্তৃক মন ক্ষুব্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ প্রকারের অশুভ ইত্যাদি সম্পাদন করে। অতএব ব্যক্তি মাত্রেই কিলা-কিলী, মারা-মারী, বকা-বকী, ঝকা-ঝকী, চুরী চামারী না করিয়া স্বীয় প্রকৃতির সহিত স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আপন উৎপত্তির সহিত কর্ম্ম চিন্তা করিবে, এবং কথিত আহার আচার চেষ্টা সকল আত্ম গুণের অবিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা দেশ কাল মন ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ দ্বারা উত্তম রূপ বিবেচনা করতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিবে। ইহাতে এক কালিন আরোগ্য এবং ইন্দ্রিয় জয় লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সাধু যত্ন ও চেষ্টায় কলিকাতায় "ধর্ম্ম মণ্ডলী" গঠিত হইবার উদ্যম হইতেছে। কলির কালদণ্ড বিতাড়িত বর্ত্তমান ভারতের হিতার্থী বন্ধু তাঁহারাই, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস করিবেন। এই রূপে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সুবৃহৎ কার্য্য ক্ষেত্র পশ্চিমোত্তর প্রদেশেও পঞ্জাবে "ভারত ধর্ম্ম মহা মণ্ডল" ও বঙ্গদেশে "ধর্ম্ম মণ্ডলী" আদি দ্বারা সম্প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ভগবান্ ক্রমে রাজা দ্বয়ের সাধু উদ্যম ও গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুন।

অনুসন্ধান।

ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র রৌপ্যখণ্ড হারাইলে তাহার জন্য আমরা কতই অনুসন্ধান করিয়া থাকি; যদি তাহা প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে কতই পরিতাপ হয়, কিন্তু একবারও ভাবিনা যে এই সামান্য ধনে কতকাল পর্য্যন্ত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু হায় যাহা অভ্রভেদী হিমালয় শৃঙ্গ পরিমিত স্বর্ণাদি হইতেও বহুমূল্য, অনন্ত নভোমণ্ডল হইতেও অনন্ত অধিক কি রত্নাকর সমুদ্রের যিনি সৃষ্টি কর্ত্তা, যাঁহাকে পাইলে জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারেও অনন্ত-শান্তি লাভ করিতে পারি, যাঁহাকে পাইলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতে পারি, যাঁহাকে পাইলে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারি, কই! দিনান্তে একবারও তো তাঁহাকে অনুসন্ধান করি না। পাপ হইতে

আমি কত দূর বিরক্ত হইয়াছি, ধর্ম্মপথে আমার কত দূর গতি হইল, দিনান্তে এক বারও তো তাহা অনুসন্ধান করিনা। যখন বিষয় কর্ম্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ কোলাহল আর শ্রোত্র গোচর হয় না, কই, তখন ও তো আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি না, যে আমার জীবন প্রবাহ এত অধিক দূর অগ্রসর হইল, কিন্তু মনুষ্য নামের কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দূর নির্ম্মল হইল, সম্মুখে ভীষণতম ভব সমুদ্র পার হইতে হইবে, তাহার জন্য কি সঞ্চয় করিলাম, যে নরকের বর্ণনা পুস্তকে পড়িলে ভীষণ ভীতিতে চক্ষু স্পন্দহীন হয়, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায় করিলাম।

হে কার্য্যদক্ষ পুরুষ! স্বীকার করিলাম যে তুমি বিষয় কর্ম্মে অতি সুচতুর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্যকাল ব্যাপিয়া উপভোগ করিতে পারিবে, সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে? "যা লোক দ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"। হে বিদ্বন্! [illegible] স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে বুৎপন্ন, কিন্তু যে বিদ্যার দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করিতে পারা যায়, যে বিদ্যার দ্বারা আপনার চিত্তকে, সেই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রিয় আবাসক্ষেত্র করিতে পারা যায় সে বিদ্যায় তোমার কতদূর বুৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কি দিনান্তে এক বারও অনুসন্ধান কর! অনুসন্ধান করিলে তাহা অবশ্যই পাইতে পারিবে। কিন্তু এ অনুসন্ধান, পূর্ব্বোক্ত হৃত রৌপ্য খণ্ডের অনুসন্ধানের ন্যায় অনুসন্ধান নহে, ইহার অনুসন্ধান মন প্রাণ এক করিয়া অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানে হৃদয়ের প্রেমাবেগ মাখা থাকা চাই। এই অনুসন্ধানের দ্বারাই এক দিন শিশু ধ্রুব ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের বশীভূত হইয়াই এক দিন ভগবান্ প্রহ্লাদকে স্তম্ভ মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন এই প্রেমাবেগ হইলেই পাপ সকল হৃদয় হইতে আপনাই দূরে পলাইয়া যায়, জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে থাকিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, পাপ জলদ মালা অপসৃত হইলেই হৃদয় নভোমণ্ডলে সুবিমল শারদীয় শশধর উদয় হন, সুবিমল কৌমুদী পান করিয়া মানস চকোরের পিপাসা মিটিয়া যায়।

হে দয়াময়! জলে স্থলে নভোমণ্ডলে সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজমান, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে পাপাবরণ ঝুলিতেছে, তাই তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। প্রভো! সংসার পথে বিচরণ করিয়া আমরা শ্রান্ত হইয়াছি। হৃদয়ে কিছু মাত্র শক্তি নাই, সেই জন্য তোমাকে অনুসন্ধানও করিতে পারিনা, প্রভো! আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর, যে শক্তি দ্বারা শক্তিমান হইয়া শিশু ধ্রুব গহন বনে তোমার অনুসন্ধান করিতে করিতে ভীষণ ব্যাঘ্রাদিকে দেখিয়া "আমার পদ্ম পলাশ লোচন হরি আসিলে" বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইয়াছিলেন, যে শক্তি দ্বারা মহাত্মা চৈতন্য দেব নিশীথ সময়ে পতিপ্রাণা স্ত্রী ও জননীকে কাঁদাইয়া নবদ্বীপ ধামকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া, তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন, প্রভো সেই শক্তি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চালিত করিয়া আত্মাকে শীতল কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে অনুসন্ধান করিয়া লাভ করিতে পারিব এবং তাহা হইলে চক্ষু হইতে পাপাবরণ আপনিই সরিয়া যাইবে। তখন তোমার দিব্য মূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিব—,

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপম্!॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

বেদ বিদ্যালয়।

আমরা জানি সৎকার্য্যে বিঘ্ন অনেক, জানি আসুর-প্রকৃতি কলির করাল কাল দণ্ডে বিতাড়িত হইয়া বেদ ও বৈদিক ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইবে, কিন্তু ইহাও জানি অনাদি পুরুষের নামে নির্ভর করিয়া সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাহা অসিদ্ধ হয় না, এই জন্যই কালের বিপরীত স্রোতে অগ্রসর হইতে সাহস ও সংকল্প করিয়াছি। কাল সর্ব্বোপরি প্রবল হইলেও কাল বহু বাধা বিঘ্ন জাল বিস্তার করিলেও মা অন্নপূর্ণার নামের বিজয় নিশান ধরিয়াই যাহাতে বেদ বিদ্যার পুনঃ প্রচার হয়, যাহাতে ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতির ভারতে পুনরভ্যুদয় হয়, যাহাতে বিলুপ্ত প্রায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম কাণ্ড পুনঃ প্রচারিত হয়, যাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথাবিধি পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য মায়ের নামে মায়ের নামে বেদ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। কৃপাবান্ মহাত্মাগণ সুশিক্ষিত সুচতুর মনীষা সম্পন্ন পুরুষগণ অনেকেই সদাশয়তা সহ সহায়তা ও সহানুভাবকতা করিতে অগ্রসর হইলেন। শত ২ সৎ গৃহস্থ বর্গ নিত্য মুষ্টি ভিক্ষা দানে ও অন্যান্য কেহ-কেহ এক কালীন বা মাসিক বৃত্তি দানে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে মুক্ত হস্ত হইয়াছেন, আচার্য্যগণও যথারীতি অধ্যাপনা পূর্ব্বক বিদ্যার্থী বর্গকে শিক্ষা দান করিতেছেন, আজ বাঙ্গালী বালকের মুখে বেদ গান শুনিয়া কত লোকে ভবিষ্যতের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ইহা দেখিয়া শুনিয়া মনে২ কত আহ্লাদ হইতেছে বলিতে পারি না। বঙ্গ দেশীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী গণ! আপনারা পৈত্র কার্য্যে সহস্র ২ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও একটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পিতৃলোকের পরিতোষ সাধনের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছেন না, আজ সেই কলঙ্ক বিমোচনের শুভ দিনও যে সন্নিকট হইতেছে, ইহা দেখিয়া আপনাদেরও আহ্লাদের সীমা নাই। ভগবান্ ভারতীয় আর্য্য জাতির চির সহায় থাকুন।

বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা জন্য সুখের সঙ্গে ২ একটু দুঃখও হইয়াছে, আশা করি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের যত্নে তাহা শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। যে সকল অধ্যাপক বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও স্বদেশ হিতৈষী, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, অনেক বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত, নামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পাছে বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ বেদ বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, পাছে তাঁহাদের মিথ্যাভিমানের লাক্ষা নির্ম্মিত কপাট ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা বেদ বিদ্যালয়ের যাহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন। আমরা বিনয় পূর্ব্বক বলি, যে ভাবিয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে এ বিদ্যালয় তাঁহাদেরই ভবিষ্যৎ কুলের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ বিদ্যালয় তাঁহাদের সদয় দৃষ্টি আশা করেন।

আর এক কথা বেদ বিদ্যালয়ের মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য কত লোকে মুদ্রিত "মঙ্গল ঘট" লিপি ও ভিক্ষালিপি ডাকে চাহিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারকে প্রতি মাসে ২ যে মহাত্মাগণের নাম মুদ্রিত হয়, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে একটি কপর্দ্দকও এখানে পাঠান না, অথচ শুনিতে পাই অনেক পল্লীতে এই রূপে অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু সংগৃহীত ধন যে কি হয় কোথায় যায়, তাহা ভগবানই জানেন। আশা করি এই ভিক্ষার টাকা কেহ যেন অপব্যবহার না করেন।

গৃহস্থ গণ! সকলেই দয়া করিয়া "মঙ্গল ঘট" গৃহে ২ রক্ষা করুন। বেদ বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া মা অন্ন পূর্ণার নাম করিয়া কাশীতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বর্গের সেবার্থ এক এক মুষ্টি চাল প্রতি দিন রক্ষা করুন ও নিজ ২ বন্ধু বর্গকে রাখিতে অনুরোধ ও উপদেশ করুন। মাসে ২ সঞ্চিত তণ্ডুলের যথোচিত মূল্য বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। বেদ-বেদ্য পুরুষ সকলের কল্যাণ সাধন করুন।

দীনাতিদীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

ধর্ম্মোৎসব

১। গত মাসে বারাণসী বালরঞ্জিনী সভার মহামহোৎসব হইয়া গেল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় এই উৎসবে "জীবনের সার্থকতা" বিষয়ে একটি মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় অতিশয় জনতা বশতঃ অনেক লোকে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বালক বর্গকে সৎ-শিক্ষা-দানই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। ৫ই হইতে ৭ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সাঁওতাল পরগণায় ফতেপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা, পরিব্রাজকের সঙ্গীত ও ২৪ প্রহর হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই সমারোহপূর্ণ উৎসবে লোকের অতিশয় উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রী কীর্ত্তিচন্দ্র সেন গুপ্ত।

৩। ১৭ ই হইতে ২২ এ আষাঢ় পর্য্যন্ত মহম্মদ বাজার-কাঁইজুলী (বীরভূম) হরিসভায় ৫ম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রাম্য দেবতার পূজা, শাস্ত্রব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহুজন-সমাগমে সভা লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ৫ দিন সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান দ্বারা লোক সমূহকে পরমানন্দ দান করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "সংসার-সমুদ্র" বিষয়িণী বক্তৃতাটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

শ্রী পাঁচকড়ী সরকার।

বেদবিদ্যালয়ের আষাঢ় মাসের আয় ও ব্যয়।

মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য।

শ্রী কালীকুমার রায় শ্রী পুর, ঢাকা	॥৶০
" কৈলাস চন্দ্র ওঝা পাটদহ	১॥০
" কেদার নাথ গোস্বামী বড়া শ্রীরামপুর	১২৲
" রমনীমোহন বসু দিনাজ পুর	৮৸৶০০
" বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত মাটবাড়ীয়া	২।০
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ডুমুরদহ	৪৶০
" শ্রীনাথ শর্ম্মনঃ সরকার দিনহাটা	৪৲
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সৈদাবাদ	২৲
" গোপাল দাস বসু সালিখা	৶০
" দ্বারকা নাথ গুপ্ত মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর	॥০
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	।৫
" হরি দাস সরকার ভেরিয়া ডিঙ্গী	১৲
" বনয়ারি লাল সিংহ সাবলদহ	৪॥০
" নলিন চন্দ্র রায় মোক্তার সিরাজগঞ্জ	১৲
" দীন নাথ পাত্র রামপুরহাট	৪॥৶০
" কালী চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়ীয়া	১০৲
৺ কাশীধামের বৈশাখ মাহার মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য	১৭৶০
শ্রী হরেন্দ্র কুমার সান্যাল মীরপুর ঢাকা	৮॥০
	৭৮৸৶৫

এক কালীন দানপ্রাপ্তি।

শ্রী নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় গদাই পুর।		৶৫
" মহেন্দ্র নাথ দাস	সিমলা পাহাড়	১৲
" প্রিয় নাথ রায় চৌধুরী	ঐ	১৲
" কালী দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৲
" মাখন লাল ঘোষ	ঐ	১৲
" নৃত্য গোপাল সরকার	ঐ	২৲

" এক জন ব্রাহ্মণ	সিমলা পাহাড়	১০৲
" শ্রীনাথ বসু	ঐ	২৲
" কুঞ্জ মোহন দাস	ঐ	১৲
" রাম গতি মৈত্র	ঐ	১৲
" ক, খ, গ,	ঐ	।০
" এ, বি, সি,	ঐ	৪৲
" কৃষ্ণ লাল ঘোষ	ঐ	২৲
" দাশু কুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
" দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ	॥০
" কেদার নাথ ভাদুড়ী	ঐ	॥০
" নৃত্য লাল দত্ত	ঐ	॥০
" কানাই লাল দত্ত	ঐ	॥০
" অভয় চরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" হারাণ চন্দ্র বসু	ঐ	১৲
" শ্রী গোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" অভয় চরণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
" কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
" মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
" উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত	ঐ	১৲
" অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" যদু নাথ সুর	ঐ	১০৲
" উপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০৲
" ভূষণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" হৃদয় নাথ ঘোষ	ঐ	১৲
" বেণীমাধব ঘোষ	ঐ	১৲
" আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৫৲
" যদু নাথ সিংহ	ঐ	১৲
" সনাতন ধর্ম্ম সভা	ঐ	২১৲
" মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সিমলা পাহাড়	১৲
" ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" গোপাল চন্দ্র মল্লিক	ঐ	১৲
" কুমুদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়	ঢাকা	৶৫
" বিপিন বিহারী রায়	গয়া	৶০
" যদুনাথ সহায়	ছাপরা	১০৲
		১০৪৲ ॥৶৫৲১০

মাসিক বৃত্তি ।

৺ লবঙ্গ সুন্দরী বৃত্তি, কাকিনীয়ার মহারাজার প্রদত্ত মাহ জ্যৈষ্ঠ		১০৲
" বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়	সিমলা পাহাড়	৫৲
" সতীশ চন্দ্র রায়	ঐ	।০
" শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা দরভাঙ্গা		২০৲
		৩৫।০

বাৎসরিক দান ।

" প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়	সিমলা পাহাড়	১৲
" মোট আয়		২১৯৸৶৫১০

ব্যয় ।

" আচার্য্য গণের দক্ষিণা, ছাত্র বৃত্তি	৫৭॥৶০
" ছাপাই খরচ	১৩৲
" মাশুল খরচ	।৶১০
" বাজে খরচ	৹।৫
মোট ব্যয়	৭৪॥৶১০
বাকী	১৪৫॥০

শ্রীতারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
লেখাধ্যক্ষ ।

ধর্ম্ম প্রচারক

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ

কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচি।

১৪শ ভাগ। ৫ম সংখ্যা।
ভাদ্র মাস, শঃ ১৮১৩।

বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

কুমার-পরিব্রাজক

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী কৃত

বঙ্গানুবাদ ও "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক

সুললিত, সুমধুর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(২য় সংস্করণ)

সংস্কৃত মূল, শাঙ্কর ভাষ্য ও শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণাপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া উত্তম রূপে বাঁধাই হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র, রণভূমি, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর এবং ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির চিত্র অতি সুন্দর রূপে অঙ্কিত আছে, সঙ্গে ২ "গীতার্থ সন্দীপনী" ব্যাখ্যাতারও একটি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"গীতার্থ সন্দীপনী" পুণ্যাত্মা পাঠক বর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষাবিৎ পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। ১ম সংস্করণ অপেক্ষা ২য় সংস্করণে "গীতার্থ-সন্দীপনী" অনেক স্থানে আরও উজ্জ্বল, আরও সুস্পষ্ট, আরও সুগম আরও সুবিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১ম সংস্করণ ভাল বাঁধান না থাকিলেও ডাক ব্যয় সহিত মূল্য ছিল ৭৲ সাত টাকা। ২য় সংস্করণে সংস্কৃত ভাষ্য ও টীকা তিনটি কমিয়াছে বটে, কিন্তু আর সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম হইয়াছে; কিন্তু মূল্য হইয়াছে ৪৷৷০ এবং ডাক ব্যয়, রেজিষ্টারি ও প্যাকিং ব্যয় ৷৷০ আট আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহক গণের পক্ষে একুনে লাগিবে ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

এ পুস্তক ন্যূনমূল্যে বা বিনা মূল্যে কাহাকেও দিবার অধিকার আমাদিগের নাই। কেননা পরিব্রাজক মহাশয় ইহার স্বত্বাধিকার তাঁহার যোগাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মা যোগেশ্বরীর সেবার্থ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। অতএব কেহ ন্যূন মূল্যে বা বিনামূল্যে পাইবার জন্য আমায় বা পরিব্রাজক মহাশয়কে যেন পত্র না লেখেন।

গীতার গ্রহণাভিলাষীগণ আমার নামে মূল্যাদি পাঠাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না। পরিচিত স্থানে ভ্যালু-পেএবেল ডাকেও প্রেরিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়	শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
কাশী; ২৫এ শ্রাবণ শঃ ১৮১৩	অবৈতনিক পরিদর্শক।

সাধু মহাত্মাদিগের ফটোগ্রাফ্।

নিম্ন লিখিত প্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মা দিগের ফটোগ্রাফ্ (প্রতিকৃতি) আমার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৺ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গী স্বামীর ফটোগ্রাফ্ [কার্ড সাইজ] ।/১০

ভাস্করানন্দ স্বামীর ঐ ঐ ।/১০

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর (ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা চির-কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের) ফটোগ্রাফ্ (কার্ড সাইজ্) ।/১০

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর বড় আকারের ফটোগ্রাফ্ ৷৷/১০

উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক ফটোর সহিত এক খানি ৺ অন্নপূর্ণার ছোট ছবি উপহার দেওয়া যাইবে।

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়

৺ কাশীধাম।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

১৪শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৩
৫ম সংখ্যা	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	ভাদ্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেবর্ত্বিক্‌স্নাতকাচার্য্য-রাজ্ঞাং ছায়াং পরস্ত্রিয়াঃ।
নাক্রামেদ্রক্তবিণ্মূত্রষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনাদি চ॥

দেবতা, পুরোহিত, স্নাতক, আচার্য্য, রাজা ও পরস্ত্রী ইঁহাদের ছায়া এবং রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র নিষ্ঠীবন ও গাত্রমল ইহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিবে না।

বিপ্রাহিক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেন্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥

ব্রাহ্মণ, সর্প, ক্ষত্রিয় ও নিজাত্মার প্রতি কখনও অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিবে। কাহাকেও মর্ম্মপীড়ক দুঃখ দিবে না।

দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥

উচ্ছিষ্ট, মল, মূত্র ও পাদ প্রক্ষালন-জল দূরে নিক্ষেপ করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত আচাররাশি নিত্য নিয়মিত রূপে অনুষ্ঠান করিবে।

গোব্রাহ্মণানলান্নানি নোচ্ছিষ্টো ন পদা স্পৃশেৎ।
ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ॥

গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ও অন্ন ইহাদিগকে অশুদ্ধাবস্থায় কিম্বা পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়না করিবে না। কেবল পুত্র ও শিষ্যের তাড়না করিবে।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহাতে স্বর্গ লাভ হয় না, ও যাহা লোকবিরুদ্ধ, তেমন ধর্ম্মের আচরণ করিবে না।

মাতৃপিত্রতিথি ভ্রাতৃ জামি সম্বন্ধি মাতুলৈঃ।
বৃদ্ধ বালাতুরাচার্য্য বৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ।
ঋত্বিক্ পুরোহিতাপত্য ভার্য্যাদাস সনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েৎ গৃহী॥

মাতা, পিতা, অতিথি, ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সম্বন্ধী, মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত বান্ধব, ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র, ভার্য্যা ও সহোদর ইহাদের সহিত বিবাদ যে গৃহস্থ পরিবর্জ্জন করেন, তিনি সর্ব্বলোকজয়ী হন।

পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদী দেবখাত হ্রদ প্রস্রবণেষু চ।

অন্যের জলাশয়ে পঞ্চ পিণ্ডাকৃতি মৃত্তিকা না

উঠাইয়া স্নান করিবে না। নদী, দেবখাত (পুষ্করাদি) হ্রদ ও ঝরণার জলে স্নান করিতে হইলে উক্ত নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই।

পরশয্যাসনোদ্যান গৃহযানানি বর্জয়েৎ।
অগ্নিহোত্রবিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি॥

আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের শয্যা আসন উদ্যান, গৃহ ও যান কদাচ উপভোগ করিবে না। এবং অগ্নিহোত্রবিহীন ব্যক্তির অন্ন বিপত্তি কাল ভিন্ন ভোজন করিবে না।

ক্রমশঃ।

জন্মান্তর।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনাদি আমদানী হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের হিন্দু মাত্রেই পরলোকে কেবল বিশ্বাসী ছিলেন। দুই একজন চার্ব্বাক-শিষ্য, এবং নাস্তিক নৈয়ায়িক পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃথা বাগজাল বিস্তার করিয়া নিজ ধৃষ্টতা এবং পাণ্ডিত্য দেখাইত। পরন্তু তৎকালের সমাজের ভিত্তি এই পারলৌকিক বিশ্বাসের উপরই স্থাপিত ছিল—স্বতঃ সিদ্ধির ন্যায় সকলেই অবনত মস্তকে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিত। সমাজের শাসন-ব্যবস্থাও এই বিশ্বাসের পরিমাণে নির্ণীত ছিল। সে সরল বিশ্বাসের দিন আর নাই.; পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের প্রবল প্রবাহে হিন্দুর কোমল এবং সস্নেহ প্রকৃতি রুক্ষ এবং উগ্র হইয়াছে। এখন সকল কথার প্রমাণ প্রয়োগ চাই; প্রত্যেক আচার ব্যবহারের উপকারিতা এবং উপযোগিতা জনে ২ সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে; নচেৎ উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম শিক্ষিত হিন্দুযুবক ভ্রষ্টাচারে দেশ ডুবাইয়া দিবেন। যে মহাভয়ে লোকে ত্রস্ত এবং শঙ্কিত হইয়া পাপকার্য্য হইতে এবং সমাজের রুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইত, যাহার জন্য হিন্দু সাধু, শান্ত এবং নিষ্ঠাবান্ ছিল; সেই মহাভীতি-চিত্র শিক্ষিত হিন্দুর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। কাজেই আর তেমন বিনয়-বিনম্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং আধুনিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ সমাজ-রক্ষার উদ্দেশে জন্মান্তরের উপর পুনঃ বিশ্বাস সংস্থাপনের আশায় যুক্তি বিচারের অবতারণা করিতেছেন। পরন্তু প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে. এখন আর Apriori reasoning (অর্থাৎ প্রথমেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যফলের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা যায় যে যুক্তি দ্বারা) করিলে আমাদের বিশ্বাস হয় না; এখন সকল বিষয়ই যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, দেখাইয়া, শুনাইয়া বুঝাইয়া দিলে তবে বিশ্বাস হইবে। কিন্তু জন্মান্তরের কথা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত এবং নির্দ্ধারিত হওয়া কঠিন, সুতরাং আমাদেরও মনের মাটীর উপর বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি প্রাণিতত্ত্বের (Biology) এবং মনস্তত্ত্বের (Psychology) অনেক গুলি নূতন ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই জন্য ইউরোপের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে আবার জন্মান্তর লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই সকল তর্কবিচার কিছু ২ অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানপ্রিয় শিক্ষিত গণকে উপহার দিব বাসনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তাহার স্থূল ২ সিদ্ধান্তগুলিই সন্নিবেশিত হইল।

নানা পদার্থের সমাবেশে মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণ হইয়াছে। এই সকলের সমষ্টি-শক্তি হ্রাস হইলে দেহান্ত হয়, সুতরাং নিরবয়ব স্বাধীন আত্মা বলিয়া মনুষ্যদেহে কিছুই নাই। মনুষ্য পদার্থনিচয়ের রাসায়নিক শক্তি ফল মাত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে মনুষ্য-সৃষ্টি-বিষয়ে এই বিশ্বাসই ছিল। সুতরাং তাঁহারা বুঝিতেন এবং দশজনকে বুঝাইতেন যে মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি; পরজন্ম

ধর্ম্মযাজকগণের প্রবঞ্চনার কথা মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট শুনা গিয়াছে যে জীবমাত্রেরই, বিশেষত স্তন্যপ (Mammalia) জন্তুগণের সৃষ্টি জীবাণু সম্মিলনের দ্বারাই হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্র ২ জীবাণু (Spermatosa) মাতৃঅণ্ডের (ovum) সহিতসংযুক্ত হইয়া জরায়ু কোটরে স্বায়মুখ অবলম্বন করিয়া সন্তান সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দুইটিই সজীব। বৃহৎ মনুষ্য অথবা হস্তিশরীরে জীবনের যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, পুরুষ জীবাণু (sperm) দ্বারাও সেই সকল কার্য্য হয়। উহারা আহার করে নিশ্বাস ত্যাগ করে, উহাদের গতি আছে ; অথচ আকারে, উহারা তীক্ষ্ণ বীক্ষণ অণুবীক্ষণ দ্বারা দর্শনীয়। এতই ক্ষুদ্র। অতএব বুঝা গেল যে জরায়ুকটাহে চূর্ণ এবং হরিদ্রার সমাবেশের ন্যায় দুই তরল পদার্থের সংমিশ্রণে জীবসৃষ্টি হইল না ; অন্যোন্যস্থ দুইটি সচল সজ্ঞান কীটাণুর আলিঙ্গনে পুত্রোৎপত্তি হইল। তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে তড়িৎ আদি পদার্থশক্তির ন্যায় মনুষ্য জীব কেবল মাত্র জড় শক্তি নহে। অবস্থাবিশেষে, স্থানের গুণে এক ক্ষুদ্রজীব সম্মানিত, সংবর্দ্ধিত এবং সংপুষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যাকার হইবার পূর্ব্বেই জীবসৃষ্টি হইয়াছে। ভ্রূণ বিকাশের পূর্ব্বেই বটবীজনিহিত বৃক্ষশক্তির ন্যায় জীবাণু মাতৃশোণিত-প্রবাহিত রক্তস্রোতকে ঘনীভূত, মাংসল এবং সাবয়ব করিয়া দেয়। অথবা বলিব কি যে জীবাত্মার উৎপত্তি অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞেয়। কারণ এখন ইহা সম্যক্‌ প্রমাণিত হইয়াছে যে বৃক্ষ, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী আদি স্থাবর জঙ্গম সকল জীবন্ত পদার্থই জীবাণুর (Protoplasm) সম্মিলনে—সমষ্টিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; জীবের সহায়তা ব্যতীত প্রাণী সৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। কেবল জড়পদার্থের সমাহারে সজীব, সজ্ঞান, সচল কিছুই উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। এবং যখন পৃথিবী বাষ্পময় ফুটন্ত জলপূর্ণ ছিল, তখনও সেই অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও সজীব পদার্থ বাস করিত ; সে আজ কোটী ২ বৎসর হইয়া গেল, কত যুগ-যুগান্তর উল্টাইয়া গেল। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, যে অপূর্ব্ব সামগ্রী দ্বারা কীটাণু সঞ্জীবিত, তাহা কীট শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, অথবা যে জীবাণুর প্রাণশক্তি দ্বারা মনুষ্যদেহের উৎপত্তি তাহা উহার অধীন নহে, অনেকাংশে স্বাধীন।

অতঃপর Heredity পৈত্রিকত্বের কথা বুঝিতে হইবে। যে শক্তি দ্বারা পুত্র পিতৃপিতামহের আকার, প্রকৃতি রোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাই Heredity অথবা পৈত্রিকত্ব। পিতা মাতার অনেক দোষ গুণ আমরা পাইয়া থাকি। অনেক চিকিৎসক বলেন যে তিন চারি পুরুষ উর্দ্ধে যে রোগ বা স্বভাব প্রকাশিত ছিল তাহাদের আবার প্রপৌত্রে অথবা প্রপৌত্র-পুত্রে বিকশিত হইতে দেখা যায়। পিতা, পিতামহ যে গুণ পাইলেন না। যে সকল রোগ ভোগ করিলেন না ; হঠাৎ এবং বিনাকারণে প্রপৌত্র সেই সকলের অধিকারী হইল। ইহার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া স্থির করা কঠিন। কেবল মাত্র নির্জীব পদার্থ সকলের সংমিশ্রণে এমনটি হইতে পারে না। তাই বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ হার্বট স্পেন্সার (Herbert spencer বলেন যে "Two factors must be recognised at work during the development of any organism, a combination of internal forces that expend themselves in working out a structure in equilibrium with the forces to which ancestral organisms were exposed ;" অর্থাৎ জীব সৃষ্টির জন্য দুইটি শক্তি আবশ্যক। প্রথমতঃ জীবাণুর সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ এমন কতিপয় শক্তি আবশ্যক যাহারা দেহোৎপত্তি করিবার সময়ে পৈতৃকসত্তাকে সামঞ্জস্য ভাবে রাখিতে পারে। প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলিতেনযে অণুসংযোগে [আধুনিক জীবাণুর আলি-

হয়ে] এবং পৈত্রিক সত্তার সহায়তায় জীবসৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পৈত্রিকত্ব একটি ভিন্ন সামগ্রী। রাসায়ন শাস্ত্রে আছে যে দুইটি প্রাতিপদিক পদার্থের সংযোগে যে যোগকৃতি অথবা যৌগিক সামগ্রী উৎপন্ন হইবে তাহাতে উৎপাদক প্রাতিপদিকের গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে। পরন্তু দেহোৎপত্তি ব্যাপারে যে দুই জীবাণুর সম্মিলনে ভ্রূণসৃষ্টি হয় তাহাদের মধ্যে প্রথমেই যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ইহার,, কোন প্রমাণ নাই। উহারা নরদেহী হইলে পরে দেহরক্ষা এবং সংবর্দ্ধনের জন্য নানা প্রকারে রাসায়নিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে বটে। কাযেই বলিতে হইবে জীবাণুগণ পিতৃসত্তাবাহী। কেননা আবিষ্কৃত এবং সর্ব্বজন-সমাদৃত কোন জড়বিজ্ঞানের কোন ঘটনা দ্বারা ইহার অন্যব্যাখ্যা হইতে পারে না এবং জীবলোক ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনায় এমন আশ্চর্য্য সম্মিলনকাণ্ড দেখা যায় নাই। পঞ্চম পুরুষে যে গুণ বা ব্যবহার প্রকাশিত ছিল, তাহা কোন মহাশক্তির কৃপায় ষষ্ঠ বংশধর পাইলেন, যুক্তি কৌশলের দ্বারা ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করা মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। অতএব এখন ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় যে স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব মিলাইয়া-মিশাইয়া একটি দেহ নির্ম্মিত হয়; অথবা দুইটি সজীব, সচল, সজ্ঞান প্রাণীর চির—আলিঙ্গনে একটি দেহসৃষ্টি। এবং পৈতৃকত্ব রাসায়নিক শক্তি নহে, ইহা এমন কিছু যাহা এখনও বুঝা যায় নাই;—ইহা অপূর্ব্ব—অননুভূত।

এখন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত লা-মার্কের (Lamarck) "অবস্থাবাদ" বিষয়ের একটু আলোচনা আবশ্যক। " The infinite delicate variations in the world of organic beings are owing to the intense irritability and susceptibility to molecular changes of protoplasm, and the consequent action of the envoirnment upon it. Natural selection evoked some unknown force vaguely of the nature of will. " অতি সামান্য কারণেও যদি পারমাণব ব্যবস্থা সঞ্চালিত হইয়া যায় তাহা হইলে জীবাণুগণেরও পরিবর্ত্তন সম্ভবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষের গুণে জীবদেহে মানসিক শক্তির (will force) ন্যায় কোন বিবর্ত্তনশীল শক্তি প্রকাশিত হয়। সামান্য তাপে অথবা শৈত্যে অথবা তড়িৎ শক্তির যৎসামান্য সংপ্রসারণে পারমাণব জগতে একটা বিরাট বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। প্রতি পলে ২ বিশ্বের অনন্ত পরমাণু বিস্তারে প্রলয় কাণ্ড হইতেছে। এবং জীবাণুগণ (Protoplasm) এই পরমাণুর গোলমাল বড়ই অনুভব করিয়া থাকে। উহাদের একটু উলট—পালটে জীবাণু অস্থির হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে সৃষ্ট জগতের যাবৎ জীবলোকই এই জীবাণুগণের সংযোগ, সংমিশ্রণে এবং সমাহারে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবাণু (Protoplasm) আর কিছুই নহে কেবল ("The elementary form of living matter, the basis of life both in animals and plants. ") জীবন্ত পদার্থের আদিকারণ—পুরাতন বিধাতা জন্তু এবং পাদপগণের প্রাণিদেহের সৃষ্টি করা। সুতরাং জীবাণুর পরিবর্ত্তনে বৃহৎ প্রাণীরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ জল বায়ুর, অথবা স্থানীয় কোন বিশেষ কারণে যে প্রাণীর পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেবল রাসায়নিক ক্রিয়াফলই নহে, জীবাণুগণের বিকার মাত্র। এবং এই পারিপার্শ্বিক বিবর্ত্তনের জন্য মানসিক শক্তির (will power) স্ফূর্ত্তি অথবা পরিপুষ্টি হয়। দূরত্ব বিচার, বর্ণ-বিচার, অনুভূতি, স্ফূর্ত্তি, স্মৃতিশক্তি আদি কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক পদার্থ সঙ্ঘাতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথার বিস্তার বিবরণ অসম্ভব। আপাততঃ মানিয়া লওয়া যাউক যে মনের বিকাশ

বাহ্যাবস্থা বাছিয়া লইবার গুণে হয়। তাপতেজের সাহায্যে কোন রাসায়নিক পদার্থ-শক্তি জন্য মনের বিকাশ হয় না, পরন্তু পারিমাণব সঞ্চালনে জীবাণুগণের বিকার জন্য। এই জীবাণুগণকে মনস্বী এবং স্বেচ্ছাযুক্ত বলিয়া মনে হয়। উহারা গতিশীল, জীবনধারণ-যোগ্য কার্য্যপটু; এবং যতদূর পরীক্ষিত হইয়াছে এই সকল ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাশূন্যে হয় না। তবেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে অবস্থার সঙ্ঘাতে জীবাণুর বিকৃতি জন্য বৃহৎপ্রাণীর মনের উৎপত্তি। কেননা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে জীবাণুগণের সমষ্টিতে মনুষ্যাত্মার সৃষ্টি—মনুষ্যদেহের উৎপত্তি। এবং যদি পারিমাণব পরিবর্ত্তনে জীবাণুগণ আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ক্লেশ বোধ করে, তাহা হইলে সমষ্টি-শক্তিতেও সেই ক্লেশানুভব সঞ্চারিত হইবে। কারণ ব্যষ্টির গুণ সমষ্টিতে থাকিবেই। এই ক্লেশানুভব সমষ্টি মনুষ্যাত্মা এবং মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হইলে, যাহাতে এই যন্ত্রণা বিদূরিত হয় তাহারই জন্য মনুষ্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা (Natural selection) হইতেই মনঃশক্তির বিকাশ। কেননা খুঁজিয়া প্রকৃতির অনুকূল অবস্থা বাহির হইলেই রুচির এবং প্রবৃত্তির প্রস্ফুরণ হইবে। কাজেই বলিতে হয় যে জীবাণু মনঃ সমষ্টিতে বৃহৎ প্রাণীর ইচ্ছার বিকাশ।

ইহা এখন প্রতিপন্ন হইল যে নির্জীব পদার্থ সংযোগ জন্য রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল মনুষ্যদেহ এবং মনুষ্যাত্মা নহে। জীবাণুর সম্মিলনে এক অলৌকিক উপায়ে জীবসৃষ্টি। সুতরাং পঞ্চে পঞ্চ মিশিলে যে জীবাত্মা বিলীন হইবে ইহা সত্য সিদ্ধান্ত নহে। এবং মেদ-মাংসবিমাপূর্ণ শারীর-ক্রিয়া হইতে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি যে স্বাধীন—স্বতন্ত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের বিচার্য্য বিষয়ের সৎসিদ্ধান্তে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের দেশের সেকালের বৃদ্ধগণ "ঝাড়ফুক" ব্যাপার বড়ই বিশ্বাস করিতেন। ইদানীং থিওসফীর, কল্যাণে 'Mesmerism' 'Hypnotism' আদি ব্যাপার অনেকে চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ নিজেরাই উহাতে পটু। এই মেস্মেরিজমদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে "our normal consciousness as representing only a fragment of the activity going on in our brains. No known form of human consciousness manifests or comes near to manifesting the total self; and consequently, that the empirical or superficial consciousness, with which we habitually identify ourselves, can only discover, indirectly and inferentially, by experiment and artifice, the extent of our intellectual being. We know not what fraction of ourselves it may be which till now we have taken for the whole." (Prof. Myers) আমাদের এই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা আমরা যে দেখিতে শুনিতে, বুঝিতে পারি, সে অনুভূতিজ্ঞান আমাদের আছে, তাহা আমাদের মস্তিষ্কস্থিত এক পূর্ণজ্ঞানের অংশ মাত্র। এই যে ধৃতি—স্মৃতি-শক্তি শালী, সুখ-শান্তি বিলাস-বৈভব ভোগী আমাদের সাধারণে প্রকাশিত আমিত্বজ্ঞান ইহা পূর্ণাত্মার কতটুকু অংশ তাহা বলা যায় না। অনেক রোগী পরীক্ষা করিয়া, অনেককে মেসমেরাইজ করিয়া ইউরোপের প্রধান ২ পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের মস্তিষ্কের দুইটি স্তর আছে; একটি সংকুচিত এবং অপরটি প্রকাশিত। যেমন দুইটি মানুষ একঘরে শয়ন করিয়া আছে, একজন গাঢ় নিদ্রাভিভূত এবং অপর জন জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল। নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া, সজাগ বন্ধুকে বিশ্রাম দিবার জন্য ঘুম পাড়াইতে পারে। তেমনি আমাদের সংকুচিত স্তর বিকশিত এবং প্রফুল্লিত হইতে পারে, এবং অপরটি সংপুটিত হইয়া যায়। উৎকট রোগ শান্তির পরে অনেককে নূতন মানুষ হইতে দেখা গিয়াছে; নূতন

ধৃতি, নূতন, স্মৃতি সবই নূতন। ফরাসীস পণ্ডিত De Puysegur প্রথমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার দেখাদেখি এবং তাঁহার বিচারে পরাজিত হইয়া অনেক বিজ্ঞ এবং প্রাচীন পণ্ডিত ইহার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল উপরোল্লিখিত তত্ত্বই প্রকাশিত হয় নাই। আর একটি মানসিক অদ্ভুত-ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উহার নাম Telepathy টেলিপাথি। The direct action of mind upon mind at a distance without the agency of the recognised organs of sense is a fact in Nature. স্বাভাবিক মধ্যস্থ বিষয় ব্যতীত একটি মনের উপর দূরস্থিত আর একটি মনের ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখান হইয়াছে যে একজন বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি বিদেশস্থ অন্যবন্ধুর চিত্তসম্মুখে প্রতিভাত করা যায়। পুত্রের মৃত্যুর কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে দূরস্থিতা মাতার যেন চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুযন্ত্রণা-চঞ্চল কাতরতামাখান পুত্রমুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই দুই স্থলেই বন্ধু এবং মাতা পরীক্ষার এবং পুত্রের মৃত্যুর কোন সংবাদই জানেন না। ফরাসীস বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ রাইবট সাহেব [M. Ribot] মার্কিণ প্রোফেসর জেম্‌স্ [Professor James of Harvard] এবং বিলাতের প্রোফেসর সিজউইক [Professor Sidgwick of Cambridge] ইহার বিশেষ অনুসন্ধান এবং আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তার পর আরও একটি মানসিক অদ্ভুত ব্যাপার জানা গিয়াছে। উহাকে "Automatic phenomenon of the mind" বলে। উহা চিত্তের নিরবলম্ব এবং স্বায়ম্ভুব কার্য্যশক্তি। যাহা একবার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আবার প্রকাশিত হইবে। যাহা মনুষ্য বিশেষের অজ্ঞাত, কিন্তু বন্ধুর অথবা পরিজন বর্গের জানা থাকায় প্রথম মনুষ্যবিশেষের চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এবং যাহা কাহারও জানা নাই, কোন বন্ধুও জানে না, বহুদিনের মৃত ও অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি জানিত হঠাৎ মনঃশক্তির দ্বারা সেই সকল ব্যাপার বিকশিত হয়। এই তিন প্রকারের (Automatic action) নিরবলম্ব মানসিক ক্রিয়া আছে। পদার্থতত্ত্বে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কোন পারমাণব বিষয় মধ্যস্থ না থাকিলে ক্রিয়ার বিকাশ অসম্ভব। জড় এবং শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে। যাহা শক্তি ক্রিয়া, তাহা জড়মধ্যস্থ পরিচালিত এবং প্রস্ফুটিত ক্রিয়া। পরন্তু উপরে মেসমেরিজম্, টেলিপাথি, অটোমাটিক ক্রিয়াদির যে বিবৃতি দিলাম তাহা কোন জড়মধ্য দ্বারা বিকশিত হয় না—উহারা নিরবলম্ব এবং স্বতন্ত্র। তাই মনঃশক্তি অন্য মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে অন্যজনকে ভাবাইতেছে, হাঁসাইতেছে, যাহা ইচ্ছা তদনুরূপ তাহাকে নাচাইতেছে। মানসিক ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি জড়-শক্তি দ্বারা হয় না। তাই প্রোফেসর মায়ার্স [Professor Myers] বলিতেছেন যে "The study of cases of this type has gradually convinced me that the least improbable hypothesis lies in the supposition that some influence on the minds of men on earth is occasionally exercised by the surviving personalities of men departed." এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে মৃত এবং পরলোকগত ব্যক্তিগণ জীবিত এবং পৃথিবীবাসীগণের মনের উপর বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে। নহিলে অন্য কোন উপায়ে এই সকল ব্যাপার বুঝান যায় না। বড় ২ বিজ্ঞ পণ্ডিতে এই সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই সব নূতন তত্ত্ব জগতে ব্যাখ্যা ও প্রচারিত করিয়াছেন। তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে জন্মান্তর আছে, পরলোক আছে, এবং জীবাত্মা অজড়, অপার্থিব, অজ্ঞেয় ও অ-শরীরী। কারণ পদার্থ-বিদ্যার যে জ্ঞানের পুঁটুলি আমাদের আছে তাহা দ্বারা এই সকল সাম্প্রত

আবিষ্কৃত ব্যাপার বুঝান এবং নির্দ্দেশ করা যায় না। বিশেষতঃ ইংরাজী তর্ক বিচারে a posteriori বিচার প্রশস্ত। অর্থাৎ দশ স্থানে, দশাবস্থায় দশ প্রকার পদার্থের পরীক্ষা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যাহার দ্বারা। পাশ্চাত্য জগতে যত কিছু আবিষ্কার উদ্ভাবনা হইয়াছে তাহা এই উপপত্তি বিধি দ্বারা। জড়তত্ত্বের যতটুকু আমরা জানি, যে সকল শক্তির গতি এবং পরিণতি গণনায় নির্দ্ধারিত করিতে পারি সে সকল কোন সিদ্ধান্ত দ্বারায় নবাবিষ্কৃত মানসিক ব্যাপার বুঝান যায় না। এবং জন্মান্তর, আত্মা ইত্যাদির বিষয় প্রাচীন ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করিলে এই সকল ব্যাপারের সত্য সামঞ্জস্য হয়। এতদ্ব্যতীত তর্ক শাস্ত্রানুসারে জন্মান্তর অস্বীকার করিলে গত্যন্তরও নাই। কারণ বর্ত্তমান বিশ্বতত্ত্বের ইহা প্রধান সিদ্ধান্ত যে স্বাভাবিক কোন ক্রিয়াই স্বতন্ত্র ঘটনা নহে, সকল পরিদৃশ্যমান ব্যাপার গুলিই একটা বিরাট বিশ্বপ্রথার (universal system) আংশিক প্রস্ফুরণ মাত্র। সুতরাং মানসিক এই সকল ব্যাপার গুলিকে একলা ছাড়িয়া দিলে হইবে না, ইহাদিগকে বিশ্বপ্রথার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যদি স্বীকার কর যে মেসমেরিজম সত্য, টেলিপাথি সত্য, ক্লেয়ারভোয়েন্স সত্য, অটোম্যাটিক ক্রিয়া সত্য, জীবাণু আলিঙ্গনে প্রাণিসৃষ্টি সত্য, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে জন্মান্তর আছে। স্বীকার করিতে হইবে যে এই চমৎকার বিরাট মনুষ্যজীব ক্রিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় "ফুটিল আর মিলিল" ব্যাপার নহে। ইহা পরম্পরাগত, নিয়মাধীন এবং সনাতন। শুধু তাহাই নহে, পরলোকগত আত্মা ইহলোকের প্রাণীর উপর কার্য্য করে—ক্রিয়া সমাপ্তি হয় না। পরিশেষে আমরা একটা পুরাতন কথার আলোচনা করিব। ইহা বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত সক্রেতীস (Socrates) এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্লেটো [Plato] মহোদয়ের "Doctrine of Reminiscence" অর্থাৎ সংস্কার তত্ত্ব। তাঁহারা বলিতেন যে স্বতঃসিদ্ধিজ্ঞান, সংগীত অনুভূতি শক্তি রূপ এবং মাধুর্য্যানুভববৃত্তি সকল পূর্ব্ব জন্মসংস্কারজ। সে কালে লোকে জন্মান্তর মানিত কাযেই তাঁহাদের এ কথা সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য জগতে জড়তত্ত্ব প্রচারিত হইল, লোকেও জন্মান্তরের কথা ভুলিল। এবং ইহাঁদের কথাও সকলে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিল। সম্প্রতি জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ব বাদীগণের শিরোমণি প্রধান পণ্ডিত ওয়ালেস (Professor Wallace) প্লেটোর এই সংস্কার তত্ত্ব গ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "These sudden increments of faculty— mathematical, musical, and the like, which occur without apparent heriditary cause, indicate some access of energy out side the order of purely terrene evolution." এই হঠাৎ প্রাপ্ত বৃত্তি সকল কোন অপার্থিব শক্তি দ্বারা উদ্ভূত হইয়া থাকে। কারণ পৈত্রিকত্ব [Heredity] দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। প্লেটো আরও একটা কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, যাহা একদিন অনাদৃত ছিল। আবার সত্য এবং প্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যাত "close connection of psychosis and neurosis or to every observable thought or emotion of man there corresponds some change or movement in the material substance of the brain." অর্থাৎ মানসিক পরিবর্ত্তনানুযায়ী মস্তিষ্কের তরল পদার্থের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন ২ মনের উন্নতি অথবা অবনতি হইবে মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী তদনুরূপ স্ফীত অথবা কুঞ্চিত হইতে থাকিবে। অন্য কথায় বলিতে হইলে বলিব যে মানসিক শক্তি মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে। যেমন সুগায়ক ভগ্ন বীণায় সংগীত করিতে অক্ষম, তেমনি মন বিকৃত

মস্তিষ্ক লইয়া কার্য্য করিতে অপটু। মন কর্ত্তা, মস্তিষ্ক করণ এবং অনুভূতিনিচয় কর্ম্ম। সুতরাং মন স্বাধীন, এবং যে নিয়মে জড় জগৎ পরিচালিত হয়, যে নিয়মে নির্জীব পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইয়া থাকে; সেই নিয়ম প্রণালীতে মন শাসিত এবং সংপৃক্ত হয় না। সুতরাং একটা মনোময় জগৎ অনুমিত করিয়া মনের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উপপত্তি-বিধিতে কোন দোষ ঘটে না। তাই আধুনিক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞ পাশ্চাত্য শাস্ত্রবিদ্‌গণ ধীরে ২ মনের এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। এখনও প্রাণী-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। কত কথা জানিবার, কত বিষয় বুঝিবার, কত ব্যাপার দেখিবার আছে। কিন্তু যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতেই পরলোকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

আমরা এতক্ষণ আধুনিক প্রাণীতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের অনেক গুলি বিষয়ের স্থূল আলোচনা করিলাম। এবং যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে জন্মান্তরে বিশ্বাসী হইলে বৈজ্ঞানিক জগতে অপদস্থ হইতে হইবে এমন বোধ হয় না। কেননা বড় ২ বিজ্ঞান-গুরু, যাঁহাদের কথায় পাশ্চাত্য-জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহারা ক্রমে ২ পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। এপ্রেল মাসের "Nineteenth century" নামক বিলাতী বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রোফেসর মায়ার্স "Science and Future life" শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অনেক উক্তি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এবং তাঁহারই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আমরা এই জন্মান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। "ধর্ম্ম প্রচারকের" অঙ্গে এত পাশ্চাত্য বাদ বিতণ্ডা, জড়াইতাম না; যদি ইহা দৃঢ় ধারণা না থাকিত যে ইংরাজীর দোহাই না দিলে শিক্ষিত বিদ্যাগর্ব্বিত হিন্দু যুবক গণের আসন টলে না। যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, তাঁহারা পরলোকের জন্য সদাই চিন্তিত, এবং সাধু ও সৎপথাবলম্বী। তাঁহারা পাপকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন, নরকের ভীষণ চিত্রে চিন্তিত ও ভীত হয়েন। তাঁহারা সামাজিক সকল সদ্‌গুণ রাশি দ্বারা সমলঙ্কৃত। পরন্তু যাঁহাদের চিত্ত পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রভায় প্রজ্বলিত হইয়াছে, যাঁহারা শিক্ষিত, অন্ধবিশ্বাস-শূন্য, স্বাধীনচিত্ত, তাঁহারা সংস্কৃত বচন প্রমাণ দিলে ত বুঝিবেন না। তাঁহাদের জন্য বিলাতী কথা চাই।

একনাথ-মহারাজ-চরিত।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, পৈঠন বা প্রতিষ্ঠান-পুরী নামক স্থানে এক জন-ঋক্‌বেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহাঁর নাম ভানুদাস। ইনি ভক্তিমান্ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। ইনি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না, কিন্তু একটা ঘটনাতে অনেকের কাছে পরিচিত হয়েন। একদা বিজয়া গ্রামের মুসলমান রাজা পাণ্ডরপুর হইতে বিঠোবা দেবের মূর্ত্তিটী উঠাইয়া লইলে পর, ভানুদাস তাঁহার সন্নিধানে গমন করত অনুনয় বিনয় সহ অনেক বুঝাইয়া ঐ মূর্ত্তিটী পুনরানয়ন করত তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করেন। ইঁহার পুত্র চক্রপাণি সচ্চরিত্র ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। চক্রপাণির পুত্র সূর্য্য নারায়ণ। ইনিই একনাথের পিতা ছিলেন। কিন্তু একনাথের শৈশব-অবস্থায় ইঁহার স্বর্গ লাভ হওয়াতে তাঁহার প্রতিপালনের ভার চক্রপাণিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৪৭০ শকাব্দে [১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে] একনাথ পৈঠনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একনাথের প্রকৃতি অতি শান্ত ছিল। বাল্যাবস্থাতেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল। বালক স্বভাবতঃ ক্রীড়াপরতন্ত্র। কিন্তু একনাথ কখনও খেলা করিতেন না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন কি এক অগাধ চিন্তায় চিন্তিত আছেন। তিনি মধ্যে ২ গোদাবরীতীরে গমন করত, কোন স্থানে প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাকে পূজা করিতেন।

পুষ্পের অভাবে, ক্ষুদ্র ২ প্রস্তর খণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার স্থাপিত দেবতাকে পূজা করিতেন, এবং অস্পষ্ট শব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। কখন সাধু হরিদাসকে অনুকরণ করিয়া কথকতা করিতেন, এবং কোন প্রকার বাদ্য যন্ত্রের অভাবে কুশী বাজাইতেন। এই প্রকারে তাঁহার শৈশব অবস্থা অতিবাহিত হইল। চক্রপাণি বিবেচনা করিলেন যে, একনাথকে বিদ্যাভ্যাস করান আবশ্যক। তিনি নিজে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। একনাথের ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে একবার যাহা শিক্ষা করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না। লেখা পড়ায় কিছু অগ্রসর হইলে, চক্রপাণির ইচ্ছা হইল যে একনাথকে বেদ অধ্যয়ন করান। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাকে ছয় বৎসর বয়সে যজ্ঞ উপবীত দিলেন। পরে, এক জন জ্ঞানাপন্ন অধ্যাপকের কাছে একনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। একনাথ একাগ্র চিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধির প্রভাবে একনাথ শীঘ্র বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। অধ্যয়নকালে, অবকাশ মতে তিনি কথা ও পুরাণ শ্রবণ করিতেন। এই প্রকারে, তিনি অনেক পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সাধুগণের জীবনীপাঠ তাঁহার একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি মহাজন দিগের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিবার জন্য যত্নবান্ হইতেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তাঁহার অন্তঃকরণের একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিল। তিনি তজ্জন্য বড় ২ অধ্যাপক মহাশয়দের সহিত আলাপ করিতেন, তৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন এবং জটিল বিষয় সকল বুঝাইয়া লইতেন। এক ২ সময়ে তিনি এ প্রকার প্রশ্ন করিতেন যে, অধ্যাপক মহাশয়দের তাহা মীমাংসা করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। কিন্তু সকল বিষয়েই তিনি এমন ধীরভাব প্রকাশ করিতেন যে কেহ কখন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইত না। প্রত্যুত, সকলেই তাঁহার সদ্গুণের প্রশংসা করিত। তাঁহার এ প্রকার সহিষ্ণুতা ছিল যে, তাঁহার সম-বয়স্ক কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি স্থির ভাবে থাকিতেন। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি গণের প্রতি তিনি ভক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার পিতামহের একান্ত অনুগত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহীর সেবা করিতেন। মধ্যে ২ তিনি গ্রামের বাহিরে কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। কি উপায়ে ভগবান্কে লাভ করিবেন এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত

একদা একনাথ গ্রামস্থ একটী শিব-মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈব বাণীটী শুনিতে পাইলেন—"দেবগড়ে জনার্দ্দন পন্থ নামে এক জন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাকে গুরু রূপে বরণ করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বাক্য গুলি শুনিয়া একনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কোথা হইতে এই আদেশ-বাণী আসিল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পুরাণ পাঠে দৈববাণীর কথা অবগত ছিলেন। ইহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্থির করিলেন। দৈববাণীটী পাছে বিস্মৃত হন, এই বিবেচনা করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিলেন, এবং বারম্বার তাহা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবগড়ে যাইবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন কিন্তু গৃহ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর বৃদ্ধাবস্থা ও দৈন্যদশা এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও মমতার বিষয় যত চিন্তা করিতে লাগিলেন তত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা এবং ব্রহ্মলাভের অতুল আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। এক দিন প্রভাতে উঠিয়া প্রতিষ্ঠান পুরী ত্যাগ করত

দেবগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কেবল এক জন পৌরাণিক ব্যতীত তাঁহার অভিপ্রায় কেহই অবগত ছিল না। বালকের পক্ষে পদব্রজে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। একনাথেরও কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। তিনি দিবসে ভ্রমণ করিতেন এবং রাত্রিতে কোন বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। ফল মূল খাইয়া তিনি ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। নিজের ক্লেশের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না। জনার্দ্দন পন্থের দর্শন-লাভই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কত দিনে এবং কি প্রকারে সেই সাধুর দর্শন পাইবেন এই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। পৈঠন হইতে দেবগড় (ইহার অপর নাম দৌলতাবাদ) ২০ ক্রোশ। এক নাথ ৫ দিনে এই পথ অতিক্রম করিলেন।

এ দিকে চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রী একনাথকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রতিবাসী গণকে একনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যে ২ পণ্ডিত গণের কাছে একনাথ গমন করিতেন, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যে পৌরাণিকের কাছে একনাথ তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন, তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সুতরাং একনাথের কোন সংবাদই পাওয়া গেলনা। একনাথ গ্রামস্থ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইলেন, এবং সকলেই তাঁহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। গিরিগুহা, নদীতীর, বন ও দেবমন্দির প্রভৃতি সকল স্থানেই তাঁহার তত্ত্ব লওয়া হইল, কিন্তু কোন খানেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এক নাথ দেবগড়ে উপনীত হইয়া জনার্দ্দন পন্থের আবাস স্থানের অনুসন্ধান লইলেন। পন্থজী খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তত্ত্ব লইবা মাত্র সমুদায় অবগত হইলেন। এ স্থানে জনার্দ্দন পন্থের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পন্থজী দেশস্থ আশ্বলায়ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চালিস গ্রামে * তাঁহার নিবাস ছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি মুসলমান রাজার অধীনে উচ্চ ২ পদ পাইয়াছিলেন। শেষে তিনি দৌলতাবাদের প্রধান অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পন্থজীর শারীরিক বল এবং সাহসও বিলক্ষণ ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাতে ধীরতা ও বীরতা বিরাজ করিত। আবার তিনি এক জন সাধক ছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি দত্তাত্রেয়ের † পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং সে দিন তিনি বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইতেন, এবং তাঁহার সম্মানের জন্য রাজাদেশে সমুদায় কার্য্যালয়ই সে দিন বন্ধ থাকিত। অন্যান্য দিনে, বিষয় কার্য্য সমাধার পর, তিনি সন্ধ্যা পূজা ও ধর্ম্ম আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যোগের প্রভাবে দত্তাত্রেয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

একনাথ, জনার্দ্দনপন্থের বাটীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এক জন ভৃত্যের দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা পন্থজীকে জানাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া জনার্দ্দন পন্থ উঠিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন ব্রহ্মচারীর বেশধারী একটী বালক দ্বারের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। একনাথের দৃষ্টি জনার্দ্দন পন্থের উপর নিপতিত হইল। দেখিবা মাত্র তিনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পন্থজীর চরণ তলে পতিত হইলেন। জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে নিকটে বসাইয়া মৃদু মধুর বচনে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জনার্দ্দন পন্থের তেজঃপুঞ্জ শরীর এবং সৌম্য ভাব

* এখানে জি, আই, পি, রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে।

† দত্তাত্রেয়—ইনি অত্রি মুনির পুত্র এবং ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে অতি সমারোহে ইঁহার পূজা হয়। ইঁহার জন্মদিনে মহোৎসব হইয়া থাকে।

দেখিয়া এবং তাঁহার মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া একনাথ পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং নির্ভয়ে তাঁহার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং ঈশ্বরদর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। যে দেববাণী শুনিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, দেবতার আদেশেই তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন। একনাথের কথাগুলি শুনিয়া জনার্দ্দন পন্থ পরিতৃপ্ত হইলেন। জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। একনাথ প্রাচীন কালের রীতি অনুসারে গুরুসেবা করিতে লাগিলেন। একনাথের প্রাত্যহিক কার্য্য এই রূপ ছিল। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করত তাঁহার গুরু দেবের গৃহ ও দেবগৃহ উত্তম রূপে পরিষ্কার করিতেন। তদনন্তর জনার্দ্দন পন্থের সেবা করিতেন। প্রথমে তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের আয়োজন করিতেন, পরে স্নানের জন্য জল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তদনন্তর পূজা আয়োজন করিতেন। বেল পত্র, তুলসী পত্র এবং নানা প্রকার ফুল নিজে চয়ন করিয়া আনিতেন এবং পূজার ঘরে সমুদায় সাজাইয়া রাখিতেন। ধূপ, দীপ, চন্দন প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতেন। স্নানের পর জনার্দ্দন পন্থ যে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, একনাথ তাহা ধৌত করিতেন। জনার্দ্দন পন্থ গৃহেতেই থাকুন কিম্বা রাজ কার্য্যে গমন করুন, দেবালয়ে থাকুন কিম্বা রণক্ষেত্রেই গমন করুন, একনাথ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইতেন, এবং যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা করিতেন। একনাথের শরীর সবল ছিল, সুতরাং তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। একনাথের প্রতি জনার্দ্দনপন্থ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাকে যত্নের সহিত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। একনাথের বুদ্ধিমত্তাব দেখিয়া জনার্দ্দন পন্থ চমৎকৃত হইলেন। বেদ উপনিষদ্ আদি প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যতীত একনাথ অমৃত * অনুভব ও জ্ঞানেশ্বরী অধ্যয়ন করিলেন। একনাথ অধ্যয়ন বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন, এবং জনার্দ্দন পন্থের কাছে উত্তর পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

ক্রমশঃ।

* দক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সাধু জ্ঞান দেব প্রণীত।

কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা।

(পৌষ সংখ্যার পর)

ত্রিলোকতারিণী মা কামাখ্যাদেবীর পীঠমালা অতি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দুর্গম গহন বনাকীর্ণ শৈলশিখরাদিতে স্থিতি বশতঃ ক্রমশঃ জন সমাগমের বিরলতা হইল, তজ্জন্য সিদ্ধস্থান সমূহ লোকসমূহের অবিদিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন পীঠ কোথায় আছে, তাহা শাস্ত্রেই নিবদ্ধ থাকিল; লোকে পুস্তকে পড়িতে লাগিল, শুনিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, কিন্তু দুর্গম স্থানের নিরূপণাভাবে সেই তথায় গমন করত কৃতার্থ হইতে পারিল না। ক্রমে কিছু দিনের জন্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। আবার যখন সময়ে মহামায়ার পরম ভক্ত মহানুভব মহাত্মাগণ জন্মিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃ আবার তীর্থপীঠ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই মহাপীঠ পুনঃপ্রকাশের যেরূপ কিম্বদন্তী আছে, পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

কুচবিহারের পূর্ব্বতন পরম ভক্ত শুক্লধ্বজ মহারাজ তন্ত্রমধ্যে মায়ের যন্ত্রপীঠের অতি মহিমা পাঠ করিয়া দেখিলেন পীঠস্থান তাঁহারই রাজ্যের কোন না কোন শৈলশিখরে সংস্থিত। কিন্তু সহসা তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন হইলেও ভক্তের মন মানিল না, শৈলশিখরবাসিনী মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় কোন্ দিকে গমন করিলে মনোরথ পূর্ণ হইবে ভক্ত মহারাজা তাহার অনেক সন্ধান ও বিচার করিয়া যাত্রা করিলেন। বনে ২ পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া শৈলশিখরবাসী বন্য জাতির যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই ব্যাকুল হৃদয়ে মায়ের তত্ত্ব ও সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, কেহই কিন্তু তাঁহার মনের মত উত্তর দানে সমর্থ হইল না। কেবল কতিপয় লোকে বলিল, যে আমরা তো কামাখ্যা বা কামরূপ কিছুই জানি না, তবে আমাদের যখন কোন বিপদ্ বিভ্রাট, পীড়া আদি হয় তখন ঐ ব্রহ্মপুত্রতটে উচ্চশীর্ষ শৈলশিখরে যে একটি ক্ষুদ্র স্থান দিয়া গুপ্ত গঙ্গার ন্যায় ধীরে ২ জলধারা প্রবাহিত হইয়া

যাইতেছে, ঐস্থানে গিয়া আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ পূজা ও মননাদি করিলে আমাদের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়। আমরা জানি না, যদি তোমার দেবতা ঐ খানেই থাকেন। মাতৃহারা শিশুর মন উচাটিত হইল, ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া রাজা দুরারোহ পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুশীতল নির্ম্মল জল-বাহী একটি সামান্য প্রস্রবণ দেখিতে পাইলেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, মনের পিপাসা মিটিল না, ক্ষোভ ও ব্যাকুলতা হৃদয়কে ব্যথিত করিল। মাকে দেখিবার সাধ বুঝি পূরিল না ভাবিয়া পথ-পরিশ্রান্ত মহারাজা কাঁদিয়া বলিলেন, মা! দেখা কি পাইব না, কাঙ্গালের প্রতি দয়া কি হইবে না! বিজন বনাকীর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গে মার চিন্ময়ী-রূপ চিনিতে না পারিয়া পাগলের মত রাজা কত কি ভাবিলেন, পরিশেষে বলিলেন, মা! যদি এইই তোমার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হয়, তবে আমি এই খানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব। একটি সামান্য দারুখণ্ডে বিশেষ রূপ কোন চিহ্ন করিয়া জলধারায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মা! এইই যদি তোমার সুস্থানপীঠ হয়, তবে আমি ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গেলে, এই দারুখণ্ডটী যেন আমার কাছে উপস্থিত হয়। নতুবা বুঝিব মা দাসের জীবনের আশা মিটিল না। এই বলিয়া তিনি স্নানার্থ ব্রহ্মপুত্রতটে অবরোহণ করিলেন।

* মায়ের মায়া কে বুঝিবে। [illegible] মায়ের দয়ার কি সীমা আছে। এই সব গুপ্ত প্রদেশ অপ্রকটিত থাকিয়াও ভক্তের কাতর ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিতে শক্তির বিশেষ প্রকাশ হইবে না, ইহা সিদ্ধান্ত থাকিলেও অনুগত ভক্তের কথা মা এড়াইতে পারিলেন না। প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিলে মা যে পাষাণ ভেদ করিয়া জীবন্ত সত্তায় ছেলেকে আদর করিয়া কোলে লইয়া থাকেন। মহারাজার কাতর ক্রন্দনে মায়ের দয়ার সঞ্চার হইল, নির্দ্দিষ্ট দারুখণ্ডে মায়ের শক্তি প্রবাহিত হইল। রাজা স্নানান্তে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি দারুখণ্ড জলস্রোতে (না—না, ভক্তি স্রোতে) ভাসিতে ২ রাজার করতলে আসিয়া উঠিল। মায়ের মায়ামন্ত্রবিমুগ্ধ রাজা তর্পণে মনোনিবেশ করায় পীঠস্থানের কথা একটু বিস্মৃত হইয়া-জল গ্রহণ করিতে গেলেন, সবেগে কাঠ খানি আবার হাতে আসিল, মায়ামুগ্ধ মহারাজা আবার বিরক্ত হইয়া ফেলিয়া দিলেন। ভক্ত মাকে ভুলিয়াছেন বলিয়া মা কি ভক্তকে ভুলিতে পারেন! আবার জল লইবার সময় কাঠ খানি আবার হাতে উঠিল, বারম্বার এই রূপ দেখিয়া রাজার মায়ার ঘোর ভাঙ্গিল, নিজ প্রার্থিত স্মরণ হইল; দেখিলেন, তাঁহারই চিহ্নিত সেই দারুখণ্ড, আহ্লাদে হৃদয় নাচিয়া উঠিল, মা দয়া করিয়াছেন জানিয়া জন্ম জীবন সার্থক বোধ করিলেন এবং বুঝিলেন এ স্থানেই কামরূপ কামাখ্যা পীঠ। আবার [illegible], সে দিন সেই স্থানেই পূজা পাঠ বন্দনাদি করিয়া রাজা চিরজীবনের মনের সাধ মিটাইলেন। রাত্রে [illegible] নির্ম্মল হৃদয়ে রাজা সেই হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ শৈলশিখরে বিশ্রাম করিলেন। মায়ের কোলে ছেলে যেখানে সেখানে শুইয়া থাকিতে পারে। "তার আবার কি ভয় ভাবনা যার মা ত্রৈলোক্য-তারিণী"। আজ রাজা ধন্য হইলেন, মায়ের কোলে শুইলেন, মায়ের কোলে ঘুমাইলেন। তাই বড় সাধ করিয়া পরিব্রাজকের সঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে—

* মায়ের কোলে ঘুমাব, মায়ের আশ মিটাব,
মা ছেড়ে আর না যাব, [illegible]।

জগতের সাক্ষাতে রাজা ঘুমাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-সমাধিকে আশ্রয় করিয়া মা চৈতন্যময়ী স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বলিলেন বৎস! তোমার ভক্তিতে আমি অব্যক্ত রূপিণী হইয়াও ব্যক্ত হইলাম। তোমার প্রতিজ্ঞানুরূপ আমার সোনার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও। মহারাজা মায়ের বাণী শুনিয়া কৃতার্থ ও চমকিত হইলেন; বলিলেন, মা! এত ধন আমি কোথায় পাইব যে, কেবল কাঞ্চনে তোমার মন্দির নির্ম্মাণ করিব! যদি আদেশ হয় তবে প্রস্তর-পুঞ্জে মন্দির নির্ম্মাণ করি ও প্রতি [illegible]রের উপর কিঞ্চিৎ ২ কাঞ্চন দান করি। ভক্তের কথায় মা বিদ্যুদ্বৎ হাঁসিয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজার নিদ্রা ভাঙ্গিল, চিরদিনের জন্য রাজার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া মা "স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল! চৈতন্য করিয়া, চৈতন্য-রূপিণী কোথায় লুকালো"। মায়ের আদেশে রাজা অপূর্ব্বমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। এখনও সেই মন্দির বিদ্যমান আছে। এরূপ সুগঠিত মন্দির আসাম অঞ্চলে আর কোথাও নাই।

আমরা গভীর শোকের সহিত জানাইতেছি, ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সভ্য ৺ কাশী-নিবাসী শ্রেষ্ঠিপ্রবর বাবু গোকুলচন্দ্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা বিখ্যাত হিন্দীকবি বাবু হরিশ্চন্দ্রও এই বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহাদিরাও ঐ বয়সে গতাসু হইয়াছেন। বংশপরম্পরাগত নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুসময়ের সীমা কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অঘটন ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার অদ্ভুত লীলা কে বুঝিবে? তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? বাবু গোকুল চন্দ্র নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরম-নিষ্ঠাবান্, বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, ধর্ম্মসভা সমিতিতে উৎসাহী ব্যক্তি এখানকার সম্ভ্রান্ত ধনী মহাজনদের ভিতরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাত্মা নিজ পুণ্যবলে ৺ কাশীলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য ভগবৎসমীপে কামনা করিবার আর কিছুই নাই। সর্ব্বদুঃখনাশিনী মা অন্নপূর্ণা তাঁহার অশান্ত পরিবারে শান্তি আনিয়া দিউন, বিপদের অকূল সাগরে কূল দেখাইয়া দিউন, ইহাই প্রার্থনা।

ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠক বর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, দিল্লীতে বিগত বারের ভারত ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশনে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের এক প্রস্তাব করেন। মহামণ্ডলে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবানুসারে একণে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। সম্পাদক দীনদয়াল আমাদিগকে সম্বাদ দিয়াছেন যে লখনৌএর মুন্সি নবলকিশোর এক লক্ষ টাকা ও কপূর থলার দেওয়ান মথুরাদাস বাহাদুর পঁচিশ হাজার টাকা উক্ত সাধু কার্য্যের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশা করি উক্ত মহাত্মাদ্বয় নিজ অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

বেদবিদ্যালয়ের আয় ব্যয় শ্রাবণ মাস ১২৯৮।

মুষ্টিভিক্ষা।

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	কুণ্ডলা বীরভূম	২০৲
" ভুবন মোহন সেন	আমিনপুর ঢাকা	১।৶১০
" রাখালদাস সেনগুপ্ত	জামালপুর	৪।০
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	২৲
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	গোয়ালপাড়া	৬৲
" অক্ষয়চন্দ্র আচার্য্য	কুমড়াবাদ ঢাকা	৯৲
" মধুসূদন দাস	গোয়ালপাড়া	৮॥০
৺ কাশীধামের মাস জ্যৈষ্ঠ		১৭৸৶
" রজনীচন্দ্র সিংহ	চুন্টা ত্রিপুরা	৩।৶০
" ঈশানচন্দ্র রায় সরারচর	ময়মনসিংহ	৪৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরিশাল	১০৲
" অতুল বাবু	ফুলবন মুরশিদাবাদ	২৲
" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শিলচর	৬৸০
" দুর্গাপ্রসাদ বাবু	ছাপরা	৮৲
" কেশবচন্দ্র ঘোষ ধরঞ্জামতৈল	সাহাজাদপুর	২৫৲
" মতিলাল ভাদুড়ি	টালাবাগান কলিকাতা	৫৲
" বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত	পটুয়াখালী বাখরগঞ্জ	৬৲
" ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ধানঘড়া রায়গঞ্জ	৶০
" দীননাথ পাত্র	রামপুরহাট	৫৶০
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	সাতঘরা হাওড়া	৶০
" লালা শীতলপ্রসাদ	ছাপরা	৩৲
" রমনীমোহন বসু	দিনাজপুর	৭॥০
" জগবন্ধু গুপ্ত	সুনামগঞ্জ	৪।৶০

সিমলা বালুগঞ্জ বাজার মাং শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		৩৷৷০
ঐ ছোট সিমলা ঐ	ঐ	১৷৷৶০
শ্রীতারকব্রহ্ম সেন গুপ্ত	সালিখা	১৩৶০

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর কলিকাতা		২৲
" বিপিন বিহারি রায় বাঁকুড়া		৷৶০
" গোপীপ্রসন্ন রায় রাজকলেজ বর্দ্ধমান		১৲
" প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মালন কেং আপিষ সিমলা		১৲
" হরিধন মুখোপাধ্যায় কমিঃ কেং ঐ	ঐ	১৲
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ	ঐ	১৲
ঐ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় হোম আপিষ	ঐ	২০৲
" পরমেশ্বর রায় ঐ	ঐ	২৲
" অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ	ঐ	২৲
" গঙ্গাধর দত্ত ঐ	ঐ	১৲
" রামচন্দ্র মিত্র ঐ	ঐ	১৲
" হরিদাস গুপ্ত ঐ	ঐ	১৲
" উপেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মিলিটরি একাউন্টস্	ঐ	২৲
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার স্যানিটরি কমিসনারস	ঐ	২৲
" অক্ষয়কুমার সরকার প্রাইভেট সেকরেটরিস্	ঐ	১৲
" হেমচন্দ্র সরকার ঐ	ঐ	৩৲
" গিরিশচন্দ্র রায় ঐ	ঐ	৩৲
ছাপাখানা ঐ	ঐ	২।০
শ্রী ভৈরব প্রসাদ সিংহ ঐ	ঐ	১৲
" কালীপদ ঘোষ ঐ	ঐ	১৲
" ভূতনাথ ঘোষ ঐ	ঐ	১৲
" ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ	ঐ	১৲
" ওমরাও সিংহ ঐ	ঐ	২৲
" বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী ফরেন আপিষ	ঐ	১৲
" কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
" বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিটরি সেকরেটরিস	ঐ	৫৲
" হরপ্রসন্ন ঘোষ মিরাট		৫৲
" উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেঃ প্রেস সিমলা		৩০৲

মাসিক বৃত্তি

শ্রীযুক্ত কাকিনার মহারাজা দত্ত লবঙ্গসুন্দরীবৃত্তি মাহ আষাঢ়	১০৲
" মহারাজা দ্বারভাঙ্গা মাহ জুলাই	২০৲
" বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ফরেন আপিষ সিমলা মাহ আষাঢ় ও শ্রাবণ	১০৲
" সতীশচন্দ্র রায় ফাইনান্স্ আপিষ মাহ ঐ ঐ	৷৷০

বাৎসরিক বৃত্তি শ্রাবণ ১২৯৮ হইতে।

শ্রীধীরকৃষ্ণ সরকার প্রাইভেট সেকরেটরিয়েট সিমলা		৫৲
" মন্মথ নাথ ঘোষ ঐ	ঐ	১৲
" বামাচরণ গুপ্ত ঐ	ঐ	১৲
" ত্রৈলোক্য নাথ মজুমদার ঐ	ঐ	৩৲
" বিধুভূষণ চৌধুরী ঐ	ঐ	৷৷০
" কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এডিকং আপিষ	ঐ	৩৲

জমা		খরচ	
মুষ্টি ভিক্ষা	১৭৮৶	আচার্য্যগণের দক্ষিণা	৪২৷৷০
এক কালীন	৯৫৷৶০	ছাত্র বৃত্তি	২৯৲
মাসিক বৃত্তি	৪০৷৷০	ছাত্রাবাস	৬৷৵১০
বাৎসরিক বৃত্তি	১৩৷৷০	মাশুল খরচ	।৵১০
	৩২৮৷০	খুঁচরা ব্যয়	১০৶১০
		নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারি	৩০৷৶০
			১১৮৮৶১০

বাকী তহবিল মজুদ—২০৯৷১০

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
লেখাধ্যক্ষ।

ধর্ম্ম প্রচারক

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ

কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচি।

১৪শ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
আশ্বিন মাস, শঃ ১৮১৩।

বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

স্তবমালা।

(যন্ত্রস্থ)

দেব দেবীর সুন্দর ২ স্তব এই পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। শিব দুর্গা জগদ্ধাত্রী শ্যামা গঙ্গা বিষ্ণু সূর্য্য গণপতি আদির মনোহর স্তব রাশি পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণেও ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। পবিত্র স্তব-পাঠ মনকে পবিত্র করে, হৃদয়ের কালি ঝুলি মুছাইয়া পরিষ্কার ঝর ঝরে করিয়া দেয়। সিদ্ধ মহাত্মাগণ প্রেমোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পরমপ্রভুর যে স্তব-গাথা গান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে ২ হৃদয়ে যে সুধা বর্ষিয়া দেয়, তাহা ভাবুক মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং ইহার পরিচয় অনাবশ্যক।

চণ্ডী ও পকেট গীতা।

(যন্ত্রস্থ)

চণ্ডী ও গীতা পাঠে ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষ ফল লাভ হয়। ইহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার অর্থ জ্ঞান অপেক্ষা পাঠের ফলই অধিক। যে গৃহে চণ্ডী বা গীতা প্রত্যহ পঠিত হয়, সে গৃহে আধি ব্যাধি বিপদাদির শান্তি হয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক উপদ্রব রাশি তিরোহিত হইয়া যায়। যে স্থান পর্য্যন্ত চণ্ডী বা গীতার পাঠধ্বনি উদ্গীরিত হইতে থাকে সে স্থানের আকাশ পবিত্র হয়, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার শক্তি সে স্থান অধিকার করিয়া থাকে সুতরাং প্রত্যেক গৃহে একখানি চণ্ডী ও গীতা থাকা আবশ্যক। অর্থ অপেক্ষা পাঠের ফল যখন অধিক তখন পাঠের শুদ্ধতার প্রতি মৌলিকতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। মৌলিক পাঠ পরিত্যাগ করিয়া প্রক্ষিপ্ত বা স্বকপোল কল্পিত পাঠ অবলম্বন করিলে কোন ফলই হয় না। বঙ্গদেশে যত গুলি চণ্ডী প্রচলিত আছে, উহাদের মধ্যে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকগুলির স্থলে স্থলে পাঠের অনৈক্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ৺কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে পাঠের মৌলিকতার প্রতি—শুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রকাশিত করিতেছি। চণ্ডী অশুদ্ধ রূপে পাঠ করিলে বংশ লোপ হয়। সুতরাং যাহাতে কিছু মাত্র অশুদ্ধ না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের প্রকাশিত চণ্ডীতে আর একটু নূতনত্ব আছে। যে সমস্ত ক্রম ও পদ্ধতির সহিত চণ্ডী পাঠ করিলে ফল লাভ হয়, বঙ্গদেশের কোন চণ্ডীতেই তাহা নাই। সেই সমস্ত ক্রম ও পদ্ধতি আমরা চণ্ডীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পকেট গীতাও মুদ্রিত হইতেছে।

মুদ্রণ-কার্য্য বড় ২ নূতন অক্ষরে সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে। বাঁধাই কার্য্যও সুন্দর হইবে। পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া আমরা গ্রাহকগণকে জানাইব।

শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর যে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে যাজ্ঞবল্ক্যদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥”

১৪শ ভাগ	“ এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৭
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ ”	আশ্বিন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনর্চিতং বৃথামাংসং কেশ কীটসমন্বিতম্।
শুক্তং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতম্।
উদক্যাস্পৃষ্টং সংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ।
অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্।
অস্নেহা অপি গোধূম যব গোরস বিক্রিয়াঃ।

অনাদর পূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন, বৃথামাংস, কেশ কীট-যুক্ত অম্ল পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিত কর্ত্তৃক দৃষ্ট রজস্বলা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, ইচ্ছা পূর্ব্বক পাদস্পৃষ্ট অন্ন কদাপি ভোজন করিবেনা। কিন্তু যে অন্ন ঘৃতাক্ত, তাহা বাসি হইলেও ভোজন করিবে! গোধূম, যব ও গোদুগ্ধ দ্বারা যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা যদি ঘৃতাক্ত না হয়, তবে বাসি হইলেও ভোজন করিবে।

সন্ধিন্যানির্দশাবৎসাগোপয়ঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঔষ্ট্রমৈকশফং স্ত্রৈণমারণ্যকমথাবিকম্।

গর্ভিণী অবস্থায় যে গাভীর একবার দুগ্ধদোহন হয়, এবং অপরের বৎসসাহায্যে যাহার দুগ্ধদোহন হয়, এবং যে গাভীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নাই, ও যে গাভী বৎসশূন্যা—তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। উষ্ট্র, একখুরবিশিষ্ট ও বন্য পশু এবং ভেড়ার দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ।

দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রু লোহিতান্ ব্রশ্চনাং স্তথা।
অনুপাকৃত মাংসানি বিড়্জানি কবকানি চ।
ক্রব্যাদ পক্ষি দাত্যূহ শুক প্রতুদটিট্টিভান্।
সারসৈকশফান্ হংসান্ সর্ব্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ।
কোয়ষ্টিপ্লব চক্রাহ্ব বলাকাবক বিষ্কিরান্!
বৃথা কৃশর সংযাব পায়সাপূপশষ্কুলীঃ
কলবিঙ্কং সকাকোলং কুররং রজ্জুদালকম্।
জালপাদান্ খঞ্জরীটান্ অজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লূরমেবচ।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহংবসেৎ।

দেবতার জন্য আনীত ঘৃত, ব্রশ্চন ও শিগ্রু বৃক্ষের লোহিত [আটা] অযজ্ঞীয় মাংস, বিষ্ঠাস্থানোৎপন্ন পদার্থ ও ছত্রাক, শিকারী ও আমমাংসভোজী পক্ষী, শুক, চাতক, টিট্টিভ, সারস, একখুর বিশিষ্ট হংস এবং গ্রামবাসী পক্ষী, কোয়ষ্টি (পক্ষি বিশেষ) জলকুক্কুট

চক্রবাক, বক, গ্রাম্যকুক্কুট, চড়ুই, দ্রোণকাক, কুরর, বৃককুট্টক, (কাটঠোক্‌রা) ছাতার পক্ষী নীলকণ্ঠ এই সমস্ত পক্ষীর মাংস, ও কশাই কর্ত্তৃক হত পশুর মাংস ও শুষ্ক মাংস ও মৎস্য এবং দেবতাকে অনিবেদিত পুপী পায়সাদি মিষ্টান্ন যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক ভোজন করিবেন, তিনি তিন দিন উপবাসী থাকিবেন।

ক্রমশঃ।

মায়া মমতা।

দুঃখপূর্ণ সংসার এত রমণীয় বোধ হয় কেন? দুঃখমন্ত্রণাময় জগৎ এত মধুর বলিয়া মনে হয় কেন? নিরাশার উষ্ণ নিশ্বাস যাহার মজ্জাগত ধর্ম্ম, নির্য্যাতনার হা হুতাশ যাহার শিরায় ২ নিহিত, এমন বিষম বিষধর অমৃতপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় কেন? মায়া মমতার প্রলোভন আছে বলিয়া। মায়া মমতা আছে বলিয়াই সংসারের চিতাভস্ম স্বর্ণরেণু বলিয়া বোধ হয়। মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ প্রেতভূমে শৃগালের হুহুঙ্কার কোকিলের ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হয়, মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ ঘোর গহন অরণ্যানী বিলাসময় ক্রীড়াকানন বলিয়া বোধ হয়। মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ কটু কঠোর দুর্ভেদ্য বজ্র সুকোমল কুসুমাস্তরণ বলিয়া মনে হয়। সংসার-বৃক্ষে মায়া মমতাই ফুটন্ত ফুল, সংসার-মরুভূমে মায়ামমতাই অমৃতের নির্ঝরিণী। সংসার-কালরাত্রির করাল অন্ধকারে মায়া মমতাই শুভ্রজ্যোৎস্না। মানুষের এত পরিশ্রম, এত কষ্টময় জীবন-সংগ্রাম সমস্তই সহিয়া যাইতেছে, মায়া মমতার জন্য। মমতার প্রশান্ত ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া মানুষ সংসারের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়, সংসারের সকল ব্যথা মমতার অমৃত-নিষেকে মানুষের মর্ম্মতল হইতে মুছিয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রম-জনিত অবসাদ মমতার মদিরা-পানে কাটাইয়া মানুষ নবোৎসাহে জীবন্ত হইয়া উঠে। মানুষের শিথিল মর্ম্মগ্রন্থি মমতাভিসিক্ত হইয়া পুনরায় সতেজ সরস হইয়া উঠে। সুতরাং মমতার শক্তি মর্ম্মস্পর্শিনী।

মায়া মমতা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, ধন জন পরিবারাদির প্রতি আন্তরিক টান। ইহাকে আসক্তিই বল, ভালবাসাই বল, একই কথা। দার্শনিক ভাষায় বুঝিতে হয় যে বুদ্ধি পরকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বিভক্তকে সংযোজিত করিয়া লইতে চায়, পৃথক্‌কে সম্মিলিত করিয়া লইতে চায়, বিভিন্নকে আত্মীয় করিয়া লইতে চায়, তাহাই আসক্তি বা মায়া মমতা। সাধারণ চলিত অর্থে মায়া মমতার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। দার্শনিক অর্থে মায়া মমতার গণ্ডী ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়। দার্শনিক অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই মায়া মমতার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার যো নাই, মায়া মমতার সুবিশাল গর্ভে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে। ভিখারি হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত গৃহস্থ হইতে অরণ্যবাসী উদাসীন পর্য্যন্ত মনুষ্য হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত মমতার দাস নয় কে? অপরকে আত্মসাৎ করিবার জন্য—অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, ভালবাসার সামগ্রীকে করামলকবৎ করিবার জন্য জগতে চেষ্টিত নয় কে? গৃহী ধন জন পরিবার পাইবার জন্য লালায়িত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইবার জন্য ব্যগ্র, সম্মানার্থী সম্মান পাইবার জন্য উৎসুক, জ্ঞানার্থী জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যস্ত, দেবতা অমৃত পাইবার জন্য ব্যাকুল। নিঃসম্বল ভিখারি এক খানা জীর্ণ বস্ত্র পাইলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। ভালবাসার ধনকে পাইবার জন্য আবেগ, প্রিয়তম পদার্থের সহিত মিলিত হইবার জন্য আন্তরিক টান ইহাই ত মমতা। এ মমতার উপাসক জগতে

নয় কে? সুখের সামগ্রীর প্রতি অনুরক্তি জগতে কাহার নাই? প্রিয়তম বস্তু পাইবার পিপাসা জগতের সকলেরই সমান। এ অংশে কাহারও সহিত কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল প্রিয়তার চিত্র লইয়া—সুখের আদর্শ লইয়া। অর্থগৃধ্নু জীব আমরা অর্থকেই সমস্ত সুখের আদর্শ মনে করি, তাই অর্থের প্রতি আমাদের মায়া মমতা। টুক্‌টুকে ঝক্‌ঝকে খেলেনা দেখিয়া বালকের মন ভুলিয়া যায়, খেলেনা পাইলে সারা দিন সমস্ত ভুলিয়া সে তাহাতে মজিয়া থাকিতে পারে, খেলেনার জন্য সে মাকে ভুলিতে পারে, পিতাকে ভুলিতে পারে, আহার নিদ্রাকে ভুলিতে পারে, খেলেনার এমনই মাহাত্ম্য, তাই বালকের খেলেনার প্রতি মায়া মমতা। যুবতীর হাসিমাখা মুখখানিকে যুবক সুখের সার সর্ব্বস্ব মনে করেন, তাই যুবতীর জন্য যুবকের মায়া মমতা বা আসক্তি। আবার অত্যুৎকৃষ্ট দার্শনিক পুরুষ নিজের উচ্চ চিন্তাকেই সাংসারিক সমস্ত সুখের বরণীয় বলিয়া মনে করেন, তাই গভীর চিন্তার প্রেমে তিনি পাগল, সেই চিন্তার প্রতিই তাঁহার মায়া মমতা বা আসক্তি। একটা সত্য ঘটনা মনে হইতেছে। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের যখন বিশেষ চর্চ্চা ছিল, সেই সময়কার একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িকের কথা বলিতেছি। তিনি একদিন নিজ কুটিরে বসিয়া শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় একজন ধনী জমিদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া নৈয়ায়িক-পত্নীর বড়ই আনন্দ হইল, অদ্য কিছু লাভ হইবে, ভাবিয়া তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। জমীদার নৈয়ায়িকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈয়ায়িক তখন একখানি ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি নিবিষ্ট-মনে দেখিতেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন। বাহ্য জগতের প্রতি তাঁহার খেয়াল নাই। সুতরাং জমীদারের দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই হইল না। গুণগ্রাহী জমীদার কোন রূপ আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় করযোড়ে নৈয়ায়িককে বলিলেন, মহাশয়! আমি জমীদার, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আপনার গৃহে আসিয়া কিছু দান না করিয়া আমার যাওয়া উচিত নহে। আপনার যাহা কিছু অভাব অনুপপত্তি আছে, জানাইলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। জমীদারের কথা শুনিয়া সেই চিন্তানিমগ্ন নৈয়ায়িক তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ পুঁথিখানির এক খানি পাতা তুলিয়া জমীদারের হাতে দিয়া বলিলেন, পুস্তকের এই স্থানটা ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেছি না। বহু চিন্তা করিয়াও অর্থ লাগাইতে পারিতেছি না, ইহাই আমার অভাব অনুপপত্তি। দয়া করিয়া আমার কষ্ট মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, ত এই স্থান টা আমায় বুঝাইয়া দিউন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত অভাব অনুপপত্তি মিটিয়া যাইবে। নৈয়ায়িকের প্রার্থনা শুনিয়া জমীদার স্তম্ভিত হইলেন, সম্মান সহ পুনরায় বলিলেন, মহাত্মন! এ অভাব পূরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। অন্য কোন সাংসারিক অভাব বলিলে আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি। নৈয়ায়িক বলিলেন, আমার যাহা অভাব, তাহা এই মাত্র আপনাকে বলিলাম। ইহা ছাড়া আর কোন সাংসারিক অভাব আমার নাই। ব্রাহ্মণীর গুণে সাংসারিক কোন কষ্টই আমার নাই। তিনি অতিযত্নের সহিত শাকান্ন প্রতিদিন রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি তাহা পরমানন্দে ভোজন করিয়া থাকি। সুতরাং আপনার কাছে আর আমার কিছু চাহিবার নাই। ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। সদাশয় জমীদার যাইবার সময় ব্রাহ্মণীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া গেলেন।

তুমি আমি অর্থকে যেমন ভালবাসি, বালক

খেলেনাকে যেমন ভালবাসে, যুবক যুবতীকে যেমন ভালবাসেন, নৈয়ায়িক শাস্ত্র-চিন্তাকে সেই রূপ ভাল বাসিয়া ছিলেন খেলাতে মজিয়া বালক মা বাপ ঘর বাড়ি সমস্তই ভুলিয়া যায়, যুবতীকে পাইয়া যুবক পৃথিবী ভুলিয়া যান, সেই রূপ গম্ভীর চিন্তাতে মজিয়া নৈয়ায়িক টাকা কড়ি বাড়ী সংসার সমস্তই ভুলিয়া ছিলেন। আবার যিনি দাস্মিক ভক্ত, তিনি ভগবানের জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ইত্যাদি ভুলিয়া যাইতে পারেন। তোমার আমার পক্ষে টাকা যেমন সুখের সামগ্রী, যুবকের পক্ষে যুবতী যেমন সুখের সামগ্রী, চিন্তা-শীলের পক্ষে চিন্তা তেমনই শান্তির প্রস্রবন, ভক্ত দাস্মিকের পক্ষে ভগবৎ-প্রসঙ্গ তেমনই আনন্দবর্দ্ধক। অর্থ ঐশ্বর্য্য পুত্র স্ত্রীতে যে মধু আমরা আস্বাদ করি, চিন্তা ও ভগবৎ-প্রসঙ্গে দার্শনিক ও ভক্ত সেই মধুই উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহার স্বরূপতঃ তার-তম্য কিছু মাত্র নাই, কেবল শ্রেণীগত বিভেদ থাকিতে পারে। তুমি আমি শত চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিনা, চিন্তাশীলের চিন্তায় কি সুখ, ভক্তের ভগবদ্‌গুণানুবাদে কি সুখ। বিষ্ঠার কীট শত চেষ্টা করিলেও কি বুঝিতে পারে, রসগোল্লা খাইলে কি সুখ হয়? তুমি আমি বুঝি আর না বুঝি, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। চিন্তাশীল সুখ না পাইলে চিন্তায় আসক্ত হইবেন কেন, ভক্ত সুখ না পাইলে ভগবদ্ভাবরসে ডুবিবেন কেন? কেননা আসক্তি—লালসা যে সুখের বস্তুর জন্যই হইয়া থাকে। যে মমতা বা আসক্তি তোমাকে আমাকে সংসারের দাস করে, অর্থের জন্য পিশাচ করিয়া তুলে, সেই মমতাই গভীর জ্ঞানীর হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানরাজ্যের সেবক করিয়া তুলে। যে মমতা বা ভালবাসা কামুককে কামিনীর পাদোদক-পিপাসু করে, সেই ভালবাসাই প্রেমিক ভক্তকে ভগবচ্চরণপঙ্কজের কাঙ্গাল করিয়া দেয়। যে বৃষ্টির বারিবিন্দু নিম্বফলে পতিত হইয়া তিক্ত-রসে পরিণত হয় সেই বারিবিন্দুই পক্ব আম্রফলে পতিত হইয়া সুস্বাদু রসের সৃষ্টি করে। যে প্রস্ফুটিত কুসুম বিলাসীর হাতে পড়িলে বাইজির শিরোদেশে শোভিত হয়, সেই কুসুম সাধু উপাসকের হাতে পড়িলে দেবতার চরণ তলে উৎসর্গীকৃত হয়। যে গঙ্গার জল শুঁড়ির হাতে পড়িলে মদ্যে পরিণত হয়, ভগবৎ-সেবকের হাতে পড়িলে সেই গঙ্গার জল দেবতার চরণামৃত হইয়া দাঁড়ায়। মায়া মমতা স্বভাবতঃ বাস্তবিকই গঙ্গার জল। সংসার-কীটের বিলাস ভাণ্ডারে পড়িয়া উহা মাদকতায় পরিণত হয়, সাধুর কমণ্ডলুতে পড়িয়া উহা দেবতার চরণে নিবেদিত হয়। নারিকেল-জল কাংস্যপাত্রে রাখিলে মদ হইয়া যায়, তাহার মধুরতা মিষ্টতা বিকৃত হইয়া যায়; সেই রূপ মায়া মমতা সংসারেতে আবদ্ধ রাখিলে মোহময়ী মদিরা হইয়া দাঁড়ায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

আবার তাহাকেই ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিলে তাহাই অমৃত [ভক্তি] হইয়া যায়। আমরা মমতাকে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল করিয়া ফেলিয়াছি, চন্দনের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছি, অমরা-বতীর মাধুরীমাখা সামগ্রীকে নরককুণ্ডে ভাসাইয়া দিয়াছি। ব্যবহার দোষে সাগরসেচা মাণিককে আমরা ধূলিধূসরিত করিয়াছি, নির্ম্মল শারদীয় শশধরে গাঢ় কলঙ্ক কালিমার প্রলেপ দিয়াছি, স্বর্গীয় সৌদামিনীর জ্বলন্ত জ্যোতিকে অমাবস্যার অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছি। ব্যবহার করিতে জানিনা বলিয়াই মমতা আসক্তি আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়াছে—পুষ্পমালা আমাদের নাগপাশ হইয়াছে। এমনই আমাদের দুরদৃষ্ট!

সুখ।

সুখ কি ? " অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্ " । যাহা আত্মার অনুকূলবেদনা, যে অবস্থায় অনুভব-শক্তি সকল অবাধে এবং অনর্গলিত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন ইন্দ্রিয়গণ আত্মানুকূল কার্য্য করিতে থাকে, যে অবস্থায় প্রবৃত্তি প্রবাহ আত্মানুগ, যখন বাসনা আকাঙ্ক্ষাদি কোন দুষ্ট শক্তির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হয়, যে অবস্থায় যাহা চাহিব, যে বস্তুর জন্য আবদার করিব, তাহাই পাইব, তখন সেই অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলা যায়। মনুষ্য এমন দিন পাইলে সুখী হয়। সুখ আত্মার অবস্থা বিশেষ মাত্র, আত্মার কোন গুণ নহে, কোন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নহে, কোন আত্মীয় শক্তির প্রস্ফুরণ নহে । উহাকে আত্মার সর্ব্ব শক্তির, সর্ব্ব ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের অবস্থাও বলা যাইতে পারে। কারণ একাধারে দুইটি বিভিন্ন, বিরুদ্ধ এবং বিপরীত শক্তির ক্রিয়া সমভাবে ও একই সময়ে হইতে পারে না। শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেই অন্যান্য শক্তিকে সম্যক্ পরাভূত করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে । মনুষ্যের ইন্দ্রিয় শক্তি সকল পরস্পর বিরোধী এবং ভিন্ন ভাবাপন্ন। একের বিকাশে অন্যান্যের হ্রাস হয় ; এবং একের বৃদ্ধির সময়ে অন্যান্য শক্তি সকল তাহাকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টাও করে । সুতরাং ঠিক অবাধিত বৃত্ত প্রবাহ মনুষ্য-শরীরে হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই অনেকে শক্তিসামঞ্জস্যের অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু যদি সুখ অনুভূতি-গম্য হইল, তবে ক্রিয়াহীন সামঞ্জস্যের অবস্থাকে সুখ বলি কেমন করিয়া।

বিচার—তর্কের কথা যাউক ; সুখ কি তাহা প্রথমে সম্যক বুঝা উচিত । মোটা কথায় যখন আমরা অত্যন্ত খুসি হই, যখন আমোদে নাচিয়া উঠি, আহ্লাদে গলিয়া যাই, যখন উৎসাহে ফুলিয়া উঠি, হাঁসিয়া ঢলিয়া পড়ি; যখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষের তারাযুগল বিস্তৃত হইয়া পড়ে, মুখাবয়ব পরিবর্ত্তিত হয়, মাংসপেশী সকল এলাইয়া যায়; যে মুখভঙ্গী, যে শরীরের বিশেষ অবস্থা যে দেখে সেই বলে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে, সুখের সাগরে ভাসিতেছে, তখনই তাহাকে সুখী বলা যায়, এবং সেই অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলে । সুখ অনুভবের সামগ্রী ; সুতরাং যে কখনও সুখানুভব করে নাই তাহাকে বুঝান কঠিন। যে যেমন প্রকৃতির লোক যাহার যেমন প্রবৃত্তি, যে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে তদনুযায়ী ভিন্ন ২ বিষয়ে ভিন্ন ২ অবস্থায় তাহারা সুখানুভব করিয়া থাকে। ইংরাজ গ্রীষ্মকাল সুখের সময় মনে করে, আমরা শীতাগমে আমোদিত হই। এমন সকল বিষয়ে, সকল ব্যাপারে প্রত্যেক লোকই নিজ রুচি অনুযায়ী সুখী হয়। তবে মনুষ্য মাত্রেরই আনন্দানুভূতি এক প্রকারের, সুখবোধ সকলেরই সমান। এবং এই অনুভূতিই আলোচ্য। এবং ইহার ন্যূনাধিক্যানুসারে ইহার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

" সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ (৩৬)
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (৩৭)
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ (৩৮)
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ (৩৯) "

গীতা ১৮ শ অধ্যায় ।

সুখ তিন প্রকারের (১) সাত্ত্বিক, (২) রাজসিক (৩) তামসিক । " (১) ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অনেক কষ্টে যে সুখের [সমাধি সুখের] সম্ভোগ করা যায়, বিষয়-সুখের ন্যায় যাহা সদ্য লাভ করা যায় না, যে সুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, বিষয়-সুখের ন্যায় যাহার সঙ্গে কিম্বা অন্তে কোন

প্রকার দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা আয়াসসাধ্য উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এজন্য অতি বিধেয়ের ন্যায় মনে হয়, এবং পরিণামে অমৃতোপম হয়, যাহা আত্মতত্ত্ব বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাবস্থায় বিকসিত হয়, সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ। (২) বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-সংযোগাধীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্টদায়ক তাহাই রাজস সুখ। [৩] নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এই ক্ষণে এবং পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে তামস সুখ বলে।" সাত্ত্বিক সুখের কথা এখন থাকুক; অগ্রে রাজসিক ও তামসিক সুখ কি তাহা বুঝা যাউক। ইন্দ্রিয় ও বিষয়াধীন সুখ যাহা তাহাই রাজসিক সুখ। কামাদির অবাধিত উপভোগে যাহা সুখোৎপত্তি, তাহাই রাজসিক সুখ। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া, সুস্বরযুক্ত গীত শ্রবণ করিয়া, মধুরাস্বাদপূর্ণ খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া যে সুখ হয় তাহাই রাজসিক সুখ। মনুষ্য মাত্রেই এই সুখাংশভাগী, এবং এই সুখ লাভেচ্ছায় সতত চেষ্টিত। সুখ বলিলে এই রাজসিক সুখের ধারণাই সকলের হইয়া থাকে।

তবে রাজসিক সুখের প্রধান বাধা অতৃপ্তি। যতই প্রবৃত্তির বেগ ছাড়িয়া দিবে, শতমুখী হইয়া, সর্ব্বব্যাপী হইয়া যতই বাসনার লোলজিহ্বা প্রসারিত হইতে থাকিবে, ততই তৃষ্ণার তীব্র যাতনা কোটিগুণে বর্দ্ধিত হইবে। সে বিষম বুভুক্ষা ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না। সহজেই মনুষ্য চিরসুখের আকাঙ্ক্ষা করে, সদানন্দের ভিখারী হয়। এই অতৃপ্তি ত্যাগ করিতে চায়, পিপাসা মিটাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। পরন্তু দেখা উচিত কেন রাজস সুখে এমন অতৃপ্তি থাকে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াধীন সুখই রাজসিক সুখ। অর্থাৎ এ সুখ প্রধানতঃ শরীরকেই অপেক্ষা করে; কাযেই অতৃপ্তির ভাব শরীরজ। সুতরাং যত দিন শরীর থাকিবে, ততদিন এ সুখের সুখী হইতে হইলে অতৃপ্তিকে সঙ্গে লইতে হইবে, উহা চিরস্থায়ী থাকিবেই। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে শারীর কার্য্য-প্রণালী বুঝা উচিত। পারমাণব জগতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি শক্তির ক্রিয়া বুঝিতে পারি। এক অপসারকতা (Expansion) দ্বিতীয় সংকর্ষতা (adhesion)। তাপ-তেজের ক্রিয়া দ্বারা অণুপুঞ্জ ছড়াইয়া পড়ে, আপনা-আপনি পৃথক্ হইয়া যায়। সংকর্ষতা দ্বারা [শৈত্য বশতঃ] উহারা আবার একত্রিত ও সম্মিলিত হইয়া থাকে। যখন তাপের আধিক্য থাকে তখন পদার্থ মাত্রেই বিস্তৃত, একটু প্রসারিত হয়, শীতের সময়ে উহারা সংকর্ষিত কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। এই দুই শক্তি-সামঞ্জস্যে বস্তুর উৎপত্তি, অবয়বের—আকারের সৃষ্টি। তবে পদার্থ মাত্রেই উষ্ণতা আকর্ষণ করিতে অধিক পটু। যে বস্তু অধিকতর উত্তাপযুক্ত, তাহার তেজ হরণ করিবার জন্য শীতলতর সামগ্রী সকল বিশেষ চেষ্টা করে। এবং পরিণামে সে উত্তাপ অপহৃত হইয়া যায়। জীবদেহ জড় পদার্থ হইতে অধিক উত্তাপযুক্ত। উষ্ণতা প্রাণী দেহে জীবন ধারণের এক প্রধান কারণ। তাই আমাদের এই মনুষ্যদেহের তাপ পারিপার্শ্বিক সকল সামগ্রী সর্ব্বদা হরণ করিতেছে—আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। এবং পলে ২ আমাদের শারীরিক Tissue (পোষক ধাতু) নষ্ট হইতেছে; দশ জনকে বিলাইতে২ নিজের ভাণ্ডার খালি। এই অভাবের পূরণ করিবার জন্য আমরা আহার করিয়া থাকি। পাকস্থলীভুক্ত সামগ্রী লইয়া দিবারাত্রি পচন কার্য্য করিতেছে, এবং যে কারণে যখন শরীরের ধাতুক্ষয় হইতেছে তখনই তাহার অভাব মোচন করিতেছে। আমাদের শরীরে এই হরণ পূরণ কার্য্য নিয়তই হয়। পরন্তু স্বভাবের নিয়ম এই যে যে খানেই গতি, যে খানেই ক্রিয়া, সেই খানে তাপের বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং ক্ষয়ও অধিক হইবে। কাযেই আমরা এমন অবকাশ পাইব না যখন ক্ষতি

নাই, পূর্ত্তিই সব। কেননা ক্রিয়াধীন ক্ষয়, পূর্ত্তিকার্য্যও ক্রিয়া জন্য; কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতি। এই ক্ষতি-পরিপূর্ত্তি-চেষ্টাই প্রবৃত্তির পিপাসা—বাসনার তৃষ্ণা। যাহা আমার ছিল তাহা এখন নাই, অথবা মনে হয়, চেষ্টা করিলে যাহা পাইলেও পাইতে পারি তাহাই পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, উদ্যোগ হয়। পরন্তু যেমন পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে একটা ত্বরান্বিত কার্য্য হইলে, পুনঃ পুনঃ গতি ক্রিয়া হইলে সেই গতির পৌনঃপুন্য হয়, তাহার নিকাশ মরে না। তদ্রূপ শরীরে বার ২ একটা কার্য্য হইলে উহার এক সংস্কার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়, স্মৃতিপটে একটা দৃঢ় ধারণা লিখিত হয়। শরীরের পোষক ধাতুর ক্ষতিপূর্ত্তির কার্য্য পলে ২ হইতেছে, ইন্দ্রিয়গণ নানা দিকে প্রসারিত হইয়া বিবিধ প্রকারের অভাব সৃষ্টি করিতেছে, পূর্ব্বক স্মৃতি পুরাতন কথা ভুলিয়া নূতন আব্দার যোগাইতেছে তাই আমরা সদাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছি সেই দিন হইতে হারের কাছে খেলিতে হইতেছে, লোক-সানের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে। সুতরাং অভাব আর মিটিতেছে না। শরীর লইয়া নাড়াচাড়া যতদিন করিব ততদিন মিটিবেও না। ভগবান্ গীতায় বলিয়া-ছেন—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ॥" (২২)
(৫ম অধ্যায়)

"বাহ্য বিষয়ে সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ, তৎ সমস্তই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কেননা ঐ সকল সুখ আদি এবং অন্তবন্ত; অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশালী, অতএব, ঐ সুখের বিনাশ হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য হে কৌন্তেয়! ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না।" সুতরাং বাহ্যিক বিষয়-জন্য সুখ, ভোগ্য-ভোগী-সম্বন্ধ-জন্য সুখ রাজসিক সুখ, দুঃখের কারণ। অতএব বুঝিতে হইবে যে এ সুখে অতৃপ্তি অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় রাজসিক সুখে দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত থাকিবে। শুধু তাই কি? তোমারি কল্পনাচক্ষে যে অপরূপ সুন্দরীর লাবণ্যচ্ছটা দেখিয়া মাতিয়া উঠ, বাহ্য জগতে সে নমুনার মত কয়জন তেমন সুন্দরী কামিনী দেখিয়াছ? হৃদয়ের গুপ্ত গবাক্ষে বসিয়া তুমি নির্জ্জনে বিলাসের এবং ঐশ্বর্য্যের যে চিত্র অঙ্কিত কর এই জীবনে কখনও কি তেমন সুখের সাগরে ভাসিয়াছ? কখনই নহে। পথের ভিখারী হইতে কোটী-শ্বর হও, সার্ব্বভৌম সম্রাট হও, কল্পনার স্বপ্নেও যাহা কখনও দেখ নাই তেমন সম্পদ্ লাভ কর, তত্রাচ তোমার দুঃখের দুয়ার বন্ধ হইবে না, রাবণের চিতার ন্যায় তোমার দুঃখের চিতা অহরহ জ্বলিতে থাকিবে। জড় জগতের নিয়মাধীন তুমি, দেহী তুমি, শরীর-পথে যে সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিবে তাহাই বাধিত এবং রুদ্ধ হইবে। কামের বৃদ্ধিতে রোগ, ক্রোধের বৃদ্ধিতে রোগ, লোভের বৃদ্ধিতে রোগ, মদ মাৎসর্য্যের বৃদ্ধিতে রোগ—উন্মত্ততা এবং সকলের পরি-ণাম উৎকট যন্ত্রণাময়, বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যু। যেমন দাহজ্বরের সময়ে তৃষ্ণার মুখে যত জল পান করিবে, জিহ্বা আরও শুষ্ক হইয়া উঠিবে, তৃষ্ণা শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে, দেহজ্বালায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইবে। পরিশেষে মৃত্যুতেই সকলের নিবৃত্তি। তেমনি মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, যতদিন রক্তমাংসের জবরদস্তি থাকিবে ততদিন তেত্রিশ কোটী দেবতার কাছে মাথা কুটিলেও অতৃপ্তির ভাব দূর হইবে না।

তামস সুখ সাক্ষাৎ কোন অনুভূতিসাধ্য ব্যাপার নহে। উহাকে ইংরাজীতে "Negative function" বলা যায়। রাজস সুখে ইন্দ্রিয় বিশেষের তৃপ্তি চেষ্টা আছে। তামসে তাহা নাই, উহা সার্ব্বাবয়বিক সুস্থতা জ্ঞান, তাহাও ক্ষণিক ও অতি-সামান্য। সু-নিদ্রার পরে একটা যে প্রফুল্লতা হয়, আলস্য-বশতঃ একটা যে

আয়েস বোধ হয় তাহাই তামস সুখ। ইহাতে চেষ্টা নাই ও উদ্যোগ নাই। রাজস সুখে ক্ষণকাল আত্মহারাও হইতে হয়, তামসে আত্মবিস্মৃতি নাই। রাজসে প্রহ্লাদিনী শক্তি আছে, তামসে আত্মার মুগ্ধতা মাত্র, অবসন্নতা মাত্র আছে। তামস সুখ কেবল Analogy লক্ষণায় সুখ, বাস্তব সুখ উহাতে নাই।

সাত্ত্বিক সুখের যে বিবৃতি ভগবান্ দিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাধিকারীর পক্ষে অজ্ঞেয় ও অননুভূত। তবে রাজস সুখের সুখী হইয়া কখনও২ ক্ষণকালের জন্য যে তীব্র আনন্দানুভব করি, তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া অনবরত প্রবাহিত করিয়া যে সদানন্দের চিত্র কল্পনার পটে অঙ্কিত করি তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। স্থায়ী সুখ ঠিক কাল্পনিক না হউক, তবে কষ্টসাধ্য এবং সাধারণের অনুভাব্য নহে। পরন্তু যদি ব্যতিরেকী ব্যাখ্যা দ্বারা রাজস ও তামস সুখকে ক্ষণিক ও পরিণামে স্থায়ী দুঃখদ বলিয়া দুঃখের প্রথমাবস্থা নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সাত্ত্বিক সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে Sumum Bonum বলিয়া থাকেন। ইহাই পরমানন্দ এবং পরম পদার্থ। অপিচ "মূকাস্বাদনবৎ"। যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই মজিয়াছেন, তোমার, আমার সম্ভোগ করিবার যো নাই। এখন প্রশ্ন এই হইতেছে যে স্থায়ী সুখ সম্ভব কি না। দেহের কার্য-প্রণালীর যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে মানুষ যে স্থির হইয়া কোন সুখানুভব করিতে সক্ষম, ইহাই অস্বাভাবিক বলিয়া আপাতত বোধ হয়। যখন জীবনে অতৃপ্তিই সিদ্ধ ব্যাপার, তখন সুখের সঙ্গে যে দুঃখ মিশিয়া থাকিবে, আলোক-পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ছায়া চিরদিনই থাকিবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কোন ক্রিয়াই স্বাধীন এবং অবাধিত নহে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট শক্তিক্রিয়া সংযত সংবদ্ধ এবং নিয়মিত ভাবে হইতেছে। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার নাই; অনবরত, অবাধিত প্রবাহ নাই। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, অমৃতের পার্শ্বে বিষ আছে, পুণ্যের কোলে পাপ আছে। তাহা হইলে সাত্ত্বিক সুখ অসাধ্য ব্যাপার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ব্যাখ্যাত Sumum Bonum কে অসাধ্য অসম্ভব বলিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছেন। পরন্তু ভগবদুক্তি হিন্দুর বুদ্ধিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সাত্ত্বিক সুখ আছে এবং উহা সাধ্য ও মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। তবে পাশ্চাত্য যুক্তিতে ধরিতে গেলে ঠেকিতে হইবে। এই খানে আর্য্য শাস্ত্রের চরণচুম্বন করিতে হইবে।

যেমন বাহ্য জগতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার খেলা আছে, তেমনি মনুষ্য দেহেও ভিন্ন প্রকৃতির পরস্পর বিরোধী শক্তি আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা, তাহাই শরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করে, বাহ্য বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। অন্যান্য এমন মনঃশক্তি আছে, যদ্দ্বারা বাহিরের বিষয় হইতে বৃত্তি আকর্ষিত হইয়া কোন অন্তঃকেন্দ্রে সঞ্চিত হয়। এই জন্য দার্শনিকেরা "ব্যুত্থান" ও "নিরোধ" নামে দুই শক্তির কল্পনা করিয়াছেন। একের বৃদ্ধিতে অন্য সঙ্কুচিত হইবে। কামাদি ষড়্রিপু এবং বিষয়াশ্রিত অন্য বৃত্তি সকল 'ব্যুত্থান' শক্তি দ্বারা কার্য্যকরী হয়। নিরোধ দ্বারা মন আত্মপথের পথিক হয়। নিরোধ ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যুত্থান অধর্ম্মের মূল। পরমাত্মা চিদ্ঘন আনন্দময়। কেননা ভগবানকে সাধ্য দেবতা করিতে হইলে সগুণ ও সোপাধিক হইতে হইবে। তাই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ তাঁহাকে আনন্দময়,-আনন্দরূপ—সদানন্দ—সর্ব্বসুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নিরোধ মনকে এই আত্মানুগ করে—আনন্দসাগরে ডুবাইয়া দেয়। যে সাগরে ডুবিলে আর উঠিতে হয় না, কাজেই চিরসুখের সুখী হওয়া যায়, সাত্ত্বিক সুখ-ভাগী হওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাধ্য ব্যাপার; মরুপ্রদেশমুখী প্রবাহিনীকে সাগর পথে ফিরাইতে

নিষ্ক্রিয় অবস্থা। সুখ অনুভূতিগম্য, অনুরাগসাপেক্ষ, ভোগ্য অবস্থা; সুতরাং সুখানুভব করিতে হইলে আত্মীয় কোন এক বৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক। গীতাতেই ভগবান্ যে তিন প্রকার সুখের কথা বলিয়াছেন তাহারা সকলেইত অনুভাব্য ও সাধ্য। এখন Equilibrium অবস্থা করিতে হইলে আমাদের নিষ্ক্রিয় হইতে হইবে। তাহা অসম্ভব; যতদিন শরীরী থাকিব, যতদিন রক্ত মাংসের অধীন থাকিব, ততদিন শারীরিক ভিন্ন ২ বিপরীত প্রকৃতির শক্তি সকল ক্রিয়া করিতে থাকিবে। জড় জগতে ক্রিয়া শূন্যতা অস্বাভাবিক। অপরঞ্চ সুখ অনুরাগ সাধ্য ব্যাপার সুতরাং সামঞ্জস্য কোথায়? এতদ্ব্যতীত ঠিক সামঞ্জস্য কখনও হয় না। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়াশীল, তবে প্রস্ফুট আর অপ্রস্ফুট এই পার্থক্য। অর্থাৎ যে ফল লাভের জন্য এক শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাহার Energy তেজ নষ্ট হয় না। যখন প্রতিযোগী শক্তি ক্ষীণবল হইবে, তখনই উহা ফুটিয়া উঠিবে। এবং পলে পলেও নিজ গতি প্রকাশের জন্য সচেষ্ট থাকিবে। পৃথিবী সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা ভূমণ্ডল সরলরেখায় অনন্ত আকাশ পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা বাধিত হওয়ায় ঋজু পথ ত্যাগ করিয়া উহা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অন্য কথায় মণ্ডল-ক্রিয়া দুই শক্তির আঘাতের Resultant ফল ক্রিয়া মাত্র। কেননা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি ও আদি শক্তি সমবেগসম্পন্ন হওয়াতে পৃথিবী সূর্য্যাঙ্কে পতিত হইল না এবং অনন্ত আকাশ-পথেও ছুটিল না। বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থাই এই, শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ক্রিয়াশূন্যতা উৎপাদন হয় না, একটা মাঝামাঝি ফল হয়। বাগানে উলুবন ও গোলাপ গাছ দুই থাকিলে ভাল গোলাপ ফুটে না, কিন্তু বৃক্ষ পুষ্পশূন্য হয় না। পক্ষান্তরে বিষয়ানুরাগ হইতে আত্মানুরাগ অধিক তীব্র ও প্রবল; কাম হইতে ভক্তি অত্যন্ত শক্তি শালিনী। যাহা বাহ্যাবস্থার অপেক্ষা করে, শরীরের অপেক্ষা করে এবং বিষয়াধীন, তাহার বেগ শরীর ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের অবস্থা দ্বারা সংযত হয়, কিন্তু আত্মানুরাগ বিষয়-পরিত্যাগী, উহা স্বাধীন ও স্বভাবে কার্য্য করে বলিয়া উহার বেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তুমি সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও, তোমাকে তাহার মন যোগাইয়া চলিতে হইবে, তোমার শরীরের সবলতা দুর্ব্বলতানুযায়ী তাহার প্রতি তোমার প্রণয় কেমনি গাঢ় অথবা শুষ্ক হইবে, কিন্তু আত্মানুরাগী ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হও তোমাকে কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে না, কাহারও মন যোগাইতে হইবে না, তুমি নিজের ভাবে নিজে মত্ত থাকিবে। এই জন্যই ভক্তি, প্রীতি, আত্মানুরাগ আদির প্রকাশ হইলে বিষয় বৃত্তি দূরে যায়। উহাদের পরাজয় স্বীকার করিতেই হয়। কাযে কাযেই সামঞ্জস্য থাকে না। আমরা সুখের যে বিবৃতি দিলাম তাহাতে সামঞ্জস্যকে সুখ বলিলে ডিম্বুব লাড্ডুকেও সুখ বলা চলে। বাস্তবিক সামঞ্জস্য ফাঁকা কথা—কথার কথা মাত্র। তবে ভোক্তা ও শর্করা এক হইলে, সুখী ও সুখ মিশিলে, আনন্দপ্রার্থী আনন্দময় হইলে, সোহং আত্মস্থ হইলে কি হয় বলিতে পারি না:

কামরূপ কামাখ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মায়ের মনোহর মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়া গেলে কুচবিহারের রাজৈশ্বর্য্য হইতে মায়ের বিবিধোপচারে পূজা চলিতে লাগিল ও চির দিন পূজা চালিবার জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইল। ক্রমশঃ মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ সাধক সন্ন্যাসীগণ পীঠ স্থান দর্শনে আসিতে লাগিলেন। কোন কোন সাধক গভীর নিশীথে মার পীঠ পার্শ্বে মন্ত্র সাধন ও পূজাদি করিতে বসিয়া বিপদ বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। এখনও যে সকল মালাকর বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনের পূর্ব্ব পুরুষ সিদ্ধ সাধক গণের উত্তর সাধকতা করিত। একবার একজন সাধক নাকি সমস্ত আয়োজন করিয়া মার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কি জানি কোন অপরাধে তাহার সাধের সাধনা ক্ষেত্রে অশেষ বিঘ্নরাশি দেখা দিল। ঘনঘোর মেঘমালার ন্যায় কি যেন দৈবী মায়া জাল আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া লইল, বিদ্যুদ্বিকাশবৎ অট্টহাস্যে স্থান পরিপূর্ণ হইল। বিকট হুঙ্কারে

গগনমণ্ডল ভয়ানক হইয়া উঠিল, বিবসনা বিকট দশনা কত যে ললনা রূপের লীলা দৃষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। পূজায় যে ছাগ বলিদান করা হইয়াছিল, তাহার মস্তকটা লইয়া অনলজ্বালবর্ণা করমালা যেন লুফিয়া লুফিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সাধক ভীত ও চকিত হইলেন ও উত্তর সাধককে ছাগমুণ্ড যথা স্থানে স্থাপন করিতে বলিলেন। উত্তর সাধক বলিল, এই ডাকিনী যোগিনী গণের লীলাক্ষেত্রে আমি অগ্রসর হইতে পারিব না। মহামায়ার মায়াতে বিমোহিত সাধক নিজাসন ত্যাগ করিয়া যেমন স্বয়ং তাহা দিতে যাইবেন অমনি যেন কে তাঁহাকে ঊর্দ্ধ পথে উঠাইয়া ব্রহ্মপুত্রাভিমুখে কোথায় লইয়া গেল, তাহার সমাচার আর পাওয়া গেল না। যাঁহারা মায়ের ঐরূপ সাধনা করিয়া থাকেন বা বিদিত আছেন, তাঁহারা ভিন্ন এই ঘটনাটির সত্যতায় বিশ্বাস করিতে হয়তো অনেকের ভরসা হইবে না।

লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে অম্বুবাচীর সময় যখন পৃথিবী রজস্বলা হয়েন, তখন মুদ্রাপীঠ হইতে নাকি রুধির ধারার ন্যায় দ্রবময় প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। আমি কামাখ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, তাঁহারা বলেন, যে আমরা পিতৃ পিতামহ মুখে এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি যে উক্ত রাজা নরনারায়ণ ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য একবার অম্বুবাচীতে পীঠস্থানে শুভ্রবস্ত্র পাতিয়া দিয়াছিলেন। উহা রক্তবর্ণ হয় কি না ইহাই দেখিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। রাজা যেদিন বস্ত্ররক্ষা করেন সেইদিন রাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, মা বলিতেছেন বৎস! কলিতে আমার প্রকাশ লীলা কিছুই প্রকাশ করিব না। তুমি মাতৃপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কর নাই, এরূপ আর করিও না। তুমি ভক্ত, তোমার রক্ষিত বসন প্রান্তে রুধির রেখাবৎ কিঞ্চিৎ তোমার দৃষ্ট হইবে মাত্র। রাজা তাহাই দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন আর পরীক্ষা করেন না। সেই সময় হইতে অম্বুবাচীর তিন দিন নিত্য পূজার অধিকারী ভিন্ন, তিনি ভিন্ন পূজা করিতে আর কেহ যাইতে পারে না। কতক দিন দ্বার বন্ধ থাকিয়া বাকি অবরুদ্ধ থাকে। পাণ্ডাগণ অম্বুবাচীর সময় রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র রাখিয়া সেই স্থান রক্ষা করিয়া থাকেন। যাত্রীগণ "অম্বুবস্ত্র" প্রার্থনা করিলে তাহা হইতেই একটু একটু ছিঁড়িয়া দিয়া থাকেন। লোকের বিশ্বাস এই যে জয়া বিজয়া পারিবারিক অপরাধীর এই রক্তবস্ত্র মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিয়া যে কার্য্যে যাত্রা করিবে, সেই কার্য্যেই জয়, সেই কার্য্যই সিদ্ধ হইবে।

আর একটি আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণকেন্দ (মার মন্দিরে ইহাঁর পাষাণ-মূর্ত্তি আছে) পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মার নাট মন্দিরে প্রতি নিশিতে বসিয়া বাদ্য বাজাইতেন ও সুমধুর স্বরে মায়ের গুণগান করিতেন, মাও নাকি ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতা, তাই ভক্তিরসে মাতোয়ারা—মা বলিতে জ্ঞান হারা ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য নানারত্নালঙ্কারে ও বিচিত্র বসনে বিভূষিতা মা আমার হাস্যমুখী কুমারী বেশে মূর্ত্তিমতী হইয়া বাদ্যের তালে তালে প্রতি নিশিতে নৃত্য করিতেন। মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ থাকিলেও যাঁহার মায়ার ছলনানুসারে তালে তালে চন্দ্র সূর্য্য, তারাদি ক্রীড়া করিতেছে, সাগর উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে খেলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, জীবগণ জন্ম জীবন ও মরণ গান গাহিতেছে, আজ আমার সেই নৃত্যকালী মা ভক্তের তালে তালে আপনিই নাচিতেছেন। আজ ব্রাহ্মণ! তোমারই বাদ্য ধন্য যে বাদ্যের ধ্বনির সঙ্গে মায়ের ঝঙ্কারক রত্ন খচিত পদারবিন্দের নূপুরধ্বনি মিশিয়া মিশিয়াছিল।

"একবার নাচগো শ্যামা
একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচগো শ্যামা।
বিশ্বরূপ ত্যজে কুমারী সেজে একবার নাচগো শ্যামা
ওমা এলোকেশে আলুথালু বেশে একবার নাচগো শ্যামা।"

মা নাচিতেন, বাহিরের লোকে যাহারা সজাগ থাকিয়া শুনিত, তাহারা ব্রাহ্মণের বাদ্যছাড়া এই বিচিত্র নূপুর ধ্বনি শুনিতে পাইত। উক্ত রাজা ব্রাহ্মণকে মা'র আবির্ভাব ও নাচন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এ কথা কাহাকেও বলিবে না ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপ মায়ের আদেশ ছিল রাজার অনুরোধে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইল বলিল উহা আপনি যে কৌশলে পরীক্ষা করিতে পারেন। রাজা মন্দিরদ্বারে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাত্রিতে দেখিতে লাগিলেন। দর্শনে কৃতার্থ হইলেন বটে কিন্তু মা যখন কোপকষায়িত নেত্রে চক্ষুর পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন! আজ হইতে তোমার বংশের কোন ব্যক্তি আর আমার এখানে আসিতে পারিবে না, আসিলে বংশ লোপ হইবে। ব্রাহ্মণ আজ হইতে তুমিও আমার প্রকাশ ও নৃত্য দেখিতে পাইবে না।" তখন উভয়েই স্তম্ভিত ভীত ও মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনঃ সচেতন হইয়া নিজ নিজ অপরাধ জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে উভয়েই চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কুচবিহারের রাজবংশের কেহ ঐ মাতৃভবানী পীঠদর্শন কখন গমন করেন না।

মায়ের মন্দিরের ব্যবস্থাপক দুই, জন অবৈতনিক লোক আছেন। মায়ের পূজার পূর্ব্বে যাত্রীগণ যে ভেট দিয়া থাকেন, উক্ত কর্ম্মচারী দ্বয় তাহারই বার্ষিক অংশ পাইয়া থাকেন। কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে যাত্রীগণ যে বস্ত্রালঙ্কার বা অর্থাদি দান করেন তাহা সর্ব্বকাল সঞ্চিত থাকে, বৎসরান্তে সেই সমস্ত, তথায় যতগুলি কুমারী ও ব্রাহ্মণ আছেন সকল গুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই সদ্ব্যবস্থা থাকায় কেহ পাইল কেহ পাইল না এরূপ হইতে পায় না। অন্যান্য স্থানের তীর্থ-ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা এখানকার পাণ্ডাগণ কিছু ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হইল

কামাখ্যা শৈল শিখরের কোন কোন স্থানে কালী, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী কমলা, আদিরও মন্দির আছে। ইহার মধ্যে কোন ২ মন্দির বনাকীর্ণ ও দুষ্প্রবেশ

বৃথা গণ্ডগোল।

আজ কাল ভারতের নানা সম্প্রদায়ের নানা রুচি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকেই মুদ্রিত পুরাণাদির ২।৪ পাতা পাঠ করিয়া স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশে বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে ত্রুটি করিতেছেন না। আবার এদিকে দেশের কত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি জন্য কিনা বলিতেছেন? কি না করিতেছেন? পরের নিন্দাবাদই একমাত্র অবলম্বন। নিজের কৃতকার্য্যের ফল কতদূর দাঁড়ায় তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্যের কৃত কার্য্যের ফলাফলের বিষয়ে দোষারোপ করিয়া থাকেন। বলে, ছলে, কৌশলে ইহাঁদের সম্প্রদায় মধ্যে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া জন সমাজে বাণিজ্য ব্যাপার বিস্তার করতঃ সুবিধা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমত স্থলে সময় সময় একতা ভিন্ন কিছুতেই দেশের উন্নতি সাধন হইবার নয় এই বলিয়া যে চীৎকার করিয়া থাকেন তাহা কেবল ভান মাত্র। যে হেতু তাঁহারা স্বয়ংই একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল সাধন হওয়া দূরে থাক বরং আপন আপন সম্প্রদায় মধ্যে একটা তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া কতক সময় ঐরূপেই বৃথা কাটিয়া যাইতেছে এজন্য সম্পাদক মহোদয় গণের ও সুহৃদ ভ্রাতৃগণের সমীপে আমার বিনীত ভাবে প্রার্থনা যে অন্যের কৃতকার্য্যে কূট না ধরিয়া ও দোষারোপ না করিয়া বিচারের ভার পাঠকগণের উপরই ন্যস্ত করতঃ নিরপেক্ষ ভাবে নিজ নিজ মনোগত ভাব সকল প্রকাশ করিতে থাকুন। পাঠকবর্গ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লেখক বৃন্দের সমীচীনতা ও দূরদর্শিতায় পরিচয় পাইবেন। পরন্তু অনর্থক তর্ক বা বাগ্‌ বিতণ্ডার আবশ্যক কি! বিবেচনা করিয়া দেখুন এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনা ও ঈশ্বর বিষয়ের মীমাংসা চারিযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত একমত সিদ্ধান্ত হইয়াছে কি! হইবে বলিয়াও সম্ভবে না। তবে যিনি যাঁহার উপাসনা করিতেছেন তিনি তাঁহাকেই মন প্রাণ অর্পণ করতঃ অন্তিম পরিত্যাগে একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞানে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবেন, কারণ "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"। আজ কাল যে সে সংবাদ-পত্রিকাতেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য যে ধর্ম্মের গুণ ও প্রশংসার বিস্তার ব্যাখ্যা, কল্য আবার তাহারই নিন্দাবাদে পত্র-স্তম্ভ পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় ভ্রম স্বীকারে জন সমাজে ক্ষমাভিক্ষার প্রার্থনা পত্রও মুদ্রিত হয়। এ সকল কি ব্যাপার! এই সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম সহজ জিনিস নহে, রামা শ্যামার গল্প নহে যে ২টা কথা এদিক ওদিক হইলেই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এতো সামান্য বিষয় নহে—ধর্ম্ম। ইহা লইয়া আলোচনা করা বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ লোকের কার্য্য। ভাই! তোমার আমার মত লোকের কার্য্য নয়, হিন্দু ধর্ম্মের উপাসনা প্রণালীও এক প্রকার নয়। এই উপাসনা পঞ্চ প্রকার। যথা, শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর। এই পঞ্চ প্রকার ছাড়াও অনেকে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও করিয়া থাকেন। মূলকথা ইহার মধ্যে যাহা যাহার মনে লাগিয়াছে ও গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই প্রণালীতে নিজ উপাস্য-দেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। এমত স্থলে তুমি যদি কোনটীকে প্রবল করিয়া অন্যটীকে কিছুই নয় এই রূপ উক্তি করিয়া দোষারোপ করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলেই তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। আমরা যদি ভগবান্ বেদব্যাস কি জীবন্মুক্ত শুকদেব যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত তুলনায় কিঞ্চিৎ মাত্র যোগ্য হইতে পারিতাম তাহা হইলেও ২।১টী বিষয় লইয়া কিছু কাল তর্ক বিতর্ক করিলে চলিত। যাঁহারা আজীবন কোন্ মতটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কোন্ দেবই বা সর্ব্বগুণে গুণী, এতাবৎ বিচারার্থ ঈশ্বরাংশে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার-লীলায় পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রকাশে ঈশ্বর-পদ-বাচ্য হইয়া ভারতকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও তো একটা শেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা সকলকে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। যদি পারিতেন তাহা হইলে [illegible] নানা মত কখনই হইত না। যদি বল বুঝিতে না পারায় এরূপ ঘটিয়াছিল; আচ্ছা ভাই! তাহা হইলে পরিণামে যেটা প্রবল বলিয়া হইয়াছিল, সেই পথটীরই অনুসরণ করত সকলেই এক বাক্যে সহিত সেই একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মেরই উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এবং তৎ বিবরণ ভক্ত সাধারণের [illegible] স্বীয় স্বীয় মতের সহিত স্বীকার-বাক্যে আপন আপন পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহের সংশোধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না এবং সর্ব্ববাদী সর্ব্ব সম্মতি যুক্ত এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তাহা না করিয়া যিনি যাঁহার উপাস্যদেব, তিনি তাঁহারই বিষয় আলোচনা করতঃ তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবনায় সর্ব্ব গুণাকর ও সর্ব্ব জীবের পরিত্রাতা স্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এবং যে কোন শাস্ত্রাদিতে স্বীয় মতের অনুকূলে যে সমুদয় শ্লোক ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাহাই তৎক্ষণাৎ উদ্ধৃত করতঃ নিজ নিজ গ্রন্থের পোষকতায় যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সে স্থলে আমাদের ন্যায় অল্প বুদ্ধি মানবের দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক মীমাংসা বা ঈশ্বর যে কি প্রকার তাহা স্থির করা সহজ নয়। অন্য পরে কা কথা কোন সময় স্বয়ং বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা তিনই একত্রে সমবেত হইয়া একাসনে উপবেশন করতঃ সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে দেবাদিদেব মহাদেব কর্ত্তৃক উপাসনা বিষয়ের মীমাংসা হইয়া তৎপ্রণালী সকল একরূপে প্রচারিত হইয়াছে। আবার সময়ান্তে বিষ্ণু স্বয়ং মীমাংসা করতঃ অন্যরূপ উপাসনার ভাবের সহিত প্রেম ভক্তি রূপ উপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। আবার কলিতে চৈতন্য দেব সকল প্রকার উপাসনাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি যোগে নাম-মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া

গিয়াছেন। কলিতে ইহাভিন্ন অন্য উপাসনাদি কি যোগ ক্রিয়াদি কিছুই হইতে পারে না ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অতএব পড়িয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া ঈশ্বর সিদ্ধান্ত হওয়া সুকঠিন, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিজ গুরু দত্ত বস্তুর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে শুভ ফল হইবে, বৃথা গণ্ডগোল ছাড়িয়া দাও।

আবাহন।

দুঃখীর দেশে রাজরাজেশ্বরী মা আসিতেছেন, দীন হীন কাঙ্গালের দেশে দয়াময়ী মা দয়া করিয়া শুভাগমন করিতেছেন, তাই দিকে ২ উৎসবের বাজনা বাজিতেছে। ভিখারির জীর্ণ শীর্ণ কুটিরে দিব্যধাম বাসিনী জগজ্জননী আসিয়া বিরাজ করিবেন, তাই ক্ষীণ প্রাণে আনন্দের লহরী উথলিয়া উঠিতেছে। ঘোরান্ধকার-সমাচ্ছন্ন গভীর গিরিগুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন যোগীও যাঁহার বিদ্যুদ্বিকাশ ক্ষণেকের জন্যও অনুভব করিতে পান না, সেই চিদ্ঘনকাদম্বিনী মহামায়া নিজ ভুবন-[illegible] ধারায় দিগ্ দিগন্ত আলোকিত করিয়া পতিত জনের উদ্ধারার্থ স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইবেন তাই আশার আশ্বাসে আশাহীন ভরসাহীন জীব আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিয়া মনোলয় করিতে না পারিলে যাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয় না, সেই চিদানন্দ-রূপিণী দেবতা আজ অধম-নিস্তারিণী মা হইয়া দর্শন দিবেন, তাই ভুবন ভরিয়া আনন্দের কল্লোল উঠিতেছে। শ্রুতি যাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মন ও বাক্য, যাঁহার গোচরী ভূত হয় না, সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমাত্মরূপিণী মা আজ গতিহীন অনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা-কল্পলতিকা হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাই আজ দীন দুঃখীর ঘরে ২ আনন্দের পশারা বসিয়া গিয়াছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইয়া জগজ্জননী আজ করুণার সদাব্রত-শালায় দশহস্তে দুঃখী কাঙ্গালের বাঞ্ছিত সাধের সামগ্রী বিলাইবেন, তাই কামনার দাস আমরা আনন্দে আটখানা হইতেছি।

এস মা! এ রোগ-শোক-জরা জীর্ণ দেশে আরোগ্যবিধায়িনী হইয়া মা! তুমি এস! এ উজাড় শ্মশান-প্রান্তরে সঞ্জীবনী চিন্ময়ী শক্তি হইয়া মা তুমি এস! এ দাবদহন দগ্ধ মরুভূমে অমৃতের প্রবাহিনী হইয়া মা তুমি এস! বড় আশায় বড় ভরসায় মা! তোমার আবাহন করিতেছি। হৃদয়ের গুপ্তনিকেতনে গুছাইয়া ২ কত কথা লুকাইয়া রাখিয়াছি, মা! তোমায় বলিব। দুঃখের কথা, জ্বালাযন্ত্রণার কথা, মর্ম্মবেদনার কথা তোমাকে আমরা শুনাইব! সংবৎসরে মনঃপ্রাণের অন্তস্তলে যে চিন্তাভস্ম জমিয়াছে, তাহাই তোমাকে উপহার দিব। কত শত অব্যক্ত যাতনায় আমাদের অস্থি-পঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, মা! তোমায় তাহাই নিবেদন করিব। দেবি! এজগতে দুঃখীদের "আপনার" বলিবার কেহ নাই। দূর হইতে দুঃখী ভিখারী দেখিলেই সকলেই দ্বারদেশ বন্ধ করিয়া দেয়। জগতের এক কোণে ঘৃণিত—পদদলিত—শক্তিহীন মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছি। তাই শক্তি স্বরূপিণী মা! তোমার আশ্রয়াঞ্চলে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিতে চাই। মা! এবার তোমার পূজায় আমাদের দুঃখই কেবল উপকরণ হইবে। নয়নজল তোমার পাদ্য হইবে, রুধির ধারা তোমার চন্দন কুঙ্কুম হইবে, হৃৎপিণ্ড তোমার কুসুম হইবে, বিলাপ-গাথা তোমার মন্ত্র হইবে। অস্থি মজ্জা মেদ মাংস সম্ভারে নৈবেদ্য সাজাইয়া মা! তোমায় নিবেদন করিয়া দিব, বক্ষস্থল উৎপাটিত করিয়া মা! তোমার হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দিব। জ্বলন্ত যাতনার চিতানল দিয়া মা! তোমায় নীরাজনা করিব মা! আমরা জন্মদুঃখী, দুঃখ ছাড়া আর আমাদের ভাণ্ডারে কোন সম্বল নাই। তাই দুঃখময় সামগ্রী সম্ভারেই মা! তোমার অর্চ্চনা করিব। তোমাকে তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

দুরবস্থার আর বাকি কি? বল নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, মনুষ্যত্বের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর এক মুষ্টি অন্ন পাইলে যেমন চরিতার্থ হইয়া যায়, সেই রূপ কোন রূপে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিলেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। আর কিছু কামনার বস্তু জগতে খুঁজিয়া পাই না। এমনই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দারুণ জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ভুলিয়া দিন ২ মার্গভ্রষ্ট হইতেছি। পরপদ-তাড়নে তাড়িত হইয়া শরীর মন আত্মার স্বাধীনতা হারাইয়া ধূলিকণার সহিত মিশিয়া যাইতেছি। আশা নাই, ভরসা নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, তেজ নাই, স্রোতের সেহলার মত উদ্দেশ্যহীন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ভাসিতেছি। মাথার উপর দিয়া শত বজ্রাঘাত বর্ষিয়া যাইতেছে, বক্ষোদেশে মহাশূল ভীমবেগে প্রোথিত হইতেছে, জীর্ণ শীর্ণ অস্থিকঙ্কালময় দেহে প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করিতেছে। আর বাঁচিবার আশা নাই মা! অন্তিম কালে নগেন্দ্র-নন্দিনি! একবার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াও! জনমের মত ও জগদ্-ভুলান মাধুরীমাখা মুখ খানি একবার দেখিয়া লই। সাধ মিটাইয়া ও ভুবনমোহন প্রতিমা দেখিয়া জুড়াইয়া যাই। মা! মরিব, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার উপাসক হইয়া, ফেলিয়া শ্রদ্ধায় বা তোমার পূজক হইয়াও আজ পৌত্তলিক হিন্দু মরিল, ইহাতে তোমার যে কলঙ্ক যে চারিদিকে রটিবে, তাহাই ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়। মা! আর আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি! মরণই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। জীবন যে জঞ্জালময় হইয়া উঠিয়াছে। এ কালা মুখ জগতের কাছে আর দেখাইতে পারি না। লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। মা! এ অবসাদময় জীবনভার ফুরাইয়া দাও! এ জ্বালা-যন্ত্রণাপূর্ণ অনুভূতির অবসান করিয়া দাও! এ শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনা হইতে অব্যাহতি দাও! ইহাই প্রার্থনা।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে আমরা এক খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মন্দিরের যে সমস্ত স্থান সংস্কার-যোগ্য তাহা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিন লক্ষ টাকা সংস্কার কার্য্যে লাগিবে এই রূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের মন্দির হিন্দুর শিল্পনৈপুণ্যের অতুলনীয় কীর্ত্তি। এ কীর্ত্তি স্থায়ী করিতে হিন্দুমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। জাতীয় গৌরব-সামগ্রীর স্মৃতি ঘোর দুরবস্থার দিনেও মনে শান্তি আনিয়া দেয়। সুতরাং স্বদেশ-হিতার্থী মাত্রেরই এ সম্বন্ধে সাহায্য করা উচিত। আর যাঁহারা পুণ্যার্থী, তাঁহারা সৎকার্য্যে দান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার এমন শুভ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিবেন না। বড়ই আহ্লাদের কথা, কি বাঙ্গালি, কি পঞ্জাবী, কি বোম্বাইবাসী সকলেই যথাশক্তি এ বিষয়ে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। ধর্ম্মই হিন্দুর সম্মিলন-ক্ষেত্র।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ও বোম্বে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে চরক ও সুশ্রুতের নানা ভাষায় প্রচার সম্বন্ধে এক হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দান করিয়াছেন। পঞ্জাব ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিদেশীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত রাজা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে অনুকূলতা করিতেছেন ইহাতে মনে অপার আনন্দের উদয় হয়। "রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ।"

আমরা সাহিত্য নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইহার সম্পাদক। উপযুক্ত লোকের হস্তেই সম্পাদন ভার অর্পিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান ২ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে লিখিয়া থাকেন। নানাবিধ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কালে ইহা একখানি প্রথম শ্রেণির মাসিক পত্র পরিণত হইবে এ রূপ আশা করা যায়।

ধর্ম্মোৎসব।

১। সাহেব গঞ্জ—৬ই ভাদ্র চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় দিনাজপুর জেলায় যাইবার পথে এখানকার সজ্জন মণ্ডলীর অনুরোধে "মানব জীবনের সার্থকতা" বিষয়িণী একটি অতি সুললিত বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয় জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশে পরম সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, লোকে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অনেক সংশয়-ভঞ্জিনী তত্ত্বকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

২। বাহিন—এখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অতি সাধু স্বভাব ও উদার হৃদয়। তাঁহার বারম্বার অনুরোধে স্বামীজী মহোদয় সাহেবগঞ্জ হইতে তথায় গিয়া তিনরাত্রি বাস ও দুই দিন নানা উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। রাইগঞ্জ, হরিপুর, দিনাজপুর আদি হইতে অনেক ধর্ম্ম শুশ্রূষু ব্যক্তি উপদেশ শুনিতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। দুই দিন বাহিনে প্রেমের হিল্লোল বহিয়াছিল, বলিতে কি লোক সকল এ দুই দিন যে সুখের ছবি দেখিয়াছিল, তাহা আর কখনও ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ঈশ্বর বাবু স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০৲ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন।

৩। ফুলবাড়ী—বাহিন হইতে স্বামীজী ফুলবাড়ী হরিসভার বার্ষিক উৎসবে গমন করেন। তথায় ৫ দিন ক্রমাগত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য পূর্ণ বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়; এক দিন নদী-পারবর্ত্তী নবাবপুর গ্রামেও বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ শুনিবার জন্য দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, রংপুর, সিরাজপুর আদি দূর দূর স্থান হইতে অনেক ভদ্র লোক আসিয়াছিলেন।

৪। রঙ্গপুর—ফুলবাড়ি হইতে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী রংপুর ধর্ম্ম সভায় গমন করেন। সভা অতি সমারোহ সহ তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে "হিন্দুয়ানী" ও ২য় দিন "সাকার উপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথম দিনে আশাতিরিক্ত অতিজনতা জন্য সভা গৃহে শ্রোতৃ বর্গের ও বক্তার শ্বাসাবরোধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিন সভার পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে বক্তৃতা হয়, লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ধীর গম্ভীর ভাবে নীরবে এত বাঙ্গালী একত্রে দেখিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইল। এখানকার সুনীতি সঞ্চারিণী সভার যত্নে নগর-সংকীর্ত্তনও হইয়াছিল। একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দ্দীক্ষিত হইবার জন্য স্বামীজীর নিকট সুৎপরামর্শ লইলেন দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অসার সর্ব্বস্ব ঢক্কা-নিনাদে বিরক্ত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের চরণ-চুম্বনে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বামীজীর ধর্ম্মপ্রচার অতিশয় শুভফল-প্রসূ হইতেছে। বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ রংপুর ধর্ম্মসভা ১০৲ টাকা ও বর্দ্ধন কোটের জমীদার শ্রীমান্ কুমার চন্দ্রকিশোর [illegible]৲ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন।

৫। দিনাজপুর—স্বামীজী রংপুর হইতে দিনাজপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় ৩ দিন হরিসভায় ও এক দিন শ্রীযুক্ত রায় রাধা-গোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের বাটীতে বক্তৃতা করেন। আর একদিন বিদ্যালয়ের বালকবর্গের বিশেষানুরোধে "ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রোতামাত্রেই বড় সুখী হইয়াছিলেন। একদিন নগর সঙ্কীর্ত্তনও হইয়াছিল। এ দিন শত২ ব্যক্তির কণ্ঠ নিনাদে ও প্রেম ক্রন্দন ও নর্ত্তনে দেশ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। হরি-সভা বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এক কালীন ৪০৲ টাকা ও রায় সাহেব বাহাদুর ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। মল্লারপুর—স্বামীজী দিনাজপুর হইতে পূর্ণিয়া রাইগঞ্জ আদিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইলেও যাইতে পারেন নাই। তিনি তথা হইতে সাহেবগঞ্জ হইয়া মল্লারপুরে মল্লনাথ মহাদেব দর্শনে গমন করেন। তথায় তাঁহার অনুগত ভক্ত সাধক গণের একত্র সমাগমে "আনন্দ-মণ্ডলীর" মহাধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কলিকাতা, বীরভুম, কুণ্ডলা, মামুদবাজার সাহেবগঞ্জ, রামপুরহাট, মল্লারপুর আদি হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভক্ত গণ উপস্থিত ছিলেন। দেবালয়ে পূজা, ভগবতীর ভোগরাগ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও নিগূঢ় সাধন-তত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥ "

১৪শ ভাগ	" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ ।	শকাব্দা ১৮১৩
৭ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "	কার্ত্তিক মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পলাণ্ডুং বিড়্ বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্ ।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥

পলাণ্ডু (প্যাঁজ) গ্রাম্যশূকর, ছত্রাক, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন (রসুন) গৃঞ্জন (গাঁজর) এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধা গোধাকচ্ছপ শল্লকাঃ ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ।
তথা পাঠীনরাজীব সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।
অতঃ শৃণুধ্বং মাংসস্য বিধিং ভক্ষণ বর্জনে ॥

পঞ্চনখবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে সেধা (ভল্লুক) গোধা (গোসাপ) কচ্ছপ, শল্লক (সজারু) শশক এই পঞ্চ জন্তু ভক্ষণীয়। মৎস্যের মধ্যে সিংহতুণ্ডক (মৎস্য বিশেষ) রোহিত (রুই মাছ) পাঠীন (বান মাছ) রাজীব (বোল মাছ) এবং সশল্ক অর্থাৎ আঁশবিশিষ্ট মৎস্য দ্বিজাতি ভোজন করিতে পারেন। অতঃপর কি রূপ মাংস ভক্ষনীয় এবং বর্জনীয়, তাহা বলিতেছি।

প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া ।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥

জীবন হানির সম্ভাবনা হইলে মাংস ভোজন করিলে দোষ নাই। শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ উৎসর্গীকৃত দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদিত ও যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করিলে কোন দোষভাগী হইবে না।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥

যে দুরাচার অবিধি পূর্ব্বক পশু হনন করে, পশুর গাত্রে যত গুলি লোম থাকিবে, ততদিন তাহাকে ঘোর নরকে বাস করিতে হইবে।

সর্ব্বান্ কামান সমাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা ।
গৃহেপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্ম্মাংস বিবর্জ্জনাৎ ।

যে ব্রাহ্মণ মাংস-পরিত্যাগী, তাঁহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি গৃহবাসী হইলেও মুনিতুল্য।

ইতি ভক্ষ্যা ভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত।

সৌবর্ণ রাজতাব্জানামূর্দ্ধ্বপাত্র গ্রহাশ্মনাম্ ।
শাকরজ্জু মূল ফল বাসো বিদল চর্ম্মণাম্ ॥
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধি রিষ্যতে ।
চরুস্রুক্ স্রুব সস্নেহ পাত্রাণ্যুষ্ণেন বারিণা ॥

সুবর্ণ এবং রজত নির্ম্মিত পাত্র শঙ্খ ও মুক্তা আদি জলজ পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, গৃহস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র, শাক, রজ্জু, ফল, মূল, বস্ত্র, বিদল (খনিত্র)

চর্ম্মনির্ম্মিত পদার্থ এই সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, (তিনটি যজ্ঞপাত্র বিশেষ) সস্নেহ, অর্থাৎ তৈলবৎ পদার্থ যুক্ত চিক্কণ পাত্র উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

শ্যামা-রহস্য।

(রূপ-রহস্য)

যত্তে রূপরহস্যতত্ত্বমনিশং ধ্যাত্বাপি নো যোগিনো,
জ্ঞাতা যৎশ্রুতিরপ্যচিন্ত্যমিতি সংপ্রোবাচ তন্ত্রং তথা।
উচে ভীতমিবাস্ফুটং জড়ধিয়স্তদ্বক্তুমুদ্যন্মতেঃ,
মন্তব্যং জননীতি মে শিশুমতে র্বাচালতা দূষণং॥

জগজ্জননি! যোগিগণ নিরন্তর ধ্যান ধারণা করিয়াও তোমার রূপের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, তোমার রূপের যে গূঢ়তত্ত্বকে শ্রুতি অচিন্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তোমার রূপের যে গূঢ়তত্ত্বকে তন্ত্র ভীত ভীত ভাবে অস্ফুট রূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, জড় বুদ্ধি আমি আজ তোমার সেই রূপের গূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা আমার নিতান্ত বাল চপলতা। আমি বয়সে বালক না হইলেও জ্ঞানে চির দিনই শিশু। শিশু সন্তান মায়ের নিকটে কত চপলতা প্রকাশ করে, কত কি অসংলগ্ন কথা বলে, মাতা তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব এই শিশুমতির বাচালতা দোষ নিজ গুণে ক্ষমা করিবে।

শ্রুতি বলেন—"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" প্রণব (ওঁকার) ধনুঃ, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। অপ্রমত্ত চিত্তে সেই লক্ষ্য বেধ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যোদ্ধৃগণ যেরূপ ধনুকে শর সংযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য বেধ করে, সেই রূপ প্রণব রূপ ধনুকে আত্মরূপ শর সংযোগ করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিবে। সবলে নিঃক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যের অভ্যন্তরে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যায়, আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, আত্মাও সেই রূপ ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে, আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না, দ্বৈত ভাব থাকিবে না, উপাস্য উপাসক ভাব থাকিবে না। তখন তিনি সংসারের মায়া মমতা কাটাইয়া দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইবেন "চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং"। ইহারই নাম নির্ব্বাণ-মুক্তি। জগতের যত সাধক, যত ভক্ত, যত উপাসক সকলেই এই মুক্তির নিমিত্ত লালায়িত। সকলেরই চরম উদ্দেশ্য এই নির্ব্বাণ মুক্তি। শর যেরূপ মলিন থাকিলে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে না, সেই রূপ মলিনাত্মা (পাপাত্মা) ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে ডুবিয়া অভিন্ন হইতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি স্থানান্তরে বলিয়াছেন—"মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসা শাণিতং" সেই আত্মরূপ শরকে উপাসনা দ্বারা শাণিত (নির্ম্মল) করিয়া লইবে। উপাসনা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধাত্মাকে ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। তবেই আমরা ভব যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু লক্ষ্য আমাদের পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতম। চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত নহেন। মন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধারণা করিয়া লইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় শিক্ষানবিশীর সময় এত সূক্ষ্ম লক্ষ্য কেহই বেধ করিতে পারে না। তাই হিন্দু শাস্ত্রে স্থূলোপাসনার বিধান রহিয়াছে।

বহির্দৃষ্টিতেও আমরা দেখিতে পাই, যাহারা শর শিক্ষা করে, তাহারা কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি কোনও একটী স্থূল লক্ষ্যকে ঠিক করিয়া লয়, প্রথম ২ তাহাও বেধ করিতে পারে না, বাণ (তীর) বাম দক্ষিণ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, কিছুতেই লক্ষ্যে পতিত হয় না। কিছু দিনে এই রূপ স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিতে অভ্যাস হইলে ক্রমে ক্রমে হাত পাকাইয়া বহু দিনে, বহু পরিশ্রমে সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধ করিতে অভ্যাস হইয়া থাকে। অন্তর্জ্জগতে লক্ষ্য বেধ

করিতে হইলেও ঠিক্ এই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে প্রথমাধিকারীর স্থূল ভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জীবের রুচি ভেদে অথবা প্রকৃতি ভেদে এক ব্রহ্মই কালী তারা দুর্গা শিব বিষ্ণু গণপত্যাদি রূপে স্থূল ভাবে উপাস্য রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে শক্তি বিষয়ই আজ আমাদের সমালোচ্য। অতএব শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাশক্তি শাস্ত্রাভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। *

কেহ ২ গণ্ড মূর্খ ভণ্ড বৈরাগী দিগের চণ্ড শাসন বশতঃ, কেহ বা স্বধর্ম্মের মর্ম্ম না জানা বশতঃ, কেহ কেহ বা বৈদেশিক বিরুদ্ধ শিক্ষায় বিরুদ্ধ সংস্কার বশতঃ শক্তি সাধন সম্বন্ধে আজ কাল কেমন ২ একটা ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শ্যামারূপ ভয়ঙ্কর, শ্যামা-সাধন ভয়ঙ্কর, ইহাতে যেন একটা তামসিক ভাব আছে বলিয়া অনেকের অন্ধ বিশ্বাস দেখিতেছি। শ্যামা মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্করী, এ মূর্ত্তি হৃদাসনে বসাইলে শান্তি সুখ লাভ করা যাইতে পারে না। যাঁহাকে দেখিয়া মন ভুলিয়া যাইবে, তাঁহার জগৎ ভুলান রূপ হওয়া চাই, প্রশান্ত মূর্ত্তি হওয়া চাই এরূপ কথা বার্ত্তা আমরা মধ্যে ২ বুদ্ধিমান্ লোকের মুখেও শুনিতে পাই। বস্তুতঃ শ্যামা রূপে বাহ্যিক চাকচিক্যের লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না বটে। ইহাতে ফুলের মালা, মুক্তার মালা, মকরকুণ্ডল, হীরার মুকুট, সোণার নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারের বিন্দু বিসর্গও দেখিতে পাই না বটে। এমন্ কি, মা উলঙ্গিনী, অঙ্গে বসন খানা পর্য্যন্ত নাই, তাই সংসারের কীট—বিষয়ের দাস বিলাসীর চক্ষে এ রূপ অতি ভয়ঙ্কর। সংসারী জীব হয়ত এরূপ লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ভয়ঙ্কর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেনা, কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, সাধক, জ্ঞানী, তাঁহারা দেখেন শ্যামারূপে কেবল প্রকৃতি পুরুষের বিহার, প্রকৃতি পুরুষের লীলা খেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ রূপ ভক্ত কল্পতরু, ভক্ত ইঁহার নিকট যাহা চান তাহা পান, যে ভাবে দেখেন সেভাবে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যে মুর্ত্তির উপাসনা দ্বারা সাধকগণ কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, যে সিদ্ধ মূর্ত্তির উপাসনা করিতে সদাশিব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্তে ব্রহ্মভাব—ব্রহ্ম-বিভূতি দেদীপ্যমান্, সে মূর্ত্তির বাহ্যিক

---

* শক্তি, মায়া, প্রকৃতি বিদ্যা, অবিদ্যা, ইহা সমস্তই এই পর্য্যায় শব্দ। দার্শনিকগণ এই শক্তিকে জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেবল দার্শনিক গণ কেন, আর্য্য দিগের শ্রুতি স্মৃতি দর্শনাদি ভূরি ভূরি শাস্ত্রে এই শক্তি জড়া বলিয়া অভিহিতা। ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা যেন জড় পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকেন। শক্তি জড়া সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া শাক্তগণ জড় পদার্থের উপাসক নহেন। কারণ শাক্তগণ কেবল শক্তির উপাসক নহেন। তাঁহারা যে ভাবে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা কেবল শক্তি নহে। উহা চৈতন্যামিশ্রিতা শক্তি।

যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও কেবল ব্রহ্মের (নির্গুণ ব্রহ্মের) উপাসক নহেন। তাঁহারা শক্তি মিলিত ব্রহ্মের অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারাও কেবল শক্তির উপাসনা না করিয়া ব্রহ্ম যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্য যুক্ত শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। নচেৎ নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও কর্তৃত্বাদি না থাকায় তিনি জড়বৎ ও অজ্ঞেয়, সুতরাং উপাসনার অযোগ্য। আবার চৈতন্যশূন্যা শক্তিও জড়া বলিয়া উপাসনার অযোগ্যা। যে রূপ দুগ্ধে জল ও জলে দুগ্ধ মিশান একই কথা, সেই রূপ শক্তিযুক্ত চৈতন্য ও চৈতন্যযুক্ত শক্তি একই কথা। সুতরাং শক্তিসাধনে ও ব্রহ্ম সাধনে তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ। গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ।" তন্ত্র শাস্ত্র শক্তিকে চণকাকার-রূপিণী বলেন। চণক যেরূপ দুই অংশে একত্র জড়িত হইয়া রহিয়াছে শক্তিও ঠিক সেই রূপ প্রকৃতি পুরুষ অংশে জড়িত হইয়া উপাস্য ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। মহা ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"সাচ মায়া পরা শক্তিঃ শক্তি মত্যাহ মীশ্বরী।" সেই মায়া পরমা শক্তি, আমি সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী। "চিতিরূপেণ যাকৃৎস্ন মেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।", "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে", ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে সেই মহাশক্তি চৈতন্যাশ্রিতা শক্তি, কেবল শক্তি নহেন। যে রূপ অগ্নিতে আর অগ্নির দাহিকা শক্তিতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সেই রূপ শক্তি আর শক্তিমতীর অভেদ বিবক্ষা করিয়াই লোকে "শক্তির উপাসনা, শক্তির উপাসক, ইত্যাদি স্থলে কেবল শক্তির নামোল্লেখ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ শক্তি বলিলে সেই চৈতন্যাশ্রিতা মহা শক্তিকেই বুঝা যায়।

চাক্‌চিক্যের কিছু মাত্রই আবশ্যক করে না। ভাবুক ভক্ত রূপক রূপের অভ্যন্তরে যে ভাব দেখিতে পান তাহাতেই তিনি কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

মহা কালীর ধ্যানে আছে তিনি শব শিবা রূঢ়া। শব বলিলে আমরা মৃতদেহই বুঝি। শিবের মৃত্যু নাই, তিনি মৃত্যুঞ্জয়, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে শব বলিবার তাৎপর্য্য এই শিব শব্দে এখানে শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দ নির্গুণ ব্রহ্ম। জীবের মঙ্গল দায়ক বলিয়া তিনি শিব পদবাচ্য। শ্রুতি বলেন তৎশুক্রং, তিনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ম্মল, তাই পুরাণাদি শাস্ত্রে রজত গিরিনিভ বলিয়া বর্ণিত। এই শিব (নির্গুণ ব্রহ্ম) নিতান্ত অকর্ম্মণ্য পুরুষ। শ্রুতি ইঁহাকে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি চেষ্টাশূন্য, ক্রিয়াশূন্য, শক্তিশূন্য, তিনি জীবিত থাকিতেও মৃত। তাই কুব্জিকা তন্ত্রে বলা হইয়াছে "রুদ্রাণীকুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন। অতএব মহেশানি! রুদ্রঃ প্রেতোন সংশয়ঃ।" রুদ্রাণীই জগৎকে গ্রাস করেন, রুদ্র কিছুই করিতে পারেন না, অতএব রুদ্র (নির্গুণ ব্রহ্ম) প্রেত অর্থাৎ মৃত। যিনি মৃত তিনিই শব পদবাচ্য। অনাদ্যা মহাশক্তি এই শব রূপ শিবে আরূঢ়া হইয়া অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে সংযুক্তা হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, তাই মহা কালী শব শিবারূঢ়া। এই তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়াই মহাকাল-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামাশক্তি নিগদ্যতে। বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।" দক্ষিণ শব্দে পুরুষ (নির্গুণ ব্রহ্ম) আর বামা শব্দে শক্তি। সেই বামা পুরুষকে জয় করিয়া অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট পুরুষের উপরে স্বয়ং আধিপত্য দেখাইয়া কালীরূপে মহামোক্ষদায়িনী হইয়াছেন। এই দক্ষিণকে জয় করাতেই মায়ের নাম দক্ষিণা কালী হইয়াছে। অতএব শ্যামারূপে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে সাক্ষাৎ মহেশ্বরী দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। সমস্ত ভূতকে যিনি কলন (গ্রাস) করেন তিনি মহাকাল, মহেশ্বরী প্রলয়ে মহা কালকেও কলন করেন বলিয়া মহাকালী নাম ধারণ করিয়াছেন।* এই মহাকালী মহামেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা। তন্ত্র বলেন, শ্বেতপীতাদিবর্ণ যে রূপ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হইয়া যায় তদ্রূপ প্রলয় কালে মহাকালীতে সমস্ত ভূত বিলীন হইয়া থাকে। এই জন্য মায়ের কৃষ্ণ বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। মায়ের বসন নাই, তিনি বিবসনা। বস আচ্ছাদনে, এই বসন শব্দের অর্থ আচ্ছাদন, অর্থাৎ আবরণ। শক্তিময়ী আবরণ-শক্তিদ্বারা জীব জগতের চক্ষু ঢাকিয়া রাখেন, তাঁহারই আবরণে কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড আবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাকে আর কেহই আবৃত করিতে পারে না, তিনি আবরণ-রহিতা, তাই বিবসনা। নচেৎ কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, কটাক্ষে যিনি মণি মুক্তা কাঞ্চনাদি পূর্ণ কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন তাঁহার বস্ত্রালঙ্কারের অভাব কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।

দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ মুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা, মুখে অট্টহাসি, মহাশক্তি এই ভয়ঙ্কর বেশে বজ্র নিনাদ-হুঙ্কারে অসুর-প্রকৃতি পাপী তাপীর বিনাশ সাধন করিতেছেন। আবার বামকর দ্বয়ে বরাভয় লইয়া মাভৈঃ মাভৈ রবে ভবভয়ে ভীত ভাবুক ভক্তকে অভয় প্রদান করিতেছেন। গভীর সাগরের ন্যায় একাধারে ভীমকান্তগুণ ধারণ পূর্ব্বক দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনের দেদীপ্যমান ভাব দেখাইতেছেন।

আমরা এই স্থূল ভাব ছাড়িয়া আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পাই, মায়ের করে খড়্গ মুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা, কর্ণে মৃত বালক, কটী দেশে করকাঞ্চী, বিকটদশনা বিলোল রসনার করাল বদনে অট্ট অট্ট হাসি বিরাজিত। এই ভীষণ বেশে জগদম্বা কোটী ২ জগৎ শাসন করিতেছেন। শ্রুতি বলেন, তিনি "ভীষণং ভীষণানাং।" তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ খাটিতেছে।

* কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকাল ইতি স্মৃতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৪র্থ উল্লাস।

এমন্ কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত। * ইহা দেখাইবার নিমিত্তই মায়ের ভয়ঙ্কর বেশের অবতারণা।

এই ভৈরবী মূর্ত্তির কটীদেশে, করে, কর্ণে, কণ্ঠে, এমন কি যে দিকে তাকাও সেই দিকেই মৃত মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইবে। প্রতি দিন এই সংহার-মূর্ত্তির স্মরণে, মননে, দর্শনে, হৃদয়ে মৃত্যুভয়—মৃত্যু ভাব উপস্থিত হইয়া থ।কে। সংসারের অনিত্যতা, জীবনের অনিত্যতা মুহুর্মুহুঃ উপলব্ধি হইতে থাকে। এ রূপ দেখিবার মত দেখিলে, ভাবিবার মত ভাবিলে ধন মান রূপ যৌবনের অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পাষণ্ডের হৃদয়েও ঔদাস্যভাব—বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন জীব পাপ-যাতনা মৃত্যুযাতনা দূর করিবার জন্য কুমতি কুকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং সাধকের এই ভৈরবী মূর্ত্তিতে যত উপকার, ফুলের মালা মুক্তার মালায় সাজান হাঁসি মাখা বাবুয়ানী মূর্ত্তিতে তাদৃক্ উপকার হইতে পারে না। রূপ যদি সাধকের হিতের নিমিত্তই হইল, তবে যে রূপে সাধকের সত্বর কার্য্য সাধন হয় সেই রূপে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই জগদম্বার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশিত।

প্রলয়ে সমস্ত ভূতকে গ্রাস করেন, কালরূপ দন্তে চর্ব্বন করেন তাই কালী করাল বদনা। †

তন্ত্র বলেন, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি মায়ের নয়নত্রয়, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া থাকেন। +

যিনি দেখেন তাঁহারই নাম সাক্ষী। মায়ের উক্ত তিনটী চক্ষুঃ নিখিল জগৎকে দেখে বলিয়া লোকে চন্দ্র সূর্য্য বহ্নিকে লোক-সাক্ষী বলে। সূর্য্যের এক নাম সবিতা। সূর্য্য না থাকিলে জগৎ থাকে না, সূর্য্যালোকে জগতের নিখিল পদার্থের উৎপত্তি, সুতরাং সূর্য্য জগৎকে প্রসব করিতেছেন। চন্দ্র অমৃতময় রশ্মি দ্বারা জগৎকে পোষণ (পালন) করিতেছেন। বহ্নি প্রলয় কালে প্রলয়াগ্নি রূপে জগদ্বিনাশ করিতেছেন। তাই ভাবুক ভক্তগণ বলেন, মায়ের কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। জ্ঞানীগণ জগদম্বার কটাক্ষকে মানুষের চর্ম্মচক্ষুর কটাক্ষের ন্যায় না বুঝিয়া তন্ত্রোক্ত শশি সূর্য্যাগ্নি রূপ নেত্রের বিজ্ঞান-গর্ভ কটাক্ষকেই বুঝিতেন।

শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম অমৃত স্বরূপ। তন্ত্র বলেন, তাই জানাইবার জন্য ব্রহ্মময়ীর ললাটে অমৃত ময়ী শশিকলা দেদীপ্যমানা রহিয়াছে। *

শ্যামা মুক্তকেশী। অসুর বধে ঘোররণে কেশ-বন্ধনের অবকাশ ছিল না,—যাহারা স্থূলদর্শী তাহারা বলে, মায়ের আলুলায়িত কেশজাল পাদ পদ্ম পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। যে মায়ের পাদ-পদ্মের আশ্রয় লয়, তাহার কি আর বন্ধন-দশা থাকে? তাহার বন্ধন-দশা চির কালের নিমিত্ত ঘুচিয়া যায়, সে অনন্ত কাল মুক্তাবস্থায় থাকে। ইহাই ভক্তগণকে জানাইবার নিমিত্ত মুক্তকেশী মুক্ত-কেশে বিরাজমানা রহিয়াছেন।

এই রূপে কতক গুলি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব লইয়া স্থূলাধিকারীর সাধন সম্পাদনের নিমিত্ত মহাকালীর স্থূল রূপ নিরূপিত হইয়াছে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা এই স্থূল রূপের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম ২ তত্ত্ব অবলোকন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারাবৃত, অথবা কিম্ভূত কিমাকারের ঊনবিংশ শতাব্দীর রুচিবাগীশ, তাঁহারা বাহিরের আবরণ দেখিয়াই লজ্জায় ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়েন। তা পড়ুন্, যাঁহার এরূপ ভাল না লাগে তিনি অন্য রূপের উপাসনা

---

* ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠোপনিষৎ ৬ষ্ঠ বল্লী।

† গ্রসনাৎ সর্ব্বভূতানাং কাল দন্তেন চর্ব্বনাৎ। নির্ব্বাণ তন্ত্রং।

+ শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈ রখিলং কালিকা জগৎ। সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ং। মহানির্ব্বাণ ১৩ উল্লাস।

* অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতং। মহা নির্ব্বাণ ১৩ উল্লাস—অমৃতঃ পরমাত্মা গম্যতে। মহাভারতে—মহতঃ পর মব্যক্ত মব্যক্তাদমৃতঃ পরঃ। অমৃতান্ন পরং কিঞ্চিদিত্যাদি।

করিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্মে রূপের অভাব নাই, যাঁহার যে রূপে ইচ্ছা, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়াই একই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান! একরূপে উপাসনা করিয়া অন্য রূপে ভেদ ভাব, বিদ্বেষ ভাব, ঘৃণার ভাব, দেখাইয়া যেন অধঃপাতের সোপানে আরোহণ করা হয় না। কাঠীওয়ালা মহাপুরুষ দিগের এ বিষয় একটু বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্রমশঃ।

একনাথ-মহারাজ-চরিত।

একনাথের বীরতা সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। তাহা এই—একদা শত্রু কর্ত্তৃক দৌলতাবাদ আক্রান্ত হইল। সে সময়ে জনার্দ্দন পন্থের ন্যায় বীর পুরুষ রাজার অধীনে ছিল না। সুতরাং পন্থজীর বীরতাই রাজার এক মাত্র ভরসার স্থল। তাঁহাকে আনিবার জন্য রাজা লোক প্রেরণ করিলেন। লোকটী আসিয়া দেখিল যে পন্থজীর গৃহদ্বার বন্ধ এবং বাহিরে একটী বালক দাঁড়াইয়া আছে। তখন পন্থজী সমাধিস্থ। রাজদূত বালকটীর কাছে ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন করিল। যাইবার পূর্ব্বে, একনাথ তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। একনাথ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, গুরুদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করা উচিত নহে, অথচ তাহা না করিলে রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল হইবে। এখন কি করা যায়। মনোমধ্যে এবম্প্রকার আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে ভয়ঙ্কর তোপ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। আর তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার গুরুদেবের যে সাজ সজ্জা ছিল, তাহার দ্বারা সজ্জিত হইলেন। এক হাতে তরবারি, অপর হাতে বর্শা এবং পৃষ্ঠদেশে ঢাল ধারণ করিলেন। সঙ্গে রণ-শিঙ্গাও লইলেন। একনাথ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, যদ্যপি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে জনার্দ্দন পন্থের যশ বৃদ্ধি হইবে, আর যদি পরাজিত হইয়া যুদ্ধে জীবন দিতে হয়, তাহা হইলেও তাঁহার উত্তম গতি হইবে যে হেতু গুরু-কার্য্যে জীবন দান ভগবানের প্রীতিকর। পরে একনাথ এক টুকরা কাগজে সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া, গুরুদেবকে প্রণাম করত যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। কেল্লার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে শত্রুগণ তোপের দ্বারা কেল্লা ভঙ্গ করিতেছে। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ জনার্দ্দন পন্থের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। সেনাও প্রস্তুত ছিল। একনাথ শিঙ্গার রব করিলেন এবং সৈন্যগণ আনন্দ-ধ্বনি করত তাঁহার অনুগামী হইল। জনার্দ্দন পন্থ যে প্রণালীতে যুদ্ধ করিতেন, একনাথ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুদল এরূপ রণ কৌশল প্রকাশ করিল যে রাজসেনা ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিল। ইহা দেখিয়া একনাথ তাহাদিগকে উৎসাহ-পূর্ণ-বাক্যে সম্বোধন করাতে তাহারা উত্তেজিত হইল, এবং প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু-দলকে পরাজয় করিল। একনাথ এই যুদ্ধে অসামান্য রণ-নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষ দলের সেনা-পতিকে নিহত করিয়াছিলেন। নিজের দেহ শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। কিন্তু সে দিকে তিনি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তাঁহার গুরুদেবের কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন এই আনন্দ তাঁহাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তিনি এক হাতে সেনাপতির মস্তক এবং অপর হস্তে তরবারি লইয়া জনার্দ্দন পন্থের বাটীর অভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে পন্থজী সমাধি হইতে উঠিয়া বাহিরে নির্গত হইলেন। একনাথকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। পরে যে কাগজের টুকরা একনাথ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে মনে মনে সাধুবাদ দিলেন। একনাথ বালক, তাহার দ্বারা কি এ বৃহৎ

ব্যাপার সমাধা হইতে পারে? আর কি প্রিয় শিষ্যকে জীবদ্দশায় দেখিতে পাইব? মনে মনে এই প্রকার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একনাথ তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জনার্দ্দন পন্থের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি একনাথের মস্তকে হস্তার্পণ করত তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাঁহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একনাথের শরীর সুস্থ হইলে, পন্থজী তাঁহার কাছে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সকলে জানিত যে জনার্দ্দন পন্থই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি খেলয়েত ও পাল্‌কী জনার্দ্দন পন্থকে পাঠাইয়া দিলেন।

একনাথের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যে কার্য্য গুলি কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহা তিনি অসম্পন্ন রাখিতেন না। গুরুসেবা ব্যতীত একনাথ রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক কার্য্য করিতেন। জনার্দ্দন পন্থ তাঁহাকে রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে দিয়াছিলেন। একদা রাজার নিকট হইতে আদেশ আসিল যে আগামী কল্য রাজসভাতে হিসাব দেখাইতে হইবে। একনাথ সেই দিন অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া, হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেন। হিসাব প্রস্তুত হইলে দেখিলেন, একটী পয়সা মিলিতেছে না। তিনি এজন্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন। মনোযোগের সহিত সমস্ত হিসাব দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ভুলটী বাহির হইল, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি করতালি দিয়া হাস্য করিতে লগিলেন। জনার্দ্দন পন্থ শব্দ শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একনাথ সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলে জনার্দ্দন পন্থ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও অধ্যবসায়ের বিষয় মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া তিনি একনাথকে সাধুবাদ দিলেন। এমন উপযুক্ত শিষ্য পাওয়াতে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। একনাথ একাগ্র চিত্তে গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দন পন্থও মনের আনন্দে একনাথকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একনাথ তাঁহার বুদ্ধির প্রভাবে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। একনাথকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জনার্দ্দন পন্থ তাঁহাকে ব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন একনাথের বয়স ২০ বৎসর মাত্র। দৌলতাবাদ হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বত আছে। দত্তাত্রেয়ের পূজা করিবার জন্য জনার্দ্দন পন্থ প্রতি বৃহস্পতিবারে তথায় গমন করিতেন। এখানে যে দত্তাত্রেয়ের একটী মূর্ত্তি আছে তাহা জনার্দ্দন পন্থ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। একদা পন্থজী একনাথকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে একনাথ মনোহর দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলেন। বিজন বনের অপূর্ব্ব-শোভা! ফুল সকল হাস্য-আনন বিস্তার করাতে বনের আরো অধিক শোভা বিকীর্ণ হইতেছে। বায়ুর হিল্লোলে গাছের পাতা সকল নড়িতেছে। যেন বন-দেবতা অতিথি সৎকার করিবার জন্য জনার্দ্দন পন্থ ও একনাথকে আহ্বান করিতেছেন। আবার কোন কোন তরুর শাখা সকল অবনত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইল যেন তাহারা জনার্দ্দন পন্থকে অভিবাদন করিতেছে। অদূরে পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ নির্গত হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার পাষাণ হৃদয়, তাহার পক্ষেও একা অবস্থিতি করা অতিশয় ক্লেশকর। এই জন্যই পর্ব্বতটী প্রস্রবণ-চ্ছলে রোদন করিতেছে, এবং ঝর ঝর শব্দে লোক সকলকে আহ্বান করিতেছে। এই আহ্বান-বাণী শুনিয়া উভয়ে পর্ব্বতের নিকট গমন করিলেন, এবং ক্রমে তাহার উপরে উঠিতে লাগিলেন। পর্ব্বতটী অতি উচ্চ। আবার নানা কারণে ইহা ভয়-

প্রদ হইয়াছে। বহু কালের বৃক্ষ সকল ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এক নাথ এই বৃক্ষ সকলের উচ্চতা দেখিতে লাগিলেন, আবার দরী সকলের গভীরতা বিলোকন করিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল! সর্ব্বত্রই ভীষণ ও কোমল ভাব মিলিয়া রহিয়াছে। এক নাথ যেমন ভয়ানক দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে ২ নয়নপ্রফুল্লকর ব্যাপার সকল তাঁহাকে পুলকিত করিতে লাগিল। যে ভীষণ বৃক্ষ দেখিয়া একনাথ ভীত হইলেন, সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যে বল্লরী বহিয়াছে তাহার পুষ্পগুচ্ছ সকল তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল। আবার তরুর উপরি স্থিত বিহঙ্গকুলের মধুর সঙ্গীত, নিম্নে ঝিঁঝি পোকার ঝিল্লিরব এবং নির্ঝরের ঝর ২ শব্দ একনাথকে বিমোহিত করিল। তখন তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে প্রকৃতি বুঝি ভগবানের গুণ গান করিতেছে। এই প্রকারে কখন ভয়ে আকুল কখন বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একনাথ পর্ব্বত-শিখরে গিয়া উপনীত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, একনাথ এখানকার শোভা দেখিতে লাগিলেন। তথায় একটী উত্তম সরোবর রহিয়াছে। তাহার জল অতি নির্ম্মল। সরোবরের চারি দিক্ নানা প্রকার বৃক্ষে সুশোভিত। নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত করিতেছে। এই সকল বৃক্ষের মধ্যে একটী ডুম্বুরের বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষটি নানা প্রকার লতা গুল্মে বেষ্টিত হইয়া লতা মণ্ডপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বৃক্ষের তলে এক খানি প্রস্তর রহিয়াছে, তাহার উপর দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই সকল দেখিয়া একনাথ অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর জনার্দ্দন পন্থ ও একনাথ সরোবরে স্নান করিলেন। পরে সন্ধ্যাদি সমাপন করিলেন। একনাথ ইতি পূর্ব্বে পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনার্দ্দন পন্থ এক সহস্র শিবলিঙ্গ পূজা করিলেন। তদনন্তর একনাথ নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিতে বলিয়া জনার্দ্দন পন্থ সমাধিস্থ হইলেন। জনার্দ্দন পন্থ যখন নিজ বাটীতে যোগ সাধন করিতেন, তখন তাঁহার ঘরের দ্বার বন্দ থাকিত। সুতরাং একনাথ কখন তাঁহাকে যোগাবস্থায় দেখেন নাই। একনাথ এখন অদূর হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। জনার্দ্দন পন্থ বাঘাম্বর পরিধান করত, গলে রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক-মালা ধারণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়াছেন। দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি নানা প্রকার ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে ধূপ দীপ জ্বলিতেছে। সহস্র শিব-লিঙ্গ ফুল ও বেল পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। জনার্দ্দন পন্থ এখন প্রাণায়াম আরম্ভ করিলেন। পূরক রেচক এবং কুম্ভক প্রক্রিয়া হইতে লাগিল। জনার্দ্দন পন্থ কখন পূরক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু পূর্ণ করিতেছেন; কিয়ৎ কাল ঐ বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতেছেন। আবার তাহা ত্যাগ করিতেছেন। এই প্রক্রিয়া হইতে শব্দ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে কএক বার প্রাণায়াম করিয়া, জনার্দ্দন পন্থ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে মেঘ-গর্জ্জন হইল, এবং আকাশ হইতে একটী ভীষণ মূর্ত্তি নিম্নে আসিয়া জনার্দ্দন পন্থের সম্মুখে অবস্থিতি করিল। একনাথ এই মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া ভীত হইলেন। মেঘের গর্জ্জনে জনার্দ্দন পন্থের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পরে একনাথকে নিকটে আসিতে বলিলেন। একনাথ তাঁহার গুরুদেবের আদেশ মত নিকটে আসিলেন। কিন্তু দেবতার সমক্ষে গিয়া প্রণাম করিতে ভয় পাইলেন। ইহা দেখিয়া, দত্তাত্রেয় সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই মূর্ত্তির প্রভাবে চারিদিক্ প্রভান্বিত হইল। মূর্ত্তিটী এই প্রকার ঃ—প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তিনটী মুখ, বিস্ফারিত ছয়টী নয়ন এবং ছয় হস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মৃগাজিন রহিয়াছে এবং স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি। এক হস্তে

শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে গদা, এক হস্তে পদ্ম, এক হস্তে কমণ্ডলু, এবং এক হস্তে ডমরু শোভা পাইতেছে। কৌপীন বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং পায়ে খড়ম রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে একটী কামধেনু। ফল কথা এই, একাধারে ত্রিদেব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ভক্তের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য নিকটে কামধেনু রাখিয়াছেন। এই মনোহর মূর্ত্তিটী অবলোকন করিয়া একনাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। একনাথ এই পরম দেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, ইহা দেখিয়া জনার্দ্দন পন্থ তাঁহাকে আপনার হস্তে ধারণ করিয়া দত্তাত্রেয়ের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। দত্তাত্রেয় একনাথকে উঠাইয়া লইলেন, তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং এই বর দিলেন যে, তিনি এক জন মহাপুরুষ রূপে পরিগণিত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা লোকের সম্যক মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহার পর, দত্তাত্রেয় অন্তর্হিত হইলেন। তখন একনাথ জনার্দ্দন পন্থকে বন্দনা করিলেন, এবং তাঁহার কৃপায় যে তিনি ধন্য হইলেন একথা বার ২ বলিতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে যোগের নানা অঙ্গ, সমাধির প্রকরণ, চিত্ত-শুদ্ধির উপায় এবং নিষ্কাম ভাবে ভগবানের পূজার সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিলেন। পরে একনাথকে সঙ্গে লইয়া, জনার্দ্দন পন্থ নাসিক নামক তীর্থে গমন করিলেন। পথি মধ্যে চন্দ্র ভট্ট নামক এক জন পৌরাণিকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জনার্দ্দন পন্থ তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। চন্দ্র ভট্টের ইচ্ছা হইল যে তিনি সর্ব্বদা পন্থজীর সহিত অবস্থিতি করেন। জনার্দ্দন পন্থ ইহাতে সম্মত হইলেন। পরে তিন জনে গমন করিতে২ নাসিকে গিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরীর তীরস্থ মনোহর ঘাট ও দেবালয় সকল দেখিয়া একনাথ পুলকিত হইলেন এবং নদীতীরে বিপ্রগণকে সন্ধ্যা বন্দন করিতে দেখিয়া একনাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরে, গোদাবরীর অপর পারে গিয়া পঞ্চবটী দর্শন করিলেন, এবং এখান হইতে তপোবনে গমন করিলেন। জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, লক্ষণদেব এই বনে তপস্যা করিতেন, এবং প্রত্যহ কন্দ মূল ও ফল সংগ্রহ করিয়া রাম সীতাকে পঞ্চবটীতে দিয়া আসিতেন। লক্ষণ দেবের ভ্রাতৃভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া একনাথ বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং অন্তরের সহিত তাঁহাকে বার ২ প্রণাম করিলেন। এবনটী অতি মনোহর। কোন ২ বৃক্ষ সুন্দর ২ ফুল ধারণ করিয়া যেন হাঁসিয়া বলিতেছে যে, হে ভক্তগণ! আইস এই সকল ফুল চয়ন করিয়া বিভুর পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, এবং কোন ২ বৃক্ষ সুমিষ্ট ফল সকল ধারণ করিয়া দেবতাকে নৈবেদ্য দিবার জন্য লোক সকলকে আহ্বান করিতেছে। এই বনটীর নিম্ন দিয়া গোদাবরী প্রবাহিতা। তাহার কল কল শব্দ যেন পথিক গণকে আহ্বান করিতেছে, এবং তাহার সহিত যোগ দিয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এই বনটীর নিকটে একটী দেবালয় আছে। ইহাতে লক্ষণ দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত। বন মধ্যে স্থিত বিহঙ্গ কুলের কলরব, নদীর কল ২ শব্দ এবং দেব-মন্দিরের ঘণ্টারব, এস্থানটীকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। একনাথ এখানকার পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইলেন। এই তপোবনে কএক দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা ত্র্যম্বক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কুশাবর্ত্ত, বিল্বক প্রভৃতি দেখিলেন। পরে স্নান করত এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের দর্শন ও তাঁহার পূজা করিলেন। যে পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়া নদীর উৎপত্তি-স্থান দেখিলেন। ইহার পর তাঁহারা নাসিকে প্রত্যাগমন

করিলেন, এবং পঞ্চবটীতে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে জনার্দ্দন পন্থের আদেশে একনাথ ভাগবতের টীকা প্রস্তুত করিলেন। পরে তাঁহারা দৌলতাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

দৌলতাবাদে উপনীত হইয়া কএক দিন বিশ্রামের পর, জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে শিষ্যপ্রবর! ভগবানের কৃপায় তুমি নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং দত্তাত্রেয়ের দর্শন লাভ করিয়াছ। এখন তোমার নানা তীর্থ দর্শন করত, বিশ্বদেবের সৃষ্টি কৌশল অবলোকন করা, সাধু জনগণের সহিত সদালাপ করা এবং নানা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। এরূপ করিলে বহুদর্শিতা লাভ করিবে, তোমার অন্তঃকরণ উদার ভাব ধারণ করিবে এবং তোমার মন দৃঢ় হইবে। তীর্থদর্শনের পর পৈঠনে অবস্থিতি করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যে সংসারকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রে চারিটী আশ্রমের কথা আছে বটে কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমকে সকল আশ্রমের সার বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। চেষ্টা করিলে সাধক সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আশ্রমে যাহা সমাধা হইতে পারে না, সংসার আশ্রমে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সংসারে থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের সেবা করা যায়, ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে জল দান, এবং রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, আপামর সাধারণকে উপদেশ দান এবং কুপথগামীকে সুপথে আনয়ন করা যায়। বিশেষতঃ সংসারে থাকিয়া একটী প্রকৃত বীরের কার্য্য করা যায়। এই কার্য্য ষড়্ রিপুকে বশীভূত করা। সংসারে নানা প্রকার প্রলোভন আছে। যিনি এই সকলকে তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই ত প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনিই ত প্রকৃত ধর্ম্মবীর। নতুবা, যিনি এ সকল কার্য্য সমাধা করিতে না পারিয়া বনে গমন করেন, তিনি ত রণে ভঙ্গ দেওয়া সিপাহী। সংসার ত্যাগ করিলে কেবল যে ভীরুতা দেখান হয় তাহা নহে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা জন্য পাপের ভাগী হইতে হয়। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের নিকট মনুষ্য নানা প্রকারে ঋণী। এ ঋণ পরিশোধ না করিয়া, সংসার ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। তবে সাধ্য মতে পিতা মাতা প্রভৃতির সেবা করিয়া ইঁহাদের স্বর্গারোহন হইলে পর, উপযুক্ত পুত্রের প্রতি সংসারের ভার দিয়া, গৃহী ব্যক্তি সস্ত্রীক, কোন পবিত্র এবং প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত স্থানে, ঈশ্বরের আরাধনায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। ঐ অবস্থায়, তাঁহার যে কর্ত্তব্যের শেষ হইল তাহা নহে। তিনি তখনও আপামর সাধারণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। বার্দ্ধক্য-দশায় অধিক কিছু করিতে না পারেন, লোককে উপদেশ দানে তাঁহার সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করিতে পারেন। এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া একনাথ জনার্দ্দন পন্থকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পন্থজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন - হে শিষ্যপ্রবর! আমি তোমার গুণে বশীভূত হইয়াছি। তুমি অতি উপযুক্ত পাত্র। তোমার দ্বারা যে পৃথিবীর সমধিক মঙ্গল হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া একনাথ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

বিজয়া।

বিজয়া অপূর্ব্ব সামগ্রী—অসাধারণ এবং অপার্থিব। উহা আলোক ও অন্ধকারের সংযোগ, সুখ ও দুঃখের সঙ্গম, হর্ষ ও বিষাদের আলিঙ্গন, আহ্লাদ ও অবসাদের সমাবেশ, দেব ও দানবের সম্মিলন। বিজয়ার দিন হাঁসি ও কান্নার স্রোত একাধারে প্রবাহিত হয়। সে দিন

ছায়া ও ঊষা হাত ধরাধরি করিয়া প্রীতি-কথা কহে। এমন বিরুদ্ধ সংযোগ, এমন অসম্ভব ব্যাপার পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভবে কি না জানিনা, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে উহা বর্ষে ২ ঘটিয়া থাকে। বিসর্জ্জনের দিন আমাদের চোখে জল আইসে; আমরা কাঁদিয়া ফেলি। কেননা, এই দিনে দীন দুঃখীর সহায় জগন্মাতা, দয়া করিয়া দরিদ্রের তমসাচ্ছন্ন গৃহ দিব্য হাঁসির বিদ্যু-বিকাসে সমালোকিত করিয়া, অসুখীকে সুখের আস্বাদ দিয়া চলিয়া যান। যাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বৎসরাবধি তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্গ্রীব এবং উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়, তাঁহাকে কোলের কাছে পাইয়া, সেই নয়ন-তারা তারাকে তিন দিন. গৃহে রাখিয়া আদর যতন করিয়া আবার যে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়; তাই মনঃপ্রাণ কেমন করিয়া উঠে, যেন মতিচ্ছন্ন হয়. কেমন বিহ্বল বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই। এই দিনে হিন্দুর গৃহ শ্মশান হইতেও ভীষণ। আমাদের পক্ষে এই দিন বড় দুঃখের, বড় যাতনার, বড় বিপদের। যে আশায় জীবন, যে আশায় মনুষ্যত্ব, সেই আশায় হঠাৎ যেন অদ্য ছাই পড়ে। হিন্দুর গৃহে এখন সঙ্কুলান নাই। এই অস্বচ্ছন্দতার অবস্থা হইতে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া তবে নমো নমো করিয়া বৎসরান্তে এক প্রকার পূজা হইয়া থাকে। পূজার চিন্তা, পূজার আয়োজন, পূজার চেষ্টা বার মাসই থাকে। পরন্ত বিসর্জ্জনের দিন মনে হয় যেন সকল চিন্তা সকল চেষ্টা সকল উদ্যোগ নষ্ট হইয়া গেল। যেন আশা ধসিয়া পড়িল,। বড়ই সংযমী হইলেও বিসর্জ্জনের দিন বুক্ দুর্ দুর্ করে, চোখ্ ফাটিয়া জল আইসে।

পক্ষান্তরে বিজয়া—হিন্দুর বিজয়া। বিজয়ার দিন হিন্দুর কণ্ঠে বিজয়-বৈজয়ন্তী মালা শোভিত হইয়াছিল। বিজয়ার দিন হিন্দুর শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু, পবিত্রতার শত্রু, দেবতার শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু রাক্ষস রাবণ নিহত হইয়াছিল। বিজয়ার দিন শ্রীরামচন্দ্রের চিরবিচ্ছেদের অবসান হইয়াছিল, এই দিনে তাঁহার বিষাদমাখা মুখে হাঁসি দেখা দিয়াছিল। বিজয়ার দিন বিরাট রণ-প্রাঙ্গনে বিশ্বব্যাপী অরিত্বের উচ্ছেদ হইয়াছিল। এই শুভদিনে দেব দানবে আলিঙ্গন করিয়াছিল, নরবানরে কোল কুলি করিয়াছিল, প্রণয়ের সম্মিলনের পীয়ূষ প্রবাহ ছুটিয়াছিল। এই দিনে বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই। আমোদ আলিঙ্গন—প্রীতি—সোহাগ—স্নেহ—সৌহার্দ্দ্য এবং উৎফুল্লতার ফোয়ারা ছুটিতে থাকিবে। এমন সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসবের দিন বৎসরের মধ্যে বুঝি আর নাই।

তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মা আনন্দময়ি! তোমার সদানন্দের রাজ্যে আর কয় স্থানে—এমন আলোক-আঁধার করিয়া রাখিয়াছ। আমরা ত মা! তোমায় রাবণবধের কারণ ডাকি না। তোমাকে দেখিব, তোমার কথা শুনিব, তোমার পূজা করিব, তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়া মনের সাধ মিটাইব; আর তুমি হাঁসিবে, অধর প্রান্ত চাপিয়া ২ আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষের কোল ঘুরাইয়া ২ অন্যের অলক্ষ্যে দশ হস্ত কাঁপাইয়া, মুকুট নাড়িয়া তুমি হাঁসিবে; আরতির সময়ে ধূপধুনা গুগ্গুলের চক্রাকার ঘন ধূমের মধ্যে, পঞ্চপ্রদীপের নৃত্যের তালে ২ আপনা ভুলিয়া, ত্রিভুবন ভুলাইয়া লুকাইয়া ২ তুমি হাঁসিবে, তোমার হাঁসি দেখিয়া আমি হাঁসিব, দশজনকে হাঁসাইব—মাতাইব। আমার সকল দুঃখ, সকল জ্বালা, সকল ভাবনা দূরে যাইবে, আমি কৃতার্থ হইব, ধন্য হইব। এখন আমার সে দিন নাই, সে শক্তি নাই, সে প্রভাব নাই, আমার পক্ষে শত্রুবধ-আকাঙ্ক্ষা বামনের চাঁদধরা মাত্র। আমি সার্ব্বভৌম সম্রাটের বংশধর হইয়াও এখন কুক্কুরপদদলিত। শক্তিরূপিণি! শক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য তোমায় ডাকিব কেন মা? আমার কি আর শক্তি-ধারণের ক্ষমতা আছে? আমি চাই তোমাকে—তোমায় দেখিতে। তুমি দেখা দেও. কথা কও. সাধ মিটাও। এবং যাইবার

সময়ে কাঁদাইতে২ হাঁসাইয়া যাও! এ বিচ্ছেদের ভীষণ মেঘের কোলে মিলনের অচঞ্চল চপলা হাঁসি অঙ্কিত করিয়া দিয়া যাও! তোমার মহামহোৎসবের এই টুকুই চমৎকার, এই টুকুই আশ্চর্য্য প্রহেলিকা!

কত পুরাতন কথা মনে পড়ে। সে পূর্ব্ব গৌরবের—তেজের—স্পর্দ্ধার কত কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, এক দিন শ্রীরামচন্দ্র রাজরাজেশ্বর হইয়াও জটাবল্কল ধারণ করিয়া কান্তিহীন দীন দুঃখীর বেশে সাগর-বেলা-ভূমি-সন্নিকটে তোমার পূজায় ব্যস্ত, অষ্ট ঊর্দ্ধ শত নীলকমল লইয়া তোমায় অঞ্জলি দিতেছেন চারিদিকে বানর পাল নিস্তব্ধ-কর-যোড়ে দণ্ডায়মান। একে ২ সকল কমল তোমার রাঙ্গা পায়ে শোভা পাইতে লাগিল, কিন্তু বুঝি একটি কম পড়িল, পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া কোথাও অপহৃত পদ্ম পাওয়া গেল না, কি হইবে, পূজা পূর্ণ কেমনে হইবে? পরিশেষে মহাবীর রামচন্দ্র তাঁহার অপরূপ কোটীকমলপ্রভা-পরাজয়ী নেত্রকমল উৎপাটিত করিবার মানসে শরাসনে শরযোজনা করিলেন, আর স্নেহময়ি মা! তুমি তখনি তোমার বালুকাময়ী মূর্ত্তির অন্তরাল হইতে দিব্য মাতৃরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের হস্তরোধ করিলে। তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার দিব্য শক্তিযোজনায় রাবণ নষ্ট হইল, সকল দুঃখ দূর হইল। সেই এক তোমার করুণার দিন! আর আজ কত সব পণ্ডিতের মুখে শুনিতেছি যে মা তুমি জগন্মাতা, তুমি কীট পতঙ্গের বিশ্বচরাচরের অন্ন যোগাও, তুমি না বলিতে সকলের সাধ মিটাও, তোমার কাছে প্রার্থনা কি? তোমার কাছে কামনা কি? কথাটা সত্য কি মিথ্যা তুমি জান, আমার সে অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই। কিন্তু মনে হয় এই শিক্ষার দোষে বুঝি আব্দার করিতে ভুলিয়াছি। তবুও মা তুমি ঘরে আসিলে তোমাকে সকল অভাব না জানাইলে মন তৃপ্ত হয় না। যিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি তোমার কাছে প্রার্থনা না করিতে পারেন, আমিত মা সর্ব্বহারা, তোমার দুয়ারে আমি ভিক্ষা করিব না ত অন্যে কে করিবে? অরণ্যচারী ভিখারী ভগবান রামচন্দ্রও নাকি তোমায় "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন। আমরাও বলি মা তুমি আমাদের ধন দেও, পুত্র দেও, ঐশ্বর্য্য দেও, সম্পদ্ দেও, বিদ্যা দেও, বুদ্ধি দেও, বল দেও, বিক্রম দেও, ভক্তি দেও, শ্রদ্ধা দেও, স্নেহ দেও, পবিত্রতা দেও আর যাহা দিবার, তাহাও দেও। তুমি না দিলে আর কে দিবে মা! তোমার কাছে না চাহিলে আর কাহার কাছে চাহিব মা! তুমি দয়া করিয়াছিলে, তাই একদিন জগন্মান্য হইয়াছিলাম, আবার করুণা-দৃষ্টি করিলে পূর্ব্বপদারূঢ় হইতে পারিব।

পূজার তিন দিন দাও দাও যে বলি নাই, ভিখারীর বেশে তোমাকে যে ব্যস্ত করি নাই তাহা নহে। সাধ্য অসাধ্য, সম্ভব অসম্ভব, কত সাধ তোমাকে জানাইয়াছি কত আব্দার তোমার কাছে করিয়াছি। তুমি সকল বাসনা পূর্ণ করিয়াছ কি না অথবা পরে কখনও করিবে কি না তাহা তুমি জান, সে সকলের হিসাব নিকাসের এ সময় নহে। এখন তুমি চলিলে, আবার তোমায় দেখিতে পাইব কি না, তোমার পূজায় ব্যস্ত থাকিতে পারিব কি না তাহা ভগবানই জানেন। এই বেলা আর একবার তোমায় নয়ন মন ভরিয়া দেখিয়া লই, চক্ষুর সাধ মিটাইয়া মনের বাসনা পুরাইয়া তোমার চাঁদ মুখ খানি দেখিয়া লই, বক্ষের উদ্বেগ চাপিয়া নেত্রনীর মুছিয়া তোমার জবাশোভিত অপরূপ রাঙ্গাচরণ দুখানি দেখিয়া লই।

লোকে বলে মা! তুমি চিন্ময়ী অরূপিণী। কিন্তু আমার ধারণা মা! তুমি মৃন্ময়ী রূপশালিনী। তুমি আমাদের মা, যে ভাবে যাহা দিয়া তোমাকে নির্ম্মাণ করিব, যাহা দিয়া সাজাইলে আমি পরিতৃপ্ত হইব, তুমি তাহাই। তুমি খড় মাটির পুতুল হইলে দোষ কি? তোমাকে ডাকের সাজে সাজাইলে, চাল কলা খাওয়াইলে দোষ কি? আমি পৌত্তলিক হইব, জড়োপাসক হইব, অসভ্য

বর্ব্বর মূর্খ হইব, জগতের লোকে গায়ে ধুলা দিবে, ক্ষতি কি! অপমানের, লাঞ্ছনার আর বাকী কি আছে? যে গালি খাইতেছি, যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি, ইহার অধিক আর কি হইবে? আমি জানি না তুমি সাকার কি নিরাকার, তুমি সগুণ কি নির্গুণ, তুমি আছ কি নাই। তবে আমার যাহা ভাল লাগে, আমার যাহা মনোমত, বাল্যকাল হইতে আমি যাহা শিখিয়াছি তুমি তাহাই। তুমি বিশ্বচরাচর, তুমি বিশ্বসৃষ্টি, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, তুমি জড়, তুমি শক্তি, তুমি শক্তি, তুমি ভাব, তুমি ভক্তি, তুমি মায়া, তুমি মেধা, তুমি ছায়া তুমি উষা, তুমি অস্তি তুমি নাস্তি, তুমি উদ্বেগ তুমি শান্তি, তুমি পূর্ণ তুমি শূন্য, তুমি নীচ তুমি মান্য, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি ক্ষুদ্র, তুমি বিধাতা, তুমি আমি, তুমি তুমি, তোমা ছাড়া আর কিছুই নাই, তুমি বৈ আর কিছুই নাই। হইলেই বা, মা! তুমি খড় দড়ি বাঁস বাকারীর সমষ্টি। যাহা দিব, যাহা পরাইব, যাহা দিয়া তোমায় পূজিব, তাহা তোমারই সব, তুমিই সব। কারণ তোমা ছাড়া বিষয় হয় না, তোমা ছাড়া কথা সম্ভবেনা। তবে এত গোলমাল কেন, এত বিতণ্ডা কেন? আমি যাহা, তোমায় তাহাই হইতে হইবে, আমার যাহা আছে তোমায় তাহাই লইতে হইবে। এখন আমি ফকীর, আমার খড়-দড়ি-মাটি তুঁষ বই আর কিছুই নাই, আমার ডাকের সাজ বৈ অন্য আভরণ নাই, আমার চাল কলা ব্যতীত অন্য ভোজন-সামগ্রী নাই। তাই মা! তুমি জগন্ময়ী হইয়াও আমার গৃহে আসিয়া মৃন্ময়ী হইয়াছ, রাজরাজেশ্বরী হইয়াও আমার মা হইয়া ডাকের সাজে অলঙ্কৃত হইয়াছ, অন্নপূর্ণা হইয়াও দরিদ্রের চালকলায় তোমার ভোগরাগ হইতেছে। আবার সুদিন হইলে তোমায় কণকময়ী করিব, দিব্যাভরণ-ভূষণে সাজাইব, অমৃতভোগে তোমায় পরিতৃপ্ত করিব। এখন তুমি কাঙ্গালের মা, তাই কাঙ্গালিনী হইয়া-ভিখারিণী—স্নেহময়ী হইয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলে। দেবি! তুমি দীনবেশেই আসিয়াছিলে। দীনবেশেই চলিয়া যাইতেছ। তোমার পূজা আমি ভুলিয়াছি, তোমার সেবা আমার দ্বারা আর হয় না। তোমায় আনিয়া তোমার দোহাই দিয়া, নীচ আমি পাপের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিই—আমার পৈশাচিক পিপাসার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টিত হই। বারে বারে তুমি কত প্রকার বিভীষিকা দেখাইয়া যাও, বারে বারে তুমি আমার দারিদ্র্যের পরিমাণ করিয়া যাও, বারে বারে তুমি ভারত-মহাশ্মশানের চিতা গণনা করিয়া যাও, কি বলিব পাষাণী তুমি, বিধির বজ্রলেখ তুমি মুছিয়া দিলে না, ললাটের লিখন তুমি উল্‌টাইলে না। যাও মা! আবার আসিও আবার এম্নি হাঁসি মুখে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাইও!

এস মা! তোমাকে 'যাও' বলিতে নাই, আমার অকল্যাণ হইবে? তোমার যাওয়া আসা এক; তোমার বিসর্জ্জনে তোমার আগমনী, বোধনে তোমার বিজয়ার সঙ্কেত। এস মা! যথায় তোমার আগমন, তথায় তুমি আইস। গঙ্গাধর মহাদেব তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। মৃণ্ময়ী মা! গঙ্গার পবিত্র সলিলে তোমার মৃণ্ময় দেহ গলাইয়া, তোমার সপত্নী অঙ্গে অঙ্গ মিসাইয়া, আমাদের গৃহ শূন্য করিয়া, শূন্যের মধ্যে পূর্ণাভাস দিয়া, পরাজয়ের দিন বিজয়ার শতদুন্দুভি-ধ্বনি ঘোষিত করিয়া এস মা! ঐ আকাশে শারদেন্দু সুধামাখা হাঁসি হাঁসিতেছেন, ধরাতলে তরঙ্গিনী মন্দাকিনী আমাদের নেত্রনীরের সহিত উছলি উছলি, শুভ্র জ্যোৎস্না-ছটা উথলি উথলি অমৃতধারায় তোমার মৃন্ময়ী প্রতিমা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর নদীতরঙ্গ-প্রতিঘাতী কোটী কোটী চন্দ্রকলা তোমায় লইয়া সুধাস্রোতে উলটি পালটি গলিয়া যাইতেছে। ঐ অদূরে বিস্তীর্ণ রামলীলা-ক্ষেত্রে নাট্যশালার নাট্যরঙ্গে প্রচণ্ড রাবণের প্রকাণ্ড চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার পৌরজনবর্গের হাহা-

ধ্বনির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের অগণিত নরবানরে জয় জয় রবে দিগেদশ বিকম্পিত করিয়া দিতেছে। মন্দোদরী কাঁদিল, অনাথিনী হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সীতাদেবী হাঁসিলেন—পতিসোহাগিনী হইবার আশায় আনন্দোৎফুল্লনেত্রে আনন্দের মুক্তামালা কপোল ও গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মা! তুমি এস! তোমার আসার সহিত কত আশা আসিয়া জুটে, আবার কত আশা চলিয়া যায়। মা ক্ষুদ্র আমি, দুর্ব্বল আমি, বিজয়ার এ বিপরীত সৃষ্টি আমার ধারণা হয় না। তোমায় বিসর্জ্জনের দিন তোমায় ভুলিয়া কেমন করিয়া আবার হাঁসিব! বল মা এ হাঁসি—কান্নার চির বিরোধ কেমনে ঘুচাইব।

এস ভাই—আজ কাঁদিতে কাঁদিতে হাঁসিয়া ফেলিয়া, শূন্য গৃহে পূর্ণতার পূর্ণ কল্লোল করিয়া আমরা আপনা-আপনি-আলিঙ্গন করি। আমরা কাঁদিব, কেননা আমরা দুঃখী, আমাদের মা বৈ আর কেহ নাই. সেই মাহোরা আজ হইলাম; আমরা হাঁসিব কেননা মা আসিয়া লক্ষ্মীছাড়াকে লক্ষ্মীমন্ত করিয়াছেন. শ্রীরামচন্দ্রের শূন্য কক্ষ পূর্ণ করিয়াছেন, কোজাগরে শুভ্রজ্যোৎস্না বিলাইতে বিলাইতে মা লক্ষ্মীর আগমন হইবে, অন্নহীনের গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইবে। আমি কাঁদিব কেননা তোমরা বুঝি কাঁদিতেছ, আমি হাঁসিব কেননা আমার এ রোদনের বেগ ত আর রোধ হয় না।

মা আবার আসিও! আবার—কাঁদাইও! আবার হাঁসাইও! এস মা!

---

২৩ শে কার্ত্তিক হইতে ৺ কাশীধামে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। ১ লা অগ্রহায়ণে শেষ হইবে। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তাগণ উৎসবোপলক্ষে বক্তৃতা করিবেন। ৺ ঢুণ্ডিরাজ গণেশ বিশ্বনাথাদির পূজা, বেদবিদ্যালয়ে বেদগান, সঙ্কীর্ত্তন, গঙ্গাবক্ষে জলযানে সঙ্গীত ইত্যাদি কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক বর্গকে আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি। উৎসব-দর্শনের সঙ্গে যাঁহারা তীর্থদর্শনের ফল লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ইহাই শুভ অবসর।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥ "

১৪শ ভাগ | ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১৩ | অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্ফ্য সূর্প্যাজির ধান্যানাং মুষলোলুখলানসাম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহূনাং ধান্যবাসসাম্ ॥
তক্ষণং দারুশৃঙ্গাণাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্।
মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥

যজ্ঞবস্ত্র, সূর্প্যাজির, (কুলা) ধান্য, উদূখল, মুষল ও শকট এই সমস্তও উষ্ণজল দ্বারা শুদ্ধ হয়। পুঞ্জীকৃত ধান্য ও বস্ত্রের উপরে জল ছিটাইয়া দিলেই শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠ ও শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্র তক্ষণ দ্বারা, ফল নির্ম্মিত পাত্র গো কেশ দ্বারা ও যজ্ঞপাত্র হস্ত দ্বারা পরিমার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হয়।

সোষৈ রুদক গোমূত্রৈঃ শুদ্ধত্যাবিক কৌশিকম্।
সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্টৈঃ কুতপং তথা।

সাজি মাটি, গোমূত্র ও জল দ্বারা কম্বল ও তসর আদি বস্ত্র শুদ্ধ হয়। বল্কলনির্ম্মিত বস্ত্র বিল্বফল, সাজি মাটি, গোমুত্র ও জল দ্বারা এবং শাল দোশালা আদি বস্ত্র রীঠা, সাজি মাটি ও গোমুত্র দ্বারা শুদ্ধ হয়।

সগৌর সর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃ পাকান্ মহীময়ং।
কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষ্যং যোষিন্মুখং তথা ॥

রেশমী বস্ত্র গোমূত্র ও সাদা সর্ষপ দ্বারা, মৃন্ময় পাত্র পুনঃ অগ্নিপাক দ্বারা শুদ্ধ হয়। শিল্পী, ধোবা ও রং প্রস্তুত কারীর হস্ত, বিক্রেয় দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, ও সম্ভোগ কালে স্ত্রীর মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ পবিত্র।

ভূশুদ্ধি র্মার্জ্জনাদ্দাহাৎ কালাদ্‌গোক্রমণাত্তথা।
সেকাদুল্লেখনাল্লেপাদ্ গৃহং মার্জ্জনলেপনাৎ ॥

সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, জল দ্বারা সিঞ্চন করিলে, খনিত্র দ্বারা খনন করিলে, গোপাদক্ষেপ হইলে, এবং কিয়ৎকাল অতীত হইলে ভূমি শুদ্ধ হয়। গৃহ মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়।

গোঘ্রাতেঽন্নে তথা কেশে মক্ষিকাকীটদূষিতে।
সলিলং ভস্ম মৃদ্বাপি প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥

যদি অন্ন গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত হয়, কিম্বা কেশ, মক্ষিকা, ও কীট দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে তদুপরি সলিল, ভস্ম, কিম্বা মৃত্তিকা বিন্দু মাত্র ছিটাইয়া দিলে, তাহা শুদ্ধ হয়।

ত্রপুসীসক তাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদক বারিভিঃ।
ভস্মাদ্ভিঃ কাংস্যলোহানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য তু ॥

পিত্তল, সীসা ও তাম্র, লবণাক্ত জল, অম্লজল ও

শুদ্ধ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ ভস্ম ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ঘৃত ও তৈল আদি দ্রব পদার্থ ক্ষরণ মাত্রেই শুদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

অহঙ্কার।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে * দেখাইয়াছি, তীব্রতার তিরোভাব—দুর্ব্বলতার আতিশয্যই পাপের ভিত্তিভূমি। শক্তিসত্ত্বে তেজের সন্নিধানে—ভাবের বিকাশক্ষেত্রে অভাবের আবির্ভাব একরূপ—একরূপ কেন, সম্পূর্ণই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তাই মহাত্মা শুকদেব বলিয়াছেন—"তেজীয়সাং ন দোষায়।" কিন্তু সে তেজস্বিতা অখাদ্য আহার জনিত পাশব শক্তি নহে—তাহা বয়ঃসুলভ রজস্তমাশ্রিত উন্মার্গগামী মনমাতঙ্গের বিষয়বিষাক্ত উন্মত্ততাও নহে—উহা অমানসিক ও অমানুষিক—মনের অতীত দেশনিঃসৃত। শক্তিহীন শরীরে কুপথ্য তো ক্লেশকর বটেই; স্বাস্থ্যের সুখাদ্যও বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে—আলিঙ্গন তখন বন্ধন বলিয়া বোধ হয়, সাধের অলঙ্কার গুরু ভারে বাদ সাধে, বর্ম্ম ঘর্ম্মকারক এবং শিরস্ত্রাণ শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া উঠে। দুর্ব্বলহৃদয় জীব আপনার শক্তিহীনতা-স্বীকারেও অসমর্থ, তাই অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া আপনার অসত্য সাধুতার পরিচয় দিতে চায়, অপরের দোষে নিজের দোষ ঢাকিতে গিয়া আপনাকে আরও দূষিত করিয়া ফেলে। কালি হাতে মুখের কালি মুছিতে গিয়া স্বস্বরূপ সকলকে আরও ভাল করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পায়।

অহঙ্কারও আমাদের অলঙ্কার, কিন্তু এ আভরণ সঙ্কীর্ণ অহমিকতা উদ্দীপনার জন্য নহে, অস্মদাদির ঊর্দ্ধগতি—উন্নতিকল্পে সৃজিত—ইহা জীবের শিবত্ববিধায়ক। কিন্তু ব্যবহারদোষে অমৃত বিষ হইয়াছে, কণ্ঠের হার উদ্বন্ধন রজ্জু হইয়াছে—হস্তের বলয় চরণশৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে। অপব্যবহারে স্বর্ণবর্ণ কলঙ্কিত, উচ্চাশা দুরাশা ও নিরাশায় পরিণত। উন্নতির দ্বারে অবনতির স্রোত প্রবাহিত, মুক্তির মূল বন্ধন শূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই অহঙ্কৃতি বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে।

মঙ্গলময়ী শক্তি চিরশিবদাত্রী। স্বরূপত কিছুই অসুখকর নহে—পার্থক্যই—ভয় ও দুঃখের কারণ (দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ভবতীতি শ্রুতিঃ) এবং ক্ষুদ্রতাই তাহার মূলবীজ। পূর্ণায়তনে কোন পদার্থই দোষস্পৃষ্ট হয় না, অসম্পূর্ণতা—অল্পতাই দোষের আকর, ক্ষুদ্র হইয়া পৃথক্ থাকিলে দূষিত হইবে—তাই বলি বড় হইয়া যাও, নিতান্ত বড় হইতে না পার, তো তাহার আশ্রিত হও, তদনুবর্ত্তী হইয়া তাদাত্ম্য ভাবে মিলিয়া মিশিয়া যাও—জলে জল হইয়া যাও, কিন্তু মাছ হইও না আবার ধরা পড়িবে, পৃথক্ অস্তিত্ব রূপ লঘুত্ববিধায়ক শুষ্ক অলাবু সঙ্গে লইও না, তাহা হইলে ডুবিয়াও ভাসিয়া উঠিবে—বুদ্বুদ সহ উপরে তুলিয়া ফেলাইবে—একেবারে গলিয়া যাও—আপনাকেও ভুলিয়া যাও—বড় হইবে তো আপনাকে বড়ই ভাব, লোককেও তাই ভাবিতে দেও—লোকে বড়ই দেখুক, তোমাকে পৃথক্ যেন আর না দেখিতে পায়। বড় হইতে গিয়া আপনাকে আর পৃথক্ করিয়া ভাবিও না, ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে—পদে পদে বিপদে পড়িবে। দুইরূপে বহুরূপী সাজিয়া সকলের সমক্ষে ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। দ্বিদল যতক্ষণ পেষণীর নাভিদেশে থাকে, ততক্ষণ নিষ্পেষিত হয় না, কিন্তু পৃথক্ হইয়া দূরবর্ত্তী হইলেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রারব্ধজনিত বাসনা বায়ুবিতাড়িত হইয়া অহম্মম বুদ্ধির বিকাশেই পার্থক্যের ও জীবের জন্মের ও ক্লেশের কারণ। ক্রিয়ার আধারকেন্দ্র সদৈব নিশ্চল, তাই কেন্দ্রে স্থিতি নির্ভয়, কিন্তু

* হৃদয় দৌর্ব্বল্য ১০ম সংখ্যা ১৩শ ভাগ ধঃ প্রঃ।

কেন্দ্রাতিগ হইলেই ঘুরিয়া মরিতে হয়। বিচার-দৃষ্টিতে অহঙ্কার স্বরূপতঃ বাহ্যজগতের উন্নতি ও অন্তর্জগতের সিদ্ধি স্বরূপ। আত্ম-স্থিতি-জ্ঞান না থাকিলে কার্য্য-কুশল হওয়া যায় না, আস্তিক্য বুদ্ধিরও উদয় হয় না। পাঠক! অহঙ্কারের মলিন মূর্ত্তি অনেকবার দেখিয়াছেন ও অনবরত দেখিতেছেন সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না; কিন্তু যে ভাবে মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—"এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দু'টার একটা করে যাব।" ইহার যদি নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাহেন—যদি এই দৈবী প্রতিমা দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার শাস্ত্রাদর্শে অবলোকন করুন।

যোগবাশিষ্ঠে—

শ্রীরাম উবাচ।

কিমাকৃতিরিহঙ্কারঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রভো।
সশরীরোঽশরীরো বা ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্রিবিধো রাঘবাস্তীহ অহঙ্কারো জগত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যজ্যঃ শৃণু তে কথয়াম্যহম্॥
অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ।
নান্যদস্তীহ সম্বিদ্ যা পরমা সাহ্যহঙ্কৃতিঃ॥
সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ।
ইতি যা সম্বিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা॥
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।
পাণিপাদাদি মাত্রোঽয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহঙ্কারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ॥
বর্জ্য এষ দুরাত্মাসৌ স্কন্ধ সংসার সন্ততেঃ।
অনেনাভিহতো জন্তুরবোধঃ পরিধাবতি॥
অনয়া দুরহংকৃত্যা ভাবাৎ সংত্যক্তয়া চিরম্।
শিষ্টাহঙ্কারবান্ জন্তু র্ভগবান্ যাতি মুক্ততাম্॥
প্রথমৌ দ্বাবহঙ্কারাবঙ্গীকৃত্য তু লৌকিকৌ।
তৃতীয়াহঙ্কৃতি স্ত্যজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী॥
এষা তাবৎ পরিত্যজ্যা ত্যক্তৈনাং দুঃখদায়িনীম্।
যথা যথা পুমাংস্তিষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা॥
অহঙ্কৃতি দৃশাবেতে পূর্ব্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি।
তিষ্ঠত্যভ্যেতি পরমং তৎপরং পুরুষোঽনঘ॥
অথ তে অপি সংত্যজ্য সর্ব্বাহঙ্কৃতিবর্জ্জিতঃ।
স তিষ্ঠতে তথাপ্যুচ্চৈঃ পদমেবাধিরোহতি॥
শরীরাস্থাময়াপুণ্যদুরহংকার বর্জনাৎ।
অত্যন্ত পরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদম্॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন হে প্রভো! অহঙ্কার কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায়? উহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ আছে কি না, এবং তত্ত্যাগেই বা কি ফল?

বশিষ্ঠদেব কহিলেন—হে রাঘব! এই ত্রিজগন্মধ্যে ত্রিবিধ অহঙ্কার আছে, তন্মধ্যে দুইটী শ্রেষ্ঠ ও অপরটী ত্যজ্য। আমি তোমার নিকটে ইহার সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ সমস্ত বিশ্বই আমি, অন্য আর কিছুই নাই। আমিই অবিনাশী পরমাত্মা এই প্রকার অন্তঃ-করণের বৃত্তিকে পরম অহঙ্কার বলিয়া জানিও। আমি সকল বস্তু হইতে অতিরিক্ত, আমি বালাগ্র তৃণেরও শত ভাগের এক ভাগ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়, এইরূপ জ্ঞানের নাম দ্বিতীয় অহঙ্কার, ইহাকে শুভজনক জানিবে। জীবন্মুক্তাবস্থাপ্রলভ এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে, বন্ধন হয় না। আমি পাণি-পাদাদি বিশিষ্ট শরীর মাত্র ইহা নিশ্চয়ই তুচ্ছ ও লৌকিক তৃতীয় অহঙ্কার। এই দুরাত্মাই সংসারাসক্তির স্কন্ধ স্বরূপ, এই অহঙ্কারে অভিহিত জীবগণ অজ্ঞতা বশতঃ ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, এইজন্য ইহা বর্জ্জনীয়। সর্ব্বথা সাবধানে এ দুরহঙ্কার পরিত্যাগ ও সদহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, লৌকিক দুঃখদায়ক তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যজ্য। দুঃখদায়িনী

এই অহঙ্কৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলে পুরুষ পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইতে পারে। হে অনঘ! পুরুষ পূর্ব্বোক্ত উত্তম অহঙ্কার দুইটীর ভাবনায় (পরোক্ষ জ্ঞান কালে) তৎপর হইলে পরম পদ পাইয়া থাকে, আর সর্ব্বাহঙ্কারবর্জ্জিত * হইলে উচ্চ ব্রহ্মপদ তাদাত্ম্যভাব লাভ হয়। শরীরের প্রতি আস্থাই পাপ স্বরূপ অহঙ্কার। অতএব উহাকে পরিত্যাগ করিলে যে শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে তাহাই পরম পদ বলিয়া জানিবে। শারীর-অহঙ্কার শূন্য ও স্বরূপ অহঙ্কার-সম্পন্ন হইয়া শম্বরাসুর—সৃজিত রাগাদিবিহীন, জরামরণ ভয়-রহিত, সমদৃষ্টি দানবগণও দেব সেনার দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সদহঙ্কারসংযোগে দানবও যখন দেবের দুর্জ্জেয় হইয়াছিল তখন অনুকূল গামী মানবও তদ্দ্বারা যে সংসারাসক্তি অতিক্রমে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য, লৌকিক অহঙ্কার শারীর, তাহার পরিণামও অসন্তোষ—অসুখের আধার; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধি সদহঙ্কারানুগত।

জলে যেমন শুষ্কতা নাই, গুরুভারে যেমন লঘুত্ব নাই, পূর্ণতায় সেইরূপ অভাব-অবকাশ নাই। যাহা যত পূর্ণ-তোন্মুখ, তাহা ততই অক্ষুণ্ণ ও অভাবশূন্য—নির্দ্দোষ। বৃত্ত যতই ক্ষুদ্র হইবে, তাহার পরিধির বক্রতাও তত অধিক দেখা যায়, আর ব্যাসের বৃদ্ধির সহিত পরিধির বক্রতা হ্রাস হইয়া আইসে। আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষে পৃথিবী অতীব বৃহৎ, তাই তাহার অবয়বের বক্রতা অনুভূত হয়না—সর্ব্বত্রই সমতল বলিয়া বোধ হয়। যাহা পূর্ণ তাহা দোষশূন্য, দোষ থাকিলে তাহা পূর্ণ হইল কৈ? ভেদ-বুদ্ধিতে দোষ দেখিলেও সে দোষ পূর্ণ পদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে উহা তো তদংশজ, দোষের সেখানে দ্বিতীয় অস্তিত্ব নাই— সুতরাং দোষ (অভাব) পূর্ণতাকে দূষিত করিতে পারেনা, বরং স্বয়ংই (দোষ দর্শীগণ) পৃথক্ হইয়া দূষিত ও দলিত হয়। পূর্ণ পদার্থ প্রেমময়—আনন্দময়—ব্রহ্মপদবাচ্য। আমরাও দেখিলাম অহঙ্কৃতির পরিণতি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি। অহঙ্কারের প্রদীপ্ত প্রভা—পূর্ণাভিন্ন প্রজ্ঞানমানন্দমনন্তং ব্রহ্মেতি সমাপ্তি।

* অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের পর অমনসাবস্থায় দ্বিতীয় অবিদ্যমানে দ্বিতীয় পদার্থের অভাব হেতু অহঙ্কৃতির স্ফুরণ অসম্ভব।

শ্যামারহস্য।

নিরাকারে স্থূলাধিকারীর মন নিবিষ্ট হয় না, তাই সাকার ভাবে কালী দুর্গা শিব কৃষ্ণাদিরূপে সংসারাসক্ত জীবের উপাসনার বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ কথা আমরা রূপ-রহস্যের প্রথমেই বলিয়াছি। কিন্তু এই রূপ কি ব্রহ্মের প্রকৃতরূপ, অর্থাৎ উপাসকের হিতের নিমিত্ত এক ব্রহ্মই কি উক্ত নানা রূপ অবলম্বন করিয়াছেন, কিম্বা মানবেই রুচিভেদে তাহার নানা রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই এরূপ একটা কুতর্কের স্রোত চলিয়া আসিতেছে।

শাস্ত্রে আছে— "উপাসকানাং হিতায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই বচন দেখিয়া কেহ কেহ বা কেবল ভাবে বিভোর হইয়া নিজ নিজ মার্জিত হৃদয়ের বিশ্বাসে বলিতেছেন, রূপটা কেবল মানুষেরই কল্পিত। ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না।

"ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই কল্পনা শব্দ দেখিয়া যাহারা স্থির করিয়াছেন যে ব্রহ্মের রূপ মানুষের কল্পিত, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা এ স্থলে ব্রহ্মণঃ এই ষষ্ঠী সম্বন্ধে নহে। কৃদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী হইয়াছে। সুতরাং উপাসকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম কর্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব রূপ মানুষের কল্পিত নহে। উপাসককে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, সাধুগণের পরি-

ত্রাণের নিমিত্ত, অসুরপ্রকৃতি পাপীর বিনাশের নিমিত্ত, ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত, দেবতাদিগের কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এক ব্রহ্মই নানা রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। কত কত সিদ্ধ পুরুষ এই সকল সিদ্ধ রূপের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দেখিবার উপযুক্ত পাত্র—প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, তাঁহারা দিব্য চক্ষে এইরূপ-মাধুরী দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে ভগবানের অনন্ত রূপ দর্শন করিয়া ভীত চকিতভাবে বিস্মিতচিত্তে করযুটে বলিয়াছিলেন প্রভো! তোমার অনেক নয়ন, অনেক মুখ, অনেক মস্তক, অনেক অদ্ভুত দর্শন, সকল দিকেই তোমার অনন্তরূপ দেখিতেছি। বিশ্বরূপ! পূর্ব্বে তোমায় সখা ভাবিয়া কত অপরাধ করিয়াছি, আজ তোমার দুর্দ্দর্শন রূপ দর্শনে ভয় হইতেছে; ক্ষমা কর, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার করি। এই বলিয়া কত স্তব করিয়াছিলেন।

শুম্ভ দৈত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে রণক্ষেত্রে মহাশক্তির অনন্তরূপ-দর্শনে বলিয়াছিলেন দুর্গে! এ কি, তোমার একা যুদ্ধ করিবার কথা, এখন দেখি অনন্ত মূর্ত্তি রণক্ষেত্রে উপস্থিত! তখন জগদম্বা হাঁসিয়া বলিলেন, কৈ, আমিতো একাই বাট, আমি ভিন্ন জগতে আর কোথায় কি আছে? এই বলিয়া সেই অনন্তরূপিণী আদ্যাশক্তি সমস্ত শক্তিকে আত্মদেহে লুক্কায়িত করিলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ সুরথ সমাধি প্রভৃতি সাধক গণও আরাধ্য দেবতার রূপ দর্শনে কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তোমার আমার পাপ চক্ষে দেখিনা বলিয়াই যে রূপ কল্পিত, ইহা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, তিনি রূপ অবলম্বন করিতে অক্ষম, এ কথা বলিলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করিতে হয়। নিরাকার বাদিন্! পুরাণাদি শাস্ত্র চিরদিনই তোমার চক্ষুঃশূল। প্রক্ষিপ্ত আর কল্পিত এই দুই কথা তোমার আত্মারামের কাটী। এই কাটির বলে তুমি ভূরি ২ শাস্ত্রকে আকাশে উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাই তুমি হয়তো বলিবে শাস্ত্রের সকলই কল্পনা। প্রহ্লাদ ধ্রুব সুরথ অর্জ্জুন প্রভৃতির রূপ দেখাও কবিকল্পনা, ঈশ্বরের রূপ থাকাও কবিকল্পনা। রূপ কল্পনা হইলে কালী, দুর্গা, শিব, হরি, দয়াময়, মায়াময়, প্রভৃতি নামগুলিও অবশ্য কবিকল্পিত। ইহাতে কিন্তু তোমারও অব্যাহতি থাকে না। তুমিও মাঠে মারা যাও।

দ্বিতীয়তঃ তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম, রূপ দেখাও মিথ্যা, থাকাও মিথ্যা, শাস্ত্রের সকলই যেন মিথ্যা, কেবল তুমি যাহা বল তাহাই যেন সত্য, রূপ যেন মানুষের কল্পিতই হইল, কিন্তু তাহাতেওতো সাধকের কোনও হানি দেখিতে পাইনা। এই কল্পিত রূপে যদি উপাসকের বিশ্বাস থাকে, তবে তাহাতেই উপাসকের কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। অন্ধকারি রাত্রে নির্জ্জন স্থানে কোন কোনও সময়ে কেহ কেহ বৃক্ষাদিতে ভূতের বা মৃত মানুষের আকৃতি বোধ করিয়া থাকে। তখন ক্রমে ২ সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখাদিতে হস্ত পদাদি কল্পিত হইয়া যখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তখন প্রকৃত ভূত-দর্শনের যে ফল, ঐ কল্পিত ভূত দর্শনেও অবিকল সেই ফল উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন তাহার স্বর-বিকৃতি, কম্প, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। আবার যখন স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসহবাস হয়, তখন তো সকলই মিথ্যা। খাট মিথ্যা, শয্যা মিথ্যা, স্ত্রী মিথ্যা, কেবলই মনের কল্পনা মাত্র। কিন্তু তাহার ফল হয় সত্য। প্রকৃত স্ত্রীসহবাসের যে ফল, তাহাতেও রেতঃ-পাত রূপ সেই ফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতেছি, বিশ্বাস থাকিলে কল্পনার ফলও সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন রূপ কল্পিত

হইলেও তাহাতে বিশ্বাস থাকিলে উপাসকের কেন কার্য্য সিদ্ধি হইবে না ? এই জন্য মনস্তত্ত্ববিৎ মহাযোগী মহর্ষিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসন্নিধির্ভবেৎ"। বিশ্বাসী ভক্তগণও বলিয়া থাকেন "বিশ্বাসে পাইবে তাঁরে তর্কে বহুদূর" অতএব আমরা যে দিক্ দিয়া কেন দেখিনা, কিছুতেই সাকারোপাসনার বিফলতা দেখিতে পাইনা। এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, সাকারোপাসনা প্রতিপাদন করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। তবে কিনা রূপ-রহস্যের মূল ভিত্তিই রূপ। সেই ভিত্তির সারবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত এবং বাবুদের রুচি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

পূজা রহস্য।

রূপরহস্যে পূর্ব্বখণ্ডে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি শ্যামা রূপে এত গূঢ় তত্ত্ব থাকে, তবে আমরা পূজা করি কাহার ? শবশিবারূঢ়া শ্যামা যদি প্রকৃতি পুরুষাত্মিকা জগদীশ্বরী হন, তবে আমরা আবাহন বিসর্জ্জন করি কাহার ? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। যিনি সর্ব্বব্যাপিনী, প্রতি পরমাণুতে যাঁহার সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন, তাঁহার আবার আবাহন বিসর্জ্জন হয় কি রূপে ? "ইহাগচ্ছ" বলিলেই বোধ হয় যেন এ স্থানে তিনি নাই, অথবা সর্ব্বত্র যিনি আছেন, আমি যেন তাঁহাকে ডাকিতেছি না। তাই বলি তবে আমরা পূজা করি কাহার ? দ্বিতীয়তঃ আমরা বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করি কাহাকে। যিনি বিবসনা, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যাঁহাকে কখনও কেহ আবরণ করিয়া রাখিতে পারেনা, তাঁহার আবরণার্থে ৭।৮ হাত বস্ত্র প্রদান করায় কি অজ্ঞানতার পরিচয় প্রদান করা হয় না। তৃতীয়তঃ কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রোম কূপে অবস্থান করিতেছে, সেই অনন্ত জগতের আধার রূপিণীর স্নানার্থে এক কুশী জল দান করা কি বালকের ধূলা খেলার ন্যায় নহে। চতুর্থতঃ যিনি পূর্ণ, যাঁহার কোনও অভাব নাই, যিনি কত উপাদেয় বস্তু দ্বারা জীব জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রদান করায় কি উন্মত্ততার পরিচয় প্রদান করা হয়না ? বিরুদ্ধ বাদী দিগের মধ্যে কেহ বক্তৃতায় কেহ প্রবন্ধে কেহ বা গানে এই রূপ নানা কুতর্ক দ্বারা হিন্দুর পূজাপদ্ধতির কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। রাম মোহন রায়ের একটী গান আছে—

> মনরে ভ্রান্তি তোমার, আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার,
> যে বিভু সর্ব্বদা থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে
> ইত্যাদি।

এই সকল বালকভুলান কথায় পূর্ব্বে ২ অনেকের মন ফিরিত বটে; এখনও হয় তো অনেকের মনে সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা, অতএব পূজা প্রণালীর স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে। অগ্রে আবাহনের কথাই বলিতেছি।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বটেন, তিনি কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণু ব্যাপিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন বটে, কিন্তু আমি সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড লইয়া তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিতে পারি কোথায়। শাস্ত্রে শুনি তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাই পড়া পাখীর ন্যায় মুখে মাত্র বলি, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু আমাদের জ্ঞান তাহা বুঝিয়া লইতে পারে কোথায় ? আমার মনই বা সেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভাব লইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে কোথায়। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব যে দিন মনে মুখে বুঝিব, আর যে দিন সেই সূক্ষ্ম ভাবে তৃপ্ত হইয়া নিবিড়ানন্দ লাভ করিতে পারিব, সে দিন কেবল আবাহন বিসর্জ্জন কেন উপাস্য-উপাসক-ভাব পর্য্যন্ত থাকিবে না। সে জ্ঞান নাই বলিয়া, সেই সূক্ষ্ম ভাবে তৃপ্তি হয় না বলিয়া স্থূল ভাবে আবাহনের প্রয়োজন।

বায়ু সর্ব্বব্যাপী, বায়ু সর্ব্বত্র না থাকিলে আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিতাম। সুতরাং আমরা বায়ু-সাগরে হাবু ডুবু খাইয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু তথাপি যখন বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন সময়ে শরীর জ্বলিয়া যায়, মন অস্থির হইয়া উঠে, প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তখন আর সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়ুতে কুলায়না. তখন, আর তাহাতে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটেনা. প্রাণের পিপাসা ফুরায়না, দেহের উত্তাপ জুড়ায়না, তখন মন প্রাণ চায় স্থূল বায়ু। তাই আমরা পাখার বাতাস করি। বায়ু সর্ব্বত্র থাকিলেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া থাকি। সেই রূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র থাকিলেও যখন পাপে তাপে আমাদের দেহ প্রাণ জ্বলিয়া যায়,. মন ছট্ ফট্ করিতে থাকে,.রোগে শোকে ভয়ে অনুতাপে আমরা যখন অস্থির হইয়া পড়ি, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি, তখন আর সেই দর্শনিকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্রহ্মে কুলায় না। তখন মন প্রাণ চায় সেই জগজ্জননীকে, যাঁহার রাঙ্গা চরণ হেরিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব, যাঁহার অভয় করের আশ্বাসে ভবভয় দূর হইয়া যাইবে। যাঁহার করাল কৃপাণের শাসনে কামাদি অসুর নির্য্যাতন করিতে পারিব, মন প্রাণ চায় সেই মূর্ত্তিমতী মাকে। মায়ের সূক্ষ্ম ভাবে সত্ত্বা সর্ব্বত্র থাকিলেও বায়ু-আকর্ষণের ন্যায় উপাসনা-কালে সাধক স্থূল ভাবে জননীকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আবাহন করিয়া থাকেন। সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে কিছুতেই ইহা দোষের বিষয় হয় না। যাঁহারা নিরাকারের রাঙ্গাচরণ শীতল ক্রোড়-প্রার্থী, তাঁহারাও তো বলেন প্রভো! তোমার রাঙ্গাচরণ দেও, শীতল ক্রোড়ে স্থান দেও ইত্যাদি। যিনি সর্ব্ব-ব্যাপী, তাঁহার রাঙ্গাচরণ, শীতল ক্রোড় তো সর্ব্বদাই তোমার মনঃ-প্রকৃতির প্রতি পরমানুতে লাগিয়া রহিয়াছে, নচেৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী নহেন। তবে আর তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর কেন ? কিন্তু হিন্দুরা ইহা দোষ-বুদ্ধিতে দেখেন না, যাহাদের বুঝিবার ভুল, তাহারাই কেবল পরের দোষ-কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়।

কঠোর যোগ সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়। মুখ্যযোগ সাধন (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন) সংসারাসক্ত ব্যক্তির হয় না। যাহারা গৃহস্থাশ্রমী. যাহাদের ধন জন বধূ বন্ধ্বাদিতে মমতা—আসক্তি রহিয়াছে. সেই সকল দুর্ব্বলাধিকারীর উদ্ধারের নিমিত্ত যোগাঙ্গসমূহের কিছু কিছু অংশ লইয়া তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রে পূজা পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে। এই পূজা বিধানে ভক্তিযোগ. মন্ত্রযোগ; ধ্যানযোগ, কর্ম্মযোগ, লয়যোগ এই পাঁচটী যোগই পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং এই পূজা দ্বারা সাধক ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে যে প্রাণায়াম করিতে হয়, সেই প্রাণায়াম দ্বারা দেহ সুস্থির হয়, ইন্দ্রিয় মন নিশ্চল হয়, ধ্যানধারণায় সামর্থ্য হয়, যক্ষ্মাদির রোগ বিদূরিত হয় ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের নাম অজপা। এই অজপার একটা সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যা পূর্ণ হইলেই জীবের জীবন বাহির হইয়া যায়। কুম্ভক দ্বারা শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিলে অজপার সংখ্যার ন্যূনতা হয় বলিয়া প্রাণায়ামে আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর্য্যঋষিদিগের আহার বিহারের কিছু মাত্র পারিপাট্য ছিলনা. তাঁহারা অনশনে পর্ণাশনে বনে বনে শীত বাতাতপ সহ্য করিয়াও কেবল প্রাণায়ামের বলে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা অষ্টপ্রহর পুষ্টিকর বস্তু ব্যবহার করিয়াও প্রাণায়ামের অভাবে দিন দিন অল্পসত্ত্ব অল্পায়ুঃ হইয়া যাইতেছি।

পূজাগ্রে যে ভূতশুদ্ধি করিতে হয় উহা এক প্রকার কঠোর যোগ সাধন-বিশেষ * তার পর অঙ্গন্যাস, কর-

* এই ভূতশুদ্ধিতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ২৩টী তত্ত্বকে ক্রমশঃ পর পর তত্ত্বে লয় করিতে করিতে পরম তত্ত্ব পরমাত্মার সমস্ত তত্ত্ব লয় করিয়া

ন্যাস ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতি আরও কতকগুলি ক্রম আছে।* এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সুস্থির ও নির্ম্মল হইলে সাধক শ্যামাপূজার অধিকারী হন। †

ইহার পর ধ্যানের ব্যবস্থা। হৃৎপদ্মে ইষ্ট দেবতার রূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারেন, মৃত্যু সময়ে রূপ ধ্যান করিয়া প্রাণ বহির্গত হইলে সারূপ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, এইরূপে বহু দৃষ্টান্তাদি দ্বারা যোগশাস্ত্রাদি এই ধ্যানের ভূরি ভূরি মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ধ্যানের পর শক্ত্যনুসারে কাহারও পক্ষে পঞ্চোপচারে, কাহারও পক্ষে দশোপচারে কাহারও পক্ষে ষোড়শোপচারে পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা মায়ের পূজার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে এই ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি থাকায় হিন্দুর পূজা পদ্ধতিকে অনেকেই উপহাস করিয়া বেড়াইতেছেন। যিনি অনন্ত জগতের কর্ত্তা, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, হিন্দুরা তাঁহাকে সামান্য তণ্ডুলাদি দ্বারা বাধ্য করিতে চায়, ইহা আপাততঃ উপহাসের বিষয় বলিয়াই বোধ হয় বটে। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্রের একস্থানে আছে যে রাজা রামমোহন রায় এক দিন প্রত্যূষে নিজের পুষ্পোদ্যানের সম্মুখে পাদচারণা করিতে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ইষ্টপূজার নিমিত্ত প্রতিদিনই সেই উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে যাইতেন, সে দিনও গিয়াছিলেন। রাজা উদ্যানের দ্বারদেশে একটী স্তম্ভের উপরে ঐ ব্রাহ্মণের একখানী নামাবলি দেখিতে পাইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত তাহা স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বস্ত্র না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন কোথাও না পাইয়া ব্রাহ্মণ হতাশ্বাস হইলেন, তখন রামমোহন রায় বস্ত্র খানি দিয়া বলিলেন, লও ঠাকুর! এখন তো সন্তোষলাভ করিয়াছ। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার বস্ত্র আমি পাইলাম, ইহাতে আর সন্তোষ লাভ করিব কেন? রাজা বলিলেন ইহা যদি তুমি বুঝ, তবে ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দাও, ইহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন কেন?

এই রূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হিন্দুর উপাসনার উদ্দেশ্য বিন্দু মাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবেন, হিন্দুরা ঈশ্বরের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্তই তাঁহাকে নানা প্রকার বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা হিন্দুর উপাসনার পদে ২ নিন্দা করিয়া থাকেন। উপাসনা যে ঈশ্বরের উপকারের নিমিত্ত নহে, একথা নিতান্ত মূর্খেও অনুভব করিতে সক্ষম। সুতরাং হিন্দুরা ঈশ্বরকে যাহা দেয়, তাহা ঈশ্বরের উপকারের নিমিত্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত কিম্বা তাহার কোনও অভাব দূর করিবার নিমিত্ত) নহে। উহা কেবল নিজের ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর পূর্ণ—নিষ্কাম, ইহা আর্য্যঋষিগণই

---

* কতকগুলি বীজমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম পূর্ব্বক যৌগিক বিধানানুসারে বিশুদ্ধ নূতন দেহ প্রস্তুত করিতে হয়। এই ক্রম দীক্ষিত মাত্রে অবগত আছেন, অদীক্ষিতের পক্ষে কর্কশ বোধ হইবে বলিয়া এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না।

† অনুষ্ঠান গুলি সহজসাধ্য নহে। সুতরাং সকল স্থলেই যে শ্যামাপূজা হয় ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা। সকলের অধিকার নাই বলিয়া গুরু পুরোহিত দ্বারা পূজা করিবার বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে। কালমাহাত্ম্যে অনেক গুরু পুরোহিতও আমাদের ন্যায় হীনশক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা ব্যক্তিগত দোষ। ব্যক্তিগত দোষ সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই আছে। ব্যক্তিগত দোষ আমাদের সমালোচ্য নহে, শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব দেখানই—এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে ক্রিয়ানুষ্ঠানে যিনি যত অধিকারী, তাঁহার পূজা তত দূর ফলবতী হইবার সম্ভাবনা। যিনি কেবল ব্যবসা রক্ষার নিমিত্ত কিম্বা বাহ্যাড়ম্বর দেখাইয়া সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা প্রায়ই নিষ্ফল বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের আবিষ্কৃত পূজায় ঈশ্বরে যাহা সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত নহে, ঈশ্বরে নিজের প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমাদের আসক্তি ভালবাসা সমস্তই সংসারের দিকে। ঈশ্বরে কিছুই আসক্তি ভালবাসা নাই। এ দিকে নিজের সম্পত্তিও কিছুই নাই। দেহ, মন, প্রাণ, ফল, মূল, ফুল সকলই ঈশ্বরের। হিসাব করিয়া দেখিলে আমার আমিত্বে পর্য্যন্ত অধিকার থাকেনা। তবে আর অন্য বস্তুতে অধিকার থাকিবে কিরূপে? তাই উপায় নাই বলিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দিয়াই হিন্দুরা নিজের ভক্তি বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহাতে উপহাস করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকেও স্তবস্তুতি দ্বারা কিম্বা সুললিত গান দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখা যায়। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে ঈশ্বর যে রূপ ফল মূলের কাঙ্গাল নহেন, তাহাতে যেরূপ তিনি ভুলিবার পাত্র নহেন, সেইরূপ দুটো মিষ্টি কথায়ও তো তিনি ভুলিবার পাত্র নহেন, তিনি যে তিরস্কার পুরস্কার-বিবর্জ্জিত। মিষ্ট কথায়ও তুষ্টি লাভ করেন না, আর কটু কথায়ও বিরক্তি বোধ করেন না। তবে তোমার স্তবস্তুতি দ্বারা খোশামুদী করাও তো হিন্দুর ফলফুলদানের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলি, একটু তলাইয়া বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে মিষ্ট কথায় ঈশ্বরের সন্তোষ উপকার না হইলেও আমাদের তাহাতে যথেষ্ট উপকার আছে। আবার ঈশ্বরকে গালাগালি করিলে তিনি তাহাতে রুষ্ট না হইলেও আমাদের তাহাতে মহাপাপ মহাপকারের সম্ভাবনা।

তবেই দেখ, ঈশ্বরের স্তবস্তুতি আর গালাগালী ঈশ্বরের তুষ্টি রুষ্টির কারণ নহে। উহা জীবের নিজের উপকার অপকারের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং ফলমূলাদি ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে ঈশ্বর তাহাতে তুষ্টিলাভ না করিলেও যে দেয় তাহার তাহাতে উপকার হইয়া থাকে। তাহার ভক্তি প্রেম একাগ্রতা আসক্তি পরিপূর্ণ হইয়া আত্মোন্নতি লাভ হইয়া থাকে। আর যে তাহা দেয়না, তাহার আত্মোন্নতি লাভও হয় না। ইহা ঈশ্বরের সেবার ফল, ঈশ্বরের তুষ্টি রুষ্টি-সাধনের ফল নহে।

হিন্দুর সঙ্কল্প "ঈশ্বর প্রীতি কামনয়া" ইহার অর্থ ঈশ্বরের প্রীতি নহে। ঈশ্বরে নিজের প্রীতি নিজের ভালবাসা হওয়াই হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যাহারা উদ্দেশ্যজ্ঞান রহিত, তাহারাই হিন্দুর উপাসনার নিন্দা করিয়া বেড়ায়, আর যাঁহারা চিন্তাশীল ভক্ত, তাঁহারা পাদ্যাদি দ্বারা মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ।

বিসর্জ্জন। *

লোকে অনেক বিষয় শুনিতে চায়—অনেক বিষয় দেখিতে চায়। যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়া লয়, যাহা দেখিবার নহে তাহা শুনিয়া লয় কিন্তু যাহা অতি উপাদেয়, তাহা লোকের দেখিবারও ইচ্ছা হয়—শুনিবারও অভিলাষ হয়। আজ আমার বক্তব্য বিষয় শুনিতে আসিয়া মহাত্মাগণ এই পুণ্য তীর্থ দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গার তটে দাঁড়াইয়া মা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দেখিবেন ও আমার বক্তব্য "বিসর্জ্জন" শুনিবেন। মায়ের ভুবনমোহিনী রূপ "দেখিয়া" মনের যে তৃপ্তি

---

* কাশীতল বাহিনী ভগবতী ভাগীরথীর তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে—ভা, আ, ধ, প্র, সভার উৎসবোপলক্ষে শত২ নরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া গত জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের দিন কুমার-পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহারই মর্ম্মাংশ উদ্ধৃত হইল।

হইবে, আমার নীরস কথা শুনিয়া তত আহ্লাদ হইবার আশা নাই। শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন অধিক প্রীতিকর, তাই লোকে অদ্ভুত বিষয় শুনিবা মাত্র দেখিতে চায়। দেখিলে যেমন বিষয়টি মর্ম্মে অঙ্কিত হয়, শুনিলে তত হয় না। কিন্তু অগ্রে না শুনিলে, দর্শনের সুখ হয় না, দুর্ভেদ্য তত্ত্ব বিদিত না হইলে, দর্শন করিলেও পদার্থের সার মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন হয়—তাই অগ্রে শুনিতে হয় ও পশ্চাৎ দেখিতে হয়। "শ্রোতব্যং মন্তব্যং নিদিধ্যাসিতব্যং পশ্চাৎ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যম্"।

যাহা দেখিবার, তাহা দেখায় কে? যাহা বুঝিবার তাহা বুঝায় কে? সপ্তর্ষি মণ্ডলী একবার ত্রিজগদ্গুরু কৈলাসপতির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিবার জন্য গিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান্ বলিলেন, তোমরা সমাহিত চিত্তে বসিয়া তত্ত্ব বিষয় শ্রবণ কর। তাঁহারা সমাধিপূর্ব্বক বসিলেন, বিশ্বনাথও সমাহিত হইলেন। জগতের কাহারও কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না, কি জানি কোন্ স্বরে কোন্ ভাষায় কি রূপে মহাদেব কি বুঝাইলেন, ক্ষণবিলম্বে সকলে উঠিয়া আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য—উল্লাসে অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরা জগতের ক্ষুদ্র জীব এ গুপ্ত কথার গুপ্ত প্রহেলিকা বুঝিতেও পারি না—বুঝাইতেও জানি না। সমাধিসূত্রের ভিতর দিয়া যাঁহারা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এ নিগূঢ় কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইবেন। আমার কথা শুনিয়া সুখী হইবার কাহারও আশা নাই।

আজ প্রথমে পূজার বাদ্য না বাজাইয়া একেবারে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইলাম কেন! পূজা না হইতেই বিসর্জ্জন, একথা নূতন। আমরা কলির জীব। পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জন আমরা অধিক ভাল বাসি, তাই বিসর্জ্জনকালে ঘাটে এত ধুম—এত লোক সমাগম। সে দিনও তো মা দশভুজার পূজা হইয়া গেল। পূজাবাটীতে মাকে দেখিতে মায়ের পূজা করিতে—মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে কয় জন লোক গিয়াছিল! কিন্তু প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন গঙ্গার ঘাটে ২ অগণ্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তাই ভাবিলাম—আজকাল আমরা পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জন যখন অধিক ভাল বাসি, তখন পূজার কথায় আর কাজ নাই, একেবারেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া দিই। মা যেন বিদায় হইলেই আমরা বাঁচি। ভক্ত যাঁহার চরণ পূজা করিবেন বলিয়া সম্বৎসর কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া আয়োজন করেন, আমরা তাঁহার বিসর্জ্জনের দিন সুসজ্জিত হইয়া ঘাটে মঠে তটে দাঁড়াইয়া থাকি। একেতো আমরা বিসর্জ্জন ভালবাসি—তাহাতে আবার সকলে কাশীনিবাসী। কাশী—আনন্দ কানন হইলেও মহাশ্মসান। লোক সকল দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়াই কাশীতে আসে। কাশীতে শরীর বিসর্জ্জিত হইলে লোকে পুনর্ব্বিসর্জ্জনের দায় হইতে এড়াইয়া যায়। অন্য দেশে যে দেহা বিসর্জ্জন গাল গালি, এখানে তাহাই পরম মঙ্গল। সুতরাং কাশীতে পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জনের সম্মান অধিক। তুমি পাপ তাপের দুর্ব্বহ ভার লইয়া জরাজীর্ণ দেহে কাশী আসিলে—বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার পূজা করিতে পার আর নাই পার, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জলে স্থলে বা অন্তরীক্ষে অথবা যে কোন অবস্থায় এখানে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই তোমার আর জনন মরণের বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবেনা, কীট পতঙ্গ তীর্য্যগাদি যে যোনিতে হউক এখানে একবার দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলে আর তাহার বিসর্জ্জনের ভাবনা ভাবিতে হয় না, তাই বলিতেছি এই বিশ্বনাথ-পুরীতে বিসর্জ্জনেরই মান অধিক। যেখানে বা যে কুলেই জীব জন্ম গ্রহণ করুকনা কেন, এই খানে মরিলেই আর জন্মিতে হয় না।

"জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু জীবিতা।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥"

তাহারাই জগতে জন্মিয়াছে ও তাহাদের জীবনই

সাধু, যাহারা আর জন্ম গ্রহণ করিবে না। যাহাদিগকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারা গর্দ্দভী গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় ভার বহন করিতে আসে মাত্র। অতএব বিসর্জ্জন যদি এই অবিমুক্ত ধামে হয়, তবে তদপেক্ষা পূজাও শ্রেয়স্কর নহে। কেননা বহু যোগ যাগ পূজা পাঠ তপস্যাদিতেও যে "নির্ব্বাণ" সাধিত হয় না, কেবল কাশীতে দেহ বিসর্জ্জনেই তাহা অবাধে হইয়া থাকে। তাই বলি কাশীতে বিসর্জ্জনই প্রধানতম বিষয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে—

অষ্টাঙ্গাদিভিরন্যৈশ্চ তপো যজ্ঞ ব্রতাদিভিঃ।
সাধিতৈঃ পাক্ষিকী সিদ্ধি রবিমুক্তে নিরর্গলা॥"

মা নাকি সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে, আদি অন্ত ও মধ্যে বিরাজমানা, মার নাকি যাওয়া আসা নাই—স্থিতি মাত্রই মায়ের নাকি প্রতিমা, তাই মাকে বিসর্জ্জন দিলেও আবার আমরা বর্ষে বর্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যখন দেখি, আমাদের আঁধারময় হৃদয়াধারে মাকে আর রাখিতে পারিতেছি না, যখন দেখি হৃদয়-পটে—মায়ের চিত্র আর সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না—তখন মনের দুঃখে শোকে অশান্তিতে অধীর হইয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার মত বলিয়া থাকি—

"গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছ দেবি! যদৃচ্ছয়া।
সম্বৎসরে ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ।

মাকে রাখিতে না পারিলেও ছাড়িতে চাই না, তাই বর্ষে বর্ষে ডাকিতে থাকি। মায়ের বিসর্জ্জন—তিরোভাব না থাকিলেও আমাদের দুর্ব্বল মনে তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। তাই তাঁহার আবাহন ও বিসর্জ্জন। যত দিন না ব্রহ্মাত্মবোধ দ্বারা মায়ের তৈল ধারার ন্যায় নিত্য নিরবচ্ছিন্ন একরস বিদ্যমানতার প্রবাহ না চলিবে, ততদিন আবাহন বিসর্জ্জন হইতে থাকিবে। যতদিন বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, বিষয়-বুদ্ধি প্রমাদাদি থাকিবে, ততদিন আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতেই হইবে। যাঁহারা বলেন "মনরে ভ্রান্তি তোমার—আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার" সেই বাঙ্‌মাত্র বাদী প্রমাদীগণ কি নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মারাধনা করিয়া থাকেন? যিনিই উপাসনা করিতে বসেন ও আবার উপাসনা করিয়া উঠিয়া গিয়া অন্য কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনিইতো বাক্যে না মানিলেও কার্য্যে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিলেন, উপাসনার প্রারম্ভ কালই তাঁহার আবাহন, আর উপাসনা ছাড়িলেই তাঁহার বিসর্জ্জন—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেই তাঁহার বিসর্জ্জন। অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেই তাঁহার বিসর্জ্জন। আমরা পূজা করি আর নাই করি, বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় হইলেই মানব বিসর্জ্জন-প্রিয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মহর্ষি-রাজর্ষি মুনি ও গুণীগণ সত্যযুগে বেদমন্ত্রে যে ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, ত্রেতাতে কঠোর তপোযোগে যাহার প্রতিষ্ঠা ও মহাপূজা হইয়াছিল, দ্বাপরে যাহার পরিচর্য্যায় ভারতবাসী মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, কলিযুগে আমরা অবোধ অজ্ঞানী মানবগণ তাহারই বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যে যাহার আয়োজন করিতে হয়, গার্হস্থ্যে যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বানপ্রস্থে যাহার রসাস্বাদ করিতে হয় এবং সন্ন্যাসে যাহার পরিপাক করিতে হয়, আমরা না বুঝিয়া না বিচারিয়া তাহাই বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। মহাতেজা ব্রাহ্মণগণ যে দেবদুর্লভ মহাপূজার জ্বলন্ত জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, শূরবীর প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় বর্গ শৌর্য্য-বীর্য্য সুকার্য্য দ্বারা যাহা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, নিজোচিত নিষ্ঠাপরায়ণ বৈশ্যবর্গ যাহার পালন-ভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং শূদ্রগণ যে মধুর হইতে সুমধুর অমৃতময়ী কল্পলতিকার সুচারু চরণের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, আমরা সেই কল্পলতা উৎখাত করিয়া কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। আর্য্য-

কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আর্য্য দিগের প্রাণাৎ প্রিয়তর সামগ্রীকে বিসর্জ্জন করিতে আসিয়া—মায়ের বিসর্জ্জন-বাদ্য শ্রবণ করিয়া হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে। তাই বলি, চতুর্ব্বর্ণাশ্রমিগণ! প্রাণের পুত্তলিকে—সাধের সামগ্রীকে—শাস্ত্রের বিধি বোধিত রীতিনীতি ও কর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের ন্যায় ইহা পুরাতন হইলেও অতি অদ্ভুত—অতিবিস্ময়জনক ও পরম সিদ্ধিদায়ক। নব্যচাক্‌চিক্যময় হাবভাব-বিলাসময় যৌবন-রঙ্গ-তরঙ্গ-ভুজঙ্গময় প্রদীপের পরিবর্ত্তে যেন সেই পুরাতন জ্বলন্ত দীপ বিসর্জ্জন করিও না। আবার ভাবি, আমরা বিসর্জ্জন না দিলেও আমাদের দুর্দ্দশাদোষে আমাদের দৌর্ব্বল্যদোষে আমরা রাখিতে পারিনা বলিয়া মা বুঝি আপনিই চলিয়া যাইতেছেন।

সাধু মুখে শুনিয়াছি, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনার একটি মাত্র কন্যাকে একজন সম্পত্তিশালী ক্ষিতি-পাল-পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহে ব্রাহ্মণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বড় ভক্তিমান্ ছিলেন; সম্বৎসর ভিক্ষা করিয়া যথা কথঞ্চিৎ দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন ও শরদাগমে বর্ষে বর্ষে আর কিছু দিতে পারুন বা নাই পারুন, মনঃপ্রাণ ও চক্ষের্ প্রেমাশ্রু জল দিয়া সচন্দন বিল্বদলে মায়ের চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বয়ং পূজা করিতেন ও ব্রাহ্মণী ভোগ পাক ও অন্যান্য আয়োজন করিয়া দিতেন। একবার পূজার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণীর অতিশয় পীড়া হইল, ভোগরাগাদি প্রস্তুতির নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিয়া আকুল হইলেন, সম্বৎসরের বাসনা পাছে অসিদ্ধ হয় এই জন্য ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন, মা! দুঃখী বলিয়া কি আমার ঘরে আবির্ভূত হইবে না? আবার ভাবিলেন চিন্তা কি! এবার কন্যাটিকে লইয়া আসি, তবেই সমস্ত সুসম্পন্ন হইবে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বৈবাহিকের ভবনে গমন করিলেন এবং কন্যাটীকে এবার পূজার সময় পাঠাইতে হইবে এই প্রার্থনা বৈবাহিকের নিকট করিলেন। ধনমদ-গর্ব্বিত ভূস্বামী সম্পর্ক ভুলিয়া ভক্তের মনের ঐকান্তিক বাসনার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও তিরস্কার পূর্ব্বক বলিল; তোমার দুঃসাহস বড়! তোমার তৃণকুটীরে একটু সামান্য পূজা দেখিবার জন্য হাত পোড়াইয়া ভোগপাক করিবার জন্য পরিচারিকা-পরিসেবিতা রাজকুলবধূ রাজ গৃহের অতুল আনন্দময়ী পূজা না দেখিয়া বাটীতে কত আমোদ প্রমোদ হইবে, তাহা না দেখিয়া দীন হীনার ন্যায় তোমার বাটীতে গমন করিবেন! কখনই নহে, তুমি দ্বিতীয় বার একথা উচ্চারণ করিও না। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিল—তথা হইতে ব্রাহ্মণ অমনি উঠিলেন, বাহিরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা! তবে কি এবার শ্রীপাদপদ্মে বিল্বদল গঙ্গাজল দিতে পাইব না! মা দাসের আশা কি পূরাইবে না, মা দীনদয়াময়ি! আমার তুমি বই আর কেউ যে নাহি মা। মা আর কি থাকিতে পারেন, ভক্ত ব্রাহ্মণকে রোরুদ্যমান দেখিয়া পথি মধ্যে একটি পুষ্করিণীর তটে দাঁড়াইয়া একটী সুসজ্জিতা মেয়ে—ঠিক তাঁহারই মেয়ের রূপে তাঁহার মেয়ের কণ্ঠ স্বরে বলিলেন—বাবা! তুমি কোথা গিয়াছিলে? ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন, যাহারই জন্য এত লাঞ্ছনা, সেই কন্যাই ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ দুঃখের তাবদ্বিবরণ কন্যাকে শুনাইলেন। কন্যা বলিলেন, বাবা, আপনি ভাবিবেন না। আমি চুপি ২ তোমার বাটী যাইব ও পূজায় ভোগ-পাক করিয়া দিব; আপনি বাড়ী যান্। ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া দেখেন—কন্যা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন ও রন্ধন-শালার যথাযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন মা! তুমি এত শীঘ্র কেমন করিয়া আসিলে! মা বলিলেন, বাবা আমি একটী গুপ্ত সোজা-পথ (ভক্তি মার্গ) ধরিয়া আসিয়াছি। মায়ের মায়া ব্রাহ্মণ

বুঝিতে পারিলেন না। আজ সদ্ভক্তকল্পলতিকা মা অন্নপূর্ণা ভক্তের মেয়ে সাজিয়া ভোগ পাক করিলেন। (বুঝি সাধকের সংসারের সমস্ত ভোগ পরিপাক করিবার জন্য মার আগমন হইয়াছিল!) নিমন্ত্রিতগণ প্রসাদ পাইয়া বলিল, এমন উপাদেয় অন্ন কখনই খাই নাই। তিন দিন কাটিয়া গেল, ৪র্থ দিনে মেয়ের সাজে মা দীনদয়াময়ী বলিলেন, বাবা! এখন তো তোমার কাজ (সাধন সিদ্ধি) হইয়া গেল, আমি চুপি ২ চলিয়া যাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কাঁদিতে ২ মাকে বিদায় দিলেন— মনঃপ্রাণ মায়ের পশ্চাতে ২ চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন. ব্রাহ্মণের চিরদিনের সাধ মিটিল—সংসার পাশ কাটিল!

অভাগা আমরা তাই না শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবিদ্যাকে জলাঞ্জলি দিতেছি—তাই না মা আজ দরিদ্রের কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন—রাখিতে কি পারিব না! মা যদি তিন দিন (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর) থাকিয়াই ৪র্থ দিনে (কলিযুগে) চলিয়া যাইবে, তবে মা! একটি বার সম্মুখে দাঁড়াও. একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই. একবার মা বলিয়া ডাকিয়া লই—প্রাণের সাধ মিটাইয়া লই। মা! তুমি বিসর্জ্জিত হইবার পূর্ব্বে আমরাই বিসর্জ্জিত হইব। তোমার বিসর্জ্জনের পর কি আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে! মা, তুমি বিদায় লইও না; তুমি থাক, আমরাই বিদায় লই. তুমি আবার নিজ ভক্তমুখে সুমধুর স্বরে তোমার পূজা পাঠ শ্রবণ কর। সভ্যগণ! এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

একনাথ-মহারাজ।

ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রী একনাথের কোন প্রকার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। ইহা লেখা বাহুল্য যে. তাঁহারা, যার পর নাই মনের কষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুত্র-শোকে কাতর ছিলেন। কিন্তু একনাথের প্রতি চাহিয়া সে শোক সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একে বৃদ্ধাবস্থা, তাহাতে আবার দৈন্যদশা। কোথায় তাঁহারা বাটীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিবেন, না তাঁহাদের উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতে হইল। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, একনাথের দ্বারা তাঁহাদের সকল অভাব দূর হইবে। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। কোথায় একনাথ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবেন এবং তাঁহার স্ত্রী রন্ধন ও অন্যান্য গৃহ কার্য্য করিবেন না এ অসমর্থ-অবস্থায় চক্রপাণিকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইল এবং তাঁহার স্ত্রীকে গৃহকার্য্য সমাধা করিতে হইল। এই ভাবে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। একনাথকে পুনরায় পাইবার আশা তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে. যে পৌরাণিকের সহিত একনাথ সদা সর্ব্বদা শাস্ত্রালাপ করিতেন, তিনি প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চক্রপাণি তাঁহার কাছে গমন করিলেন এবং একনাথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পৌরাণিক মহাশয় বলিলেন যে. একদা একনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জনার্দ্দন-পন্থের নিকট গমন করিবে। বোধ হয় একনাথ দৌলতাবাদে পন্থজীর কাছে অবস্থিতি করিতেছে ইহা শুনিয়া চক্রপাণি বলিলেন যে. তিনি নিজে দৌলতাবাদে যাইতে সমর্থ নহেন, আর তাঁহার অবস্থাও এমন নহে যে অর্থ-ব্যয় করিয়া তথায় কোন লোককে পুনঃ প্রেরণ করেন। সুতরাং একনাথকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। চক্রপাণির কাতর উক্তি গুলি শুনিয়া পৌরাণিক মহাশয় স্বয়ং দৌলতাবাদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া চক্রপাণির মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি পৌরাণিক মহাশয়কে সাধুবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে. তিনি যাবজ্জীবন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিবেন।

পৌরাণিক মহাশয় দৌলতাবাদে গমন করত

জনার্দ্দন পন্থের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্থজী তাঁহাকে সম্মানের সহিত নিকটে বসাইলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পৌরাণিক মহাশয় একনাথের কথা উত্থাপন করিলেন এবং তাঁহার অভাবে চক্রপাণি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে তাহা পন্থজীর সমক্ষে নিবেদন করিলেন। এই বৃত্তান্তটী শুনিয়া জনার্দ্দন পন্থ অতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং আশা জনক বাক্যে পৌরাণিক মহাশয়কে বলিলেন যে একনাথ সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করত তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আদেশ আছে, তীর্থাদি দর্শনের পর তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। অতএব তাঁহার পিতামহ ও পিতামহী যেন মনঃকষ্টে কালযাপন না করেন। পৌরাণিক মহাশয় বলিলেন যে, একনাথ কতকালে প্রত্যাগমন করিবেন তাহার ত কোন স্থিরতা নাই। তিনি যদি ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ দর্শন করেন, তাহা হইলেও কএক বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং তাহা হইলে চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রীর ক্লেশের এক শেষ হইবে। তাঁহারা ত্রয়োদশ বৎসর মহাক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছেন। এভাবে আর অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না। শোকে তাপে এবং অন্নাভাবে তাঁহাদের জীবন থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখনও যদি একনাথকে দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহারা কিছু কাল মনের আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন। এই সকল শুনিয়া জনার্দ্দনপন্থ বলিলেন যে, একনাথ এখন উত্তর দিকের তীর্থ সকল দর্শন করিতেছেন। যখন দক্ষিণ-দিকের তীর্থাদি দর্শন করিতে গমন করিবেন, তখন তাঁহাকে পৈঠন হইয়া যাইতে হইবে। যাহাতে একনাথ অন্যান্য তীর্থে গমন না করেন, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বলিয়া, জনার্দ্দন পন্থ একনাথের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তাহা পৌরাণিক মহাশয়ের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন যে, যখন একনাথ পৈঠনে আসিবেন এই পত্র খানি যেন তাঁহার হস্তে দেওয়া হয়। তিনি চক্রপাণির নামে আর এক খানি পত্র লিখিয়া পৌরাণিক মহাশয়ের হস্তে দিলেন। এই পত্র দুই খানি লইয়া পৌরাণিক মহাশয় পন্থজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত, পৈঠন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া চক্রপাণির হস্তে দুই খানি পত্র দিলেন এবং পন্থজীর সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। চক্রপাণি তাঁহার নিজের নামের পত্র খানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। এই পত্রে জনার্দ্দন পন্থ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা বাক্য লিখিয়াছেন এবং আশা দিয়াছেন যে একনাথের হস্তে অপর পত্র খানি দিলে তিনি আর অন্য তীর্থ দর্শনে গমন করিবেন না। চক্রপাণি পত্র খানি পাঠ করিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনের আনন্দে একনাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একনাথ দৌলতাবাদ ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নর্ম্মদা তীর্থ-দর্শন করত প্রয়াগে গমন করিলেন। তথা হইতে একে একে কাশী, অযোধ্যা, মথুর বৃন্দাবন, হরিদ্বার কেদার এবং বদ্রিনাথ দেখিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিলেন। পরে দ্বারকা, জুনাগড় ডাকুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া পৈঠন অভিমুখে গমন করিলেন। অন্যান্য তীর্থ-দর্শন করিতে হইলে পৈঠন হইয়া যাইতে হয়, এই নিমিত্ত একনাথকে তথায় যাইতে হইল। একনাথ কোন নগর বা গ্রামের ভিতর থাকিতেন না। তিনি অদূরে কোন দেবালয় কিম্বা ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিতেন, এবং কোন সাধু ব্যক্তির সন্ধান পাইবা মাত্র তাঁহার সহিত সদালাপে কালক্ষেপ করিতেন। পৈঠনের নিকটে আসিয়া তিনি একটী শিবমন্দিরে অবস্থিতি করিলেন। এই মন্দিরটী একনাথের অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যকালে তিনি সর্ব্বদাই এখানে আসিতেন এবং এই খানেই তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই দেবালয়ে অভ্যাগতদিগের ভোজনের কোন ব্যবস্থা

ছিলনা। এই নিমিত্ত একনাথকে নগরে গিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। একনাথের ইচ্ছা ছিলনা যে তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে কোন প্রকারে তাঁহাদের সংবাদ লইবার অভিপ্রায় ছিল। জনার্দ্দন পন্থের পত্র পাইয়া অবধি চক্রপাণি একনাথের সন্ধান লইতে লাগিলেন। যেখানে তীর্থযাত্রীগণ একত্রিত হইত সেইখানে গিয়া সন্ধান লইতেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আগমন-বার্ত্তা শুনিলে তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন। তাঁহার প্রতিবাসীদিগকেও সন্ধান লইবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং চারিদিকেই একনাথের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। একদা চক্রপাণি কোন দেবালয় দর্শন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। কিন্তু শরীর ক্লান্ত হওয়াতে তিনি এক গৃহস্থের বাটীর বাহিরে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে, সেই গৃহস্থের বাটী হইতে একনাথ ব্রহ্মচারীর বেশে নির্গত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন, মস্তকে জটাভার, এক হস্তে ভিক্ষার পাত্র এবং অপর হস্তে ত্রিশূল। চক্রপাণি একনাথকে দেখিয়া প্রথমে বিবেচনা করিলেন যে, ইনি একজন মহাযোগী হইবেন, পরে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করাতে বিবেচনা করিলেন যে, ইনি একনাথ হইতে পারেন। একনাথ কিয়ৎদূরে গমন করিলে চক্রপাণি একনাথ বলিয়া ডাকিলেন। একনাথ চক্রপাণিকে দেখিবা মাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন। কেবল ব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে তাঁহার নিকট নিজ পরিচয় দিলেন না। কিন্তু চক্রপাণির কাতর স্বর শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই চক্রপাণির নিকটে গমন করিলেন, এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। চক্রপাণি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন দিলেন। ইহার পর উভয়ে বসিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। চক্রপাণি একনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ প্রকার অবস্থায় তাঁহাদের রাখিয়া যাওয়া কি তাঁহার পক্ষে উচিত হইয়াছিল? একনাথ ইহার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি চক্রপাণিকে বলিলেন যে তিনিই তাঁহাদের এত ক্লেশের কারণ এবং এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর শিবালয়ে দৈববাণী শ্রবণ এবং জনার্দ্দন পন্থজীর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও দত্তাত্রেয়দর্শন এবং তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া চক্রপাণির মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। পরে চক্রপাণি একনাথকে গৃহে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া একনাথ বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের আজ্ঞা এই যে, তিনি সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। এখন দক্ষিণ দিকের কএকটা তীর্থ দেখা অবশিষ্ট আছে। ইহার প্রত্যুত্তরে চক্রপাণি কিছু না বলিয়া জনার্দ্দন পন্থের পত্র খানি গৃহ হইতে আনয়ন করত তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। পত্র খানির মর্ম্ম এই—তুমি পৈঠন ত্যাগ করিবার পর, তোমার পিতামহ ও পিতামহীর ক্লেশের এক শেষ হইয়াছে। তাঁহারা তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তোমার অভাবে তাঁহারা আশ্রয়হীন হইয়াছেন। একে তাঁহাদের বৃদ্ধাবস্থা, তাহার উপর আবার তাঁহাদের দৈন্য দশা। এ অবস্থায় তাঁহাদের তত্ত্ব লইবার ও সেবা করিবার কেহ নাই। এখন তাঁহাদের সেবা করাই তোমার পক্ষে প্রকৃত তীর্থ দর্শন। অতএব এই পত্র পাঠ মাত্র অপর স্থানে যাওয়া স্থগিত রাখিবে, এবং গৃহে অবস্থিতি করত তোমার পিতামহ ও পিতামহীর সেবা করিবে। গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া একনাথ তীর্থ-দর্শন স্থগিত রাখিলেন, এবং তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই সেবাব্রত সমাধার

পর যে সময় পাইতেন, তাহা পৈঠন বাসীদের উপকারার্থে অতিবাহিত করিতেন।" যে স্থানে তাঁহার পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থানে একনাথ একটী সামান্য মঠ প্রস্তুত করিয়া ভজন কীর্ত্তন এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পৈঠন বাসীগণ আনন্দের সহিত তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিতে লাগিল। ক্রমে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, স্থানের সঙ্কুলান হইত না, [illegible] সকলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। এই মন্দিরটী নাথ-মন্দির নামে বিখ্যাত হইল। একনাথের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল। নানা স্থানের লোক তাঁহার কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। বিজয়পুরের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার দুহিতাকে একনাথের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। এ সম্বন্ধে চক্রপাণির সহিত কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে বিবাহ ধার্য্য হইল। কন্যাকর্ত্তা পাত্রীকে লইয়া পৈঠন পুরীতে আগমন করিলেন। এখানে একটী স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং এই গৃহেতেই উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা হইল। পাত্রীর নাম গিরিজা বাই * রাখা হইল। একনাথ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া শাস্ত্র-অনুসারে, গৃহী ব্যক্তির কার্য্য সকল সমাধা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৈনিক কার্য্য এই রূপ ছিল—স্নানের পর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন, তাহার পর পুরাণ পাঠ করিয়া অতিথিসৎকার করিতেন। পরে ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, নাথ-মন্দিরে গমন করত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। দিবা অবসান হইলে, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত, ভজন, কীর্ত্তন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। ভক্তবৃন্দ, কথা শুনিতে আসিয়া যে তণ্ডুল আদি দিত, তাহাতেই এক নাথের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

কিয়ৎ কাল পরে চক্রপাণি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জনার্দ্দন পন্থও সমাধি লইলেন। এই সকল ঘটনা একনাথের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন তাহা মঙ্গলজনক, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। যাহাতে তাঁহার গুরুদেবের পরলোক-প্রাপ্তির দিনে প্রতি বৎসর উৎসব হয়, একনাথ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সময়ে উর্দ্ধন নামে একনাথের এক জন আত্মীয় তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। একনাথের অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল। তাঁহার বাক্যগুলি সুধা বর্ষণ করিত। তিনি শাস্ত্রের কোন ২ অংশ অবলম্বন করিয়া তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতেন। কথা কহিতে২ উপযোগী আখ্যায়িকা সকল অবতারণা করিতেন, এবং মধ্যে ২ উপমার দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় শ্রোতাগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। একনাথ একজন উত্তম কবি ছিলেন। দ্রুত রচনা তাঁহার একটী বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কথা কহিতে কহিতে তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়া শ্রোতাগণকে শুনাইতেন। তিনি এমন সহজ ভাষায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং কথকতা করিতেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা বোধগম্য হইত। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, সুমধুর ভাষা এবং সরল বাক্য-বিন্যাস আপামর সাধারণ সকলকেই মোহিত করিত। একনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে ভক্তের প্রাধান্য সমর্থন করিতেন। নানা স্থান হইতে লোকে পৈঠনে আসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। অবশেষে, শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক হইল যে, মন্দিরে আর স্থান হইত না। ইহা দেখিয়া পৈঠনবাসীগণ, অর্থ-সংগ্রহ করত, একটী প্রকাণ্ড দেবালয় এবং তাহার সম্মুখে একটী নাটমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত হইল, এবং এই নাটমন্দিরে ভজন, কীর্ত্তন ও কথা হইতে লাগিল।

* দাক্ষিণাত্যে প্রথা এই যে, শ্বশুরালয়ে নব বধূ একটী নূতন নাম পাইয়া থাকে।

এই সময়ে একনাথ এক খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রকাশ করিলেন। সাধু জ্ঞানদেব-প্রণীত জ্ঞানেশ্বরীর ভাষা কঠিন বলিয়া অনেকেই তাহার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। এই জন্য তাহা তাচ্ছিল্য ভাবে ছিল। কিন্তু, জ্ঞানেশ্বরী এক খানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা গীতা ও ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং নানা প্রকার সদুপদেশে পরিপূর্ণ। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া একনাথ এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহা একা ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। যাহাতে তাহার উৎকৃষ্ট ভাব সকল আপামর সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়, এই ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত দুরূহ ভাব সকল একনাথ বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করিলেন। লোকে সাদরে এই পুস্তক খানি পাঠ করত তৃপ্তি লাভ করিল। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া এবং একনাথ কর্তৃক বিরচিত সদুপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া, পৈঠন বাসীগণ বিশেষ রূপে উপকৃত হইল। অনেক কুপথগামী ব্যক্তি তাহাদের মন্দ রীতি সকল ত্যাগ করিল এবং পূর্ব্ব কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিল।

একনাথ যে রূপ উপদেশ দিতেন, সেই মত তিনি কার্য্য করিতেন। পর উপকার সাধন করিবার জন্য তিনি আপামর সাধারণকে উত্তেজিত করিতেন এবং এই ব্রত সাধন জন্য তিনি তাঁহার শরীর ও ধন উভয়ই নিয়োজিত করিতেন। তিনি সাধ্য মত দীন ব্যক্তিদের অভাব দূর করিতেন, এবং আতুর ব্যক্তিদের সেবা করিতেন। কথকতার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট উপার্জ্জন হইত। সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের পর যাহা উদ্বর্ত্ত হইত, একনাথ তাহা মনের আনন্দে পর উপকার জন্য নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার বাটীতে দলে দলে লোক সকল আগমন করিত। তিনি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেন, এবং যে ব্যক্তি যে অভাব জানাইত, তিনি সাধ্য অনুসারে তাহা দূর করিতেন। একনাথ সকলকে সমান ভাবে দেখিতেন এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। কি ধনী কি ধনহীন, কি নীচ জাতি কি উচ্চ জাতি, যিনি সদ্গুণ শালী হইতেন তিনিই তাঁহার কাছে সম্মান লাভ করিতেন। অতিথি-সৎকারের সময়ে তাঁহার বড় ছোট জ্ঞান ছিল না। সকলকেই সমান রূপে খাদ্য দ্রব্য দিতেন। বড় বলিয়া যে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিতে হয় এবং ছোট বলিয়া তাহাকে সামান্য দ্রব্য খাওয়াইতে হয় এ ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। লোকের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার এই প্রকার উপদেশ ছিল—ব্রাহ্মণ জ্ঞানহীন ও কদাচারী হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণোচিত মর্য্যাদা দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু কোন হীন জাতি-ভুক্ত লোক জ্ঞানবান্ ও সচ্চরিত্র হইলে, তাহাকে সম্মান করা উচিত। যদ্যপি কোন কদাচারী ব্রাহ্মণ ও কোন আতুর ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে আতুর ব্যক্তির সৎকার করা কর্ত্তব্য। একনাথ যেমন পর উপকার-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি শান্ত ছিল। কোন প্রকার কষ্ট তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিত না এবং কোন প্রকার দুর্ঘটনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হইত না।

ক্রমশঃ।

ভারত বর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবের কার্য্য বিবরণ।

আবার উৎসব আসিল। সংবৎসরান্তে, আবার উৎসবের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। ধর্ম্ম বিভ্রাটের এ বিষম দুর্দ্দিনে আবার উৎসবের শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে অবকাশ পাইলাম, ইহাতে আমরা ধন্য। বর্ষে ২ এমনি দিনে এই শুভবার্ত্তা প্রচারিত করিতে

পারি, ভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা।। উৎসব কখনও পুরাতন হয় না।। বিশেষতঃ ধর্ম্মোৎসব চির দিনই নূতন। সাংসারিক কোন পদার্থ ক্রমাগত অনবরত উপভোগ করিলে তাহাতে অরুচি জন্মায়—তাহার মধুরতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার কমনীয় কান্তির উপর পুরাতনত্ব জনিত মলিনতা জমিয়া উঠে, ইহা ঠিক, কিন্তু ধর্ম্ম কখনও পুরাতন হয় না, অবিরত ধর্ম্ম-সেবায় কখনও অনুরাগ ভিন্ন বিরাগ বৃদ্ধি হয় না। তাহাতে ধর্ম্মের মাধুরী আরও ফুলিয়া উঠে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য-আরও ফুটিয়া উঠে, । ধর্ম্ম চির সনাতন, তাই ইহা চিরসুন্দর। যাহা অতি পুরাতন, তাহাই অতিনূতন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ধর্ম্মোৎসব কিছুতেই পুরাতন হইবার নহে।

২৫ এ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উৎসব-কার্য্য বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পূজা, সঙ্কীর্ত্তন, বেদ গান, বক্তৃতা, শাস্ত্রব্যাখ্যা আদি নানা-বিধ ধর্ম্ম ব্যাপারে কাশীবাসীগণ কয়দিন অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। "বিসর্জ্জন" "আমি ও আমার", "ধর্ম্মের কায়া ও ছায়া" "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" "সাজ ও কাজ" "মা আমার মাতা কি পিতা" এই কয়টি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। "বিসর্জ্জন" বক্তৃতাটির সার মর্ম্ম ধর্ম্মপ্রচারকের অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। "সাজ ও কায" "মা আমার মাতা কি পিতা" এই দুইটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। "আমি ও আমার" এই বিষয়ে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক গুরু গম্ভীর আত্মতত্ত্ব তিনি এত সরল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যে অশিক্ষিত লোকেও তাহা অতি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তিনি উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"জগতে অনন্ত ভাষা অনন্ত শব্দ। এই অসীম শব্দ-ভাণ্ডার হইতে সকলেই আপনার ২ মনোমত শব্দ বাছিয়া লয়। যে শব্দ যাহার মনোমত—প্রিয়, অপরের পক্ষে তাহা হয়ত প্রিয় না হইতে পারে। শিশুর পক্ষে যে শব্দ প্রিয়, যুবকের পক্ষে তাহা প্রিয় না হইতে পারে। পশুর পক্ষে যে শব্দ প্রিয়, মনুষ্যের পক্ষে তাহা প্রিয় না হইতে পারে। সুতরাং সকল শব্দ বিভিন্ন ২ মূর্ত্তিতে বিভিন্ন ২ জাতির প্রিয় হইয়া থাকে। সর্ব্বজন-প্রিয় যদি কোন শব্দ জগতে থাকে, ত এক মাত্র "আমি"। বালক বৃদ্ধ, যুবা, পশু, পক্ষী, মানব ইহাদের মধ্যে "আমি" শব্দকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু "আমি কি" ইহা কয় জনে বুঝে? সংসারের অন্যান্য পদার্থের সংবাদ লইবার জন্য আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু "আমির" সংবাদ লইতে কয়জন চেষ্টা করিয়া থাকে? দূরাদ্দূরতরবর্ত্তী কত পদার্থের তত্ত্ববার্ত্তা অনুসন্ধান করিতে আমরা ছুটাছুটি করিতেছি, কিন্তু নিকট হইতেও নিকটতর আমিত্বের বিন্দু বিসর্গ মাত্র তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে আমাদের চেষ্টা হয় না, ইহা বড়ই বিচিত্র প্রহেলিকা! "আমি কি" তাহা জানি না, কিন্তু এই অজানা অচেনা জিনিষের প্রতি আমাদের এত ভাল বাসা কেন? কেননা আমরা জানি "আমিত্ব" স্পর্শ মণির ন্যায় মূল্যবান্। লৌহ স্পর্শমণির সংস্পর্শে সুবর্ণ হইয়া যায়—তাহার মূল্য বাড়িয়া যায়, সেই রূপ পদার্থ আমিত্বছোঁয়া হইলেই সুবর্ণ হইয়া যায়,—তাহা আমার পক্ষে মূল্যবান্ হয়। দোকানে শত সহস্র ঘড়ি সাজান থাকিলেও আমার পক্ষে তাহার কিছুই মূল্য নাই, কিন্তু যাই তাহার মধ্যে একটি ঘড়ি আমি ক্রয় করিয়া আমিত্বসংস্পৃষ্ট করিয়া লইলাম, অমনি তাহা আমার পক্ষে মূল্যবান্ হইল, আমিত্বের স্পর্শে তাহা তখন সুবর্ণ হইয়া গেল, কেননা তখন বুঝিলাম যে তাহা "আমার জিনিষ"। কি জানি আমিত্বের কি মহতী শক্তি আছে, যে আমিত্বের সম্পর্ক থাকিলে অতিতুচ্ছ পদার্থও আমার পক্ষে মহা মূল্যবান্

আর আমিত্বের সম্পর্ক না থাকিলে, অতি মূল্যবান্ পদার্থও আমার উপেক্ষার বিষয় হইয়া থাকে। আজ বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজ্য মণিপুর চির দিনের জন্য হিন্দুর হস্ত হইতে হারাইয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য আমার তত দুঃখ হয় না, কেননা তাহা "আমার" নহে। কিন্তু আমার এক খানি ছেঁড়া কাপড় হারাইয়া গেলে তাহার জন্য আমি মরমে মরিয়া যাই। সুতরাং না জানি আমিত্ব কত মধুরতার প্রস্রবণ, যে তাহার সম্পর্কে অতি তুচ্ছ জিনিষও আমাদের পক্ষে মিষ্ট হইয়া উঠে। যাঁহারা মহামনা, তাঁহাদের আমিত্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদিকে তিনি নিজের জিনিষ বলিয়া যেমন মনে করেন, তেমনই নিজের দেশ নিজের সমাজকে তিনি "নিজের জিনিষ" বলিয়া অনুভব করেন। নিজের একটি উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেলে তিনি যেমন দুঃখিত হন, সেই রূপ টীকেন্দ্রজিতের ন্যায় স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রয়াসী কোন বীর মরিয়া গেলে তিনি তেমনই যাতনা অনুভব করেন। কেননা তাঁহার স্বত্ব—তাঁহার নিজত্ব—তাঁহার আমিত্ব নিজ পরিবার মণ্ডলী রূপ কূপে কেবল আবদ্ধ নহে। তাহা স্বদেশ রূপ সুবিশাল সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। আবার যিনি আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন, নিজের একমাত্র আত্মাকে "আমিকে" সর্ব্ব জীবে বিরাজমান দেখিতে পান, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নিজস্ব" বলিয়া অনুভব করেন। এক জন ফকীরের গল্প মনে হইতেছে।

ভাগলপুরে ট্রেজারির (খাজনা খানা) পথ পার্শ্ব দিয়া একজন ফকীর চলিয়া যাইতেছেন। ট্রেজারিতে হুড়২ করিয়া টাকা ঢালা হইতেছে, তাহা দেখিয়া ফকীর বলিতেছেন—"রুপেয়া সব বড়ী হিঁপাজৎসে রাখ দেনা জব্ মেরী জরুরৎ হোগী তব্ ময় লেলুঙ্গা" তাঁহার এই কথা শুনিয়া একজন কর্ম্মচারী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এ টাকা যে আপনার, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

ফকীর। এ টাকা যে আমার নহে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

কর্ম্মচারী। ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টাকা।

ফকীর। যাহার যে বস্তু অধিকৃত, তাহার কাছেই যে সর্ব্বদা তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ, উহা মহারাণীর টাকা, কিন্তু কৈ মহারাণীত উহার কাছে বসিয়া নাই, তবে উহা তাঁহার টাকা কেমন করিয়া হইল?

কর্ম্মচারী। উহা আপনার টাকা কেমন করিয়া? উহার চাবিত আপনার কাছে থাকে না।

ফকীর। তোমার মতে উহা যে মহারাণীরই টাকা, তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? উহার চাবি ত মহারাণীর কাছে থাকে না। মহারাণীর কাছে চাবি না থাকিলেও তুমি যেমন মানিয়া লইতেছ উহা মহারাণীর টাকা, তেমনই মানিয়া লও না কেন উহা আমারই টাকা।

কর্ম্মচারী। আমরা মহারাণীর লোক জন। মহারাণীর আমাদের উপর আদেশ আছে, ঐ টাকা ব্যবহার করিতে, তাই ইহার চাবি আমাদেরই কাছে থাকে।

ফকীর। তোমরা সকলেই "আমার" লোক জন। আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা হিসাব করিয়া টাকা কড়ির ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

কর্ম্মচারী। উহা যদি আপনার টাকা হইত, তাহা হইলে প্রয়োজন মত টাকা আপনি লইতে পারিতেন, তাহাত আপনি পারেন না। সুতরাং উহা আপনার টাকা কেমন করিয়া?

ফকীর। উহার জন্য সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সাহেব প্রয়োজন মত টাকা উহা হইতে ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। "আমি" সাহেব, পশু, পক্ষী মানবাদি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছি।

কর্ম্মচারী নিরুত্তর।

ফকীরের মত আমিত্বকে বাড়াইয়া লইতে পারিলে "অহংমম" জ্ঞান আর বন্ধনের কারণ হয় না। সঙ্কীর্ণ আমিত্বই বন্ধনের কারণ, ইহাই শাস্ত্রের নিদেশ। যে আমিত্বের সম্বন্ধ থাকিলে পদার্থ প্রিয়—মধুর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রিয়তার জন্মদাতা আমিত্বকে সুবিস্তৃত করিবার জন্য জীব মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া আমিত্ব যাহাতে চিন্ময় পুরুষের চারু চরণ চুম্বন করে, তাহার জন্য জীব মাত্রেরই প্রস্তুত হওয়া উচিত"।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "ধর্ম্মের কায়া ও ছায়া ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সরস দৃষ্টান্ত দ্বারা শাস্ত্রীয় শ্লোকের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে তাঁহার অসাধারণ শক্তি। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যাময়ী বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ এত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে তাঁহার বক্তৃতার জন্য আরও দুই দিন উৎসবের সময় বাড়াইয়া দিতে হইয়াছিল। যে সমস্ত অধ্যাপক প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে শীঘ্রই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

৩০এ কার্ত্তিক রাণি ভবানীর কালী বাড়িতে বেদ-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বর্গকে পারিতোষিক দিবার জন্য মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী বেদবিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। ৩০।৪০ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। বঙ্গদেশনিবাসী এক জন ছাত্র সামবেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদ-বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ব্যাস উক্ত জনতাময়ী সভায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান শিক্ষার জন্য যে সমস্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুক্ স্রুবাদি পাত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির বর্ণনা করেন। কোন্ পাত্র যজ্ঞের কোন্ কার্য্যে প্রয়োজনীয়, কোন্ পাত্র দ্বারা কিরূপ অনুষ্ঠানাদি করিতে হয়, তাহা তিনি যথাযথ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রণামণ্ডলীর সভ্য পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় বেদবিদ্যালয়ের উন্নতির কথা, ধনাগমের কথা, দাতৃগণের প্রতি ধন্যবাদের কথা সকল কথাই বুঝাইয়া সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে বিদায়ী দক্ষিণা দিয়া সৎকার পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

পূর্ব্ব ২ বর্ষের মত এবারও গঙ্গাবক্ষে জলযান ও সঙ্কীর্ত্তনাদি যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানকার হরিনাম প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার ও বালরঞ্জিনী সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সমাদ্দার মহাশয় স্বগণ ও ভক্ত মণ্ডলী সহিত উৎসবের সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সুখী করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন।

উৎসবোপলক্ষে যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার সম্মুখে "মা আমার মাতা কি পিতা"। এই বিষয়ে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্ বিষয়ে যে গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বাউলের সুর। তাল গড় খেমটা।

কে বা জানে "মা" আমার মাতা কি পিতা।
চিনতে পারি না মা যে চিন্তাতীতা (চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা)।
পুরাণ দর্শন তন্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি বেদ মন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র, স্তম্ভিত গীতা।

প্রকৃতি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ ব'লে ডাকে,
কেউ মায়াতে ভাবে তাঁকে, শিববনিতা॥

কেউ বলে মা রণকালী, কেউ বলে মা বনমালী,
কেউ বলে মা দশভুজা, গিরিদুহিতা।

এ সকলই মায়ের মায়া, যত রূপ সব মায়ের ছায়া,
মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া, বুঝিবে কে তা॥

মা নহে পুরুষ মেয়ে, নাহি জন্ম মরণ বিয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ে, এই সার কথা॥
পরিব্রাজকের মা যে, বিরাজে আদ্যন্ত মাঝে,
মা বিনা মা কারও নহে, মুক্তা বনিতা।

বনমাঝে মা বিরাজে।

গত মাসে কয়েক দিন আমার হাথুয়ায় অবস্থিতি কালে আমি একদিন তথা হইতে ৩া০ কোশ দূরবর্ত্তী থাওয়ে নামক স্থানে ক্রোশৈক ব্যাপী একটি গভীর বন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এই বন পূর্ব্বে নাকি ৮।৯ ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল, এক্ষণে আবাদ হওয়ায় বন ক্রোশৈক মাত্র অবশিষ্ট আছে। এ স্থানটি হাথুয়া-বিপতিরই রাজ্যান্তর্গত। এখানে প্রবেশ মাত্রেই প্রথমে মহারাজার বনবাস-বাটী ও একটি নির্ম্মলসলিলা পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। তাহার পরেই একটি দেবীর—মা সিংহ-বাহিনীর মন্দির বিদ্যমান আছে, এই মন্দির অতিক্রম করিলেই গহন বন। লতামণ্ডপ-জড়িত বৃক্ষরাজি সজ্জিত এই গভীর বনে বন্য শূকর, হরিণ ও বৃহদ্ভুজঙ্গ ও বানর গণ সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু শুনিলাম দেবীর প্রভাবে ইহারা কখন নাকি কাহারও প্রাণহানি করে না। এই গহন বনে ৩২ বর্ষ হইতে একটি সাধু তপস্বী বাস করিতেছেন। তাঁহার স্থানটুকু অতি পবিত্র, নির্ম্মল ও প্রফুল্লতাপূর্ণ। তিনি সর্ব্বদা লোক-সমক্ষে বাহির হন না, তবে কাশী হইতে এক স্বামীজী আসিয়াছেন, এই সমাচার পাইয়াই তিনি কুটীর হইতে বাহির হইলেন ও অতি শিষ্টাচার ও সমাদর পূর্ব্বক আমার সহিত বার্ত্তালাপ করিলেন—তাঁহার আশ্রমে গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না। সৎসঙ্গ করিবার জন্য মহারাজাও এই বনমধ্যে একটি পৃথক্ স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

বনবাসিনী মা সিংহবাহিনীর এই রূপ কিম্বদন্তী আছে—বর্ত্তমান হাথুয়াধীশ নিজ রাজবংশের ১০২য় পুরুষ। ইহাঁদের পূর্ব্বরাজধানী হুশীপুরে ছিল। যখন মুশলমান রাজন্য বর্গের অত্যাচারে হিন্দুগণ নিতান্ত উপদ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইহাঁরেই জনৈক পূর্ব্ব পুরুষ মুশলমানরাজ-বিরুদ্ধে কয়েক বার যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু প্রতিবারেই পরাজিত ও হতমান হইয়া ফিরিয়া আসেন। কাম্বার যুদ্ধে যখন অস্ত্র শস্ত্র সেনা সামন্ত কমিয়া আসিল, তখন মহারাজা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে কোন দেবী আসিয়া বলিতেছেন, বৎস! আমি মুসলমান রাজ্যে অপবিত্র অসেবায় আর থাকিতে পারিতেছি না। তুমি যুদ্ধ করিয়া এই বন অধিকার কর। রাজা বলিলেন, মা! আর তো সামর্থ্য নাই—অস্ত্র শস্ত্র লোক লস্কর প্রায় সকলই শেষ হইয়াছে, আর কি দিয়া যুদ্ধ করিব? ভগবতী বলিলেন, ভয় নাই—ভাবনা নাই; যাহা আছে তাহাই লইয়া তুমি যুদ্ধযাত্রা কর—জয়লাভ করিবে। যাইবার পথে তুমি প্রথমে একটি সর্প—পরে শশক ও শেষে শিবা দেখিতে পাইবে। প্রথম দুইটীকে ছেদন করিবে, তৃতীয়টিকে নমস্কার করিয়া যুদ্ধে যাইবে, জয় হইবে। এবং একটি বৃক্ষ-বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যে এই বৃক্ষতলে আমার প্রতিষ্ঠা করিবে। রাজা প্রাতে সমুত্থিত হইয়া ভাবিলেন যে স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা, বুঝিব কি রূপে! তখনই নিজ নিষ্কোষিত অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মা! যদি স্বপ্ন সত্য হয়, তবে এই তরবারি আপনি উঠিয়া দাঁড়াইবে। তাহাই হইল। নিঃশঙ্কচিত্তে মহারাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, পথে স্বপ্নদৃষ্ট সর্পাদি দেখিলেন—দেবীর আজ্ঞা পালন করিলেন। যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া, অনুসন্ধানে দেবীর স্থান দেখিতে পাইলেন। এখন দেবী পুরাতন মন্দিরে বাস করিতেছেন, মন্দিরের নিকট সেই বৃক্ষটি এখনও আছে—সে বৃক্ষের কেহ নাম বলিতে পারে না। বর্ত্তমান মহারাজা মা সিংহবাহিনীর দিব্য রৌপ্যময় সিংহাসন ও নানাবিধ সাজ সজ্জা করিয়া দিয়াছেন। মার কাছে বসিয়া অনেক ক্ষণ ধ্যান-পূজাদি করিলাম। স্থানটি সিদ্ধ পীঠ। তথায় বসিবা মাত্র, হৃদয়ে যেন ভক্তি প্রেম আপনি উচ্ছলিয়া উঠে—প্রেমের অশ্রুধারা চক্ষু ফুটিয়া আপনি বহির্গত হয়, অসাধকেরও সাধন-বেগ উচ্ছ্বসিত হয়। মার কাছে বসিয়া প্রাণ জুড়াইল—চৈতন্যময়ী মার লীলাভূমিতে

পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, সেই ভক্ত মহারাজাকে চরিতার্থ করিবার জন্য—তাঁহার বংশধর গণকে ধন্য করিবার জন্য এই গহন বন মাঝে আমার মা বিরাজে!

হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টীয়ান।

ধর্ম্মের জন্য অল্প লোকেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে—কেহ মনের ক্ষোভে, কেহ যুবতীর লোভে, কেহ অবুদ্ধিতায় কেহ পেটের দায়ে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে একজন সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বনাম সদানন্দ স্বামী), খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। দৈনিক ও সমাচার-চন্দ্রিকা বলেন—লোকটা বেশধারী সন্ন্যাসী ও অব্যবস্থচিত্ত। বস্তুতঃ তাহাই বটে। খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে উক্ত ব্যক্তি কুমার-পরিব্রাজক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন ও পরিব্রাজক মহোদয় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের গোচরার্থে আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পত্র।

ঈশ্বর উপায়।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী
মহোদয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আমি এক জন ব্রাহ্মণ বংশ-জাত স্বামী; পরমহংস কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় ১৩।১২ বৎসর পর্য্যন্ত নানা তীর্থ পর্য্যটন ও মহাত্মাগণের নিকট শাস্ত্র ও উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৩নং মিশনে ক্ষুধায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমার ক্ষুধার ভার কেহই গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া খৃষ্টের স্মরণ লইয়াছি। আগামী রবিবার বপ্তাইজের কার্য্য হওন কথা হইয়াছে। এক্ষণে নিবেদন আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ হিন্দু থাকেন এবং ধারণ করেন তবে এক জন প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম উজ্জ্বল করুন ও জাতি রক্ষা করুন!

শ্রীসদানন্দ স্বামী।

উত্তর।

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু—

শ্রীমন্মহাশয়ের কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। পাঠান্তে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। ১২।১৩ বৎসর ক্রমাগত তীর্থাটন ও সৎসঙ্গ করিয়া, পরমহংসের শিষ্য ও স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হইতেছে, ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আপনার কি ক্ষুধা, তাহা খুলিয়া লেখেন নাই। যদি শরীরের ক্ষুধা হয়, তবে তজ্জন্য পরমহংসের চিন্তা কি?

"ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং পথ্যতাম্"।

ভিক্ষান্ন ভোজনই যে পরমহংসের বৃত্তি, তাঁহার আবার কলিকাতার ন্যায় সহস্র ২ হিন্দুসজ্জন-মণ্ডলী-পূর্ণ স্থানে ক্ষুন্নিবৃত্তির চিন্তা কি? লিখিয়াছেন—"যদি কেহ হিন্দু থাকেন * * * তবে একজন প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম উজ্জ্বল করুন ও জাতি রক্ষা করুন।" সাধু ও ভিক্ষার্থীর জন্য হিন্দুর গৃহ-দ্বার সদাই মুক্ত, যে বাড়ীতে যাইবেন, সাধু সেই বাড়ীতে প্রায় আদৃত হইবেন। যিনি পেটের দায়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার ন্যায় অসার প্রকৃতি তো জগতে আর নাই। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার আবার জাতি কোথায়? আপনার জাতি রক্ষার জন্য হিন্দুকে আহ্বান করিয়াছেন কেন? আপনি তো জাতি কুল ত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাসী, তবে আবার জাতির পরিচয় কেন, বুঝিতে পারিলাম না। আর যদি মনের ক্ষুধা হয়, তবে পরিষ্কার করিয়া লিখিলে ভাল হয়। আপনি সন্ন্যাসী, হিন্দুসমাজের সম্মানের সামগ্রী, অতএব সদ্গুরূপদিষ্ট সাধন-তন্ত্রে তৎপর হইলেই ভবক্ষুধার শান্তি হইবে। সাধনই সন্ন্যাসীর সর্ব্বস্ব। সাধক সন্ন্যাসীর আবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, ইহা এই নূতন শুনিলাম। খ্রীষ্টিয়ান হইলেই যে আপনার উভয়বিধ ক্ষুধার শান্তি হইবে, তাহাও নহে, বরং পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হইবে। ব্যাপ্তাইজ হইবেন না। সজ্জনের সঙ্গ করুন, সাধন অভ্যাস করুন, সজ্জন-গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন, শরীর মন পবিত্র হইবে, ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, আপনার জন্ম জীবন কৃতার্থ হইবে।

অত্যলম্।

৺কাশী যোগাশ্রমে
১১ই কার্ত্তিক।

দীনাতিদীন
শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরিব্রাজকের ভিক্ষা।

চির-কুমার-পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় অনেক দিন হইতে ধর্ম্মার্থ হিন্দুসমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্য সহস্র ২ ব্যক্তির নিকট তিনি সুপরিচিত। অনেকে অনুরাগ পূর্ব্বক কত কথা জানিবার জন্য—বুঝিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। যে রাশি ২ পত্র প্রত্যহ তাঁহার শিরোনামে আসিয়া থাকে তাহা পড়িতে ও তত্তাবতের যথোচিত উত্তর লিখিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে তাঁহার মনন নিদিধ্যাসনাদি-সাধনার অতিশয় ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আর কেহ তাঁহাকে পত্রাদি না লেখেন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা। যদি লেখেন, তবে তিনি যে পত্রের উত্তর দান অতিশয় আবশ্যকীয় মনে করিবেন, অবকাশ পাইলে তাহারই উত্তর মাত্র দিবেন, অন্যথা তাঁহার পত্রের কেহ আশা করিবেন না। তিনি পত্র লিখিলেন না বলিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ বা অপ্রসন্ন—রুষ্ট বা ক্লিষ্ট না হয়েন, ইহাও তাঁহার ভিক্ষা। তাঁহার নিকট যাহা যাঁহার জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাহা তাঁহাকে না লিখিয়া ধর্ম্ম-প্রচারক-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের নামে লিখিলেই হইবে।

সুসমাচার।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে শ্রীযুক্ত গতিনাথ রায় মহাশয় গত ফাল্‌গুণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ভিন্ন ২ স্থানে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তিনি এই কয়েক মাস মধ্যে সিরাজ গঞ্জ ও বৈদ্যজামতৈল. বগুড়াজেলায় নওখিলা, ময়মন সিংহ জেলায় দেওয়ানগঞ্জ ও খরুয়া, রঙ্গপুর জেলায় পাগলা হরিপুর, আসাম ধুবড়ী জেলায় সুখবর, গোয়াল পাড়া গোয়ালটুলী ও কলিতা পাড়া তৎপর গৌহাটী, বড়পেটা, হাজোরামদিয়া, সুয়ান কুশী, মরচ, তেজপুর, মঙ্গল দই, নওগাঁ জেলায় নওগাঁ, খাগরি জাল এবং উপর আসামে শিব সাগর যোড়হাট, ডিব্রুগড়, আদি স্থানে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও জ্ঞান পূর্ণ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা লোক সকলের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে গৌহাটী ৺শুক্রেশ্বর মহাদেবের বাটীতে একটি হরি সভা ও তথাকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের দ্বারা একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয় ও কুমার-পরিব্রাজক মহোদয় কলিকাতা নগরীতে যে ধর্ম্মের মহান্দোলন করিয়াছেন ও মধ্যে ২ এখনও যে করিয়া থাকেন, তাহাতে এবার একটি নূতন ফল দেখিয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কতিপয় সুবোধ যুবক, ইংরাজি ভাব-মদান্ধ অহিন্দু হিন্দু সন্তান গণকে সনাতন ধর্ম্মের সারবত্তা ইংরাজিতে বুঝাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পূজাবকাশে ইঁহারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আসিয়াছিলেন। কাশী-কারমাইকেল লাইব্রারিতে একদিন ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া আর্য্য ধর্ম্মের সারবত্তা বুঝাইয়াছিলেন। বুঝিলাম দেশের বাতাস ফিরিয়াছে।

ধর্ম্মান্দোলন।

(হাথুয়া)

১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে হাথুয়াধিপতি পরম ধর্ম্মিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর কে সি এস্ আই মহোদয়ের প্রযত্নে হাতুয়া গোপাল মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের তলে এক মহতী-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজার ঘোষণা-ক্রমে তাঁহার রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী অনেক স্থান হইতে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। মহারাজা স্বয়ংও অমাত্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কাশী হইতে তথায় গিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথদেবের মন্দির-সংস্কারার্থ

যে ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দুবর্গের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা হইতেছে। সভায় ২ ও সংবাদ পত্রাদিতে ইহার বিপুল আন্দোলনও চলিতেছে। হাতুয়ার এই মহতী সভাতেও তাহাই প্রস্তাবাদি হইল। প্রথমতঃ পণ্ডিত চন্দ্রদীপ শর্ম্মা মহাশয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। তদনন্তর পণ্ডিত মুরলীধর শর্ম্মা মহাশয় স্বামীজীকে ব্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ করেন। স্বধর্ম্ম-রক্ষা, ধর্ম্ম কীর্ত্তিস্তম্ভের পরিরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং দেবস্থান আদির পরিচর্য্যার আবশ্যকতা কি স্বামীজী এই বিষয় গুলি কখনও উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে উন্মাদিত করিয়া, কখন জ্ঞানগম্ভীর ভাবে ধর্ম্মের সারবত্তা বুঝাইয়া কখন প্রেমাশ্রু ধারা গলিত নেত্রে গদ্গদ স্বরে ভগবদ্ভাব-সুধারস-প্রবাহে শ্রোতৃবর্গকে আঁখিনীরে ভাসাইয়া সভায় স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা করিলেন। সকলের হৃদয় গলিল—মন মাতিয়া উঠিল, সকলে আনন্দ ও ভক্তি পূর্ব্বক দেব-মন্দির সংস্কারার্থ সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। তবে শ্রী মহারাজা স্বয়ং ৩০০০৲ ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া প্রায় ২০০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। রাজ্যের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী দত্ত, দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র নাথ দত্ত বিএ, এবং অন্যান্য অমাত্য বর্গ সহ মহারাজা স্বামীজীকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সম্ভাষণাদি করিলেন ও তাঁহার সহিত সদালাপে পরম সুখী হইলেন। স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইয়া তৎপর দিন সন্ধ্যার পর বাঙ্গালী ভদ্র মণ্ডলীর প্রবোধনার্থ বঙ্গ ভাষায় ভগবদুপাসনা বিবরিণী ও প্রেমামৃত বর্ষিণী একটি বক্তৃতা করেন। এবং চতুর্থ দিন স্কুল-গৃহে বহু জনাকীর্ণ সভা মধ্যে সুনীতি শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। রাজ্যের সকল লোকেই স্বামীজীর অমৃতায়মান উপদেশ শুনিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। ধর্ম্মিষ্ঠ রাজার রাজ্যে ধর্ম্মোপদেশের যে অধিক আদর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

প্রাপ্ত।

শ্রীচরণ-কমলেষু—

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্—

মহাশয়! আমি একটি দুঃখী আর্য্যসন্তান। আমি "ধর্ম্ম প্রচারকের" একজন গ্রাহক। বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য কার্য্যে আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। গত পূর্ণিমা (১লা কার্ত্তিক) তারিখে আমার গুটি কতক বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাই। গত পূর্ব্ব দিবসে অনুমান করিয়া আয়োজন করা হয়। কিন্তু তৎ পর দিবসে নিমন্ত্রণ করিয়া দেখি, আয়োজন অপেক্ষা লোক অধিক হইয়াছে। এখন চিত্ত চঞ্চল হইল, ভাবিলাম কি করি? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলাম। বসিয়া চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ বোধ হইল কে যেন একটি স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার কাণের নিকট আসিয়া বলিল, "আমাকে শরণ কর্, না বাছা! তোর ভাবনা কিসের? মা, আমার ঘটে 'মুষ্টি ভিক্ষা' দে মা, তোর সকল চিন্তা দূর হবে। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে, যথার্থই "মা যার সহায়, তার আবার ভাবনা কিসের?" আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া পাঁচ পোয়া চাউল "মা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিয়া "মঙ্গলঘটে" দিলাম। যথার্থ বলিতে কি সেই অল্প সামগ্রীতেই সকলের পরিতৃপ্তি হইল, মা অন্নপূর্ণা কুলান করিয়া দিলেন, কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাশয়! এই পত্র খানি "ধর্ম্ম প্রচারকে" একটু স্থান দিলে কৃতার্থ হইব। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, "মঙ্গলঘটে" রীতিমত মুষ্টি ভিক্ষা দিলে গৃহস্থ চির কুশলে থাকিবেন ও সকল আপদ্ বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবেন।

বাজীতপুর
জেলা বর্দ্ধমান — শ্রীগোপালদাস দাস বসু।
তাং ৫ই কার্ত্তিক ১২৯৮

বিগত ২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতি বার হইতে ১লা কার্ত্তিক শনিবার পর্য্যন্ত দিন ত্রয় গুপ্তিপাড়া ধর্ম্মসভার নবম বার্ষিক মহোৎসব ভগবচ্চরণ-রেণু-কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম পিপাসু সাধক মহোদয় দিগের প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়াছে। পাপের প্রখর কিরণে ও পাশ্চাত্যতর্কের প্রবলতায় ভারতীয় জনগণের চিত্তক্ষেত্র দিন দিন শুষ্ক হইতেছে। সর্ব্ব মঙ্গল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার, চরণচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তিনদীর মধুর সলিলে ভক্তহৃদয় দিন দিন সরস হয়। প্রথম দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতা পরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক মহারাস-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা। ২য় দিন—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন সভাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বক্তৃতা এবং ৩য় দিন—মহা সঙ্কীর্ত্তন ও সংসার সমুদ্র সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা। পরে সভ্যগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিনীত।

শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র সেন

সম্পাদক।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ছাপরা বেরিলি ধর্ম্মসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করিলেন।

বেদবিদ্যালয়ের আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা।

আশ্বিন।

শ্রীযুক্ত বনয়ারী সিংহ, করওয়া	...	২॥৵০
" হর লাল দাস গুপ্ত, ধুবড়ী	...	৮॥৵০
" যোগীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কলিকাতা	...	৶০
" কালশশী ঘোষাল, পাতিহাল,	...	৵০
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	...	৵০
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মুর্সিদাবাদ	...	৪৸৶০
" শশিভূষণ ধর ও " পঞ্চানন্দ দাস, — কুতবপুর, মোগলটুলী	...	৪৶০
" আমি সিং, রামবেগলা সারন	...	॥০
" বক্শী রাম দাস, গোলা	...	১৩৷৶০
" রাজীবলোচন দাস, কানাইবাজার	...	১৸৶০
" আশুতোষ লাহিড়ী, রংপুর	...	৩৲
" কালীমোহন সেন, দিনাজপুর	...	৫।০
" গোপীমোহন রায়, কলিকাতা	...	১০৲
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডলা	...	১২৲
" আশুতোষ সান্ন্যাল মল্লারপুর	...	॥৶০
" চন্দ্রকুমার মিত্র, মল্লারপুর	...	॥৫
" বিপিনবিহারী রায়, সালতাদা	...	৶০
" মধুসূদন দাস, গোয়ালপাড়া	...	৬৲
" গোবিন্দচন্দ্র সুর, সাহেবগঞ্জ বরিসাল	...	৫৲
" তুলসীদাস বন্দোপাধ্যায়, ভেরিয়াডেঙ্গি	...	১৸৴১০
" রমণীমোহন বসু, দিনাজপুর	...	১০৲
" কুঞ্জমোহন গোস্বামী, সুনামগঞ্জ	...	৮৲
" রাজেন্দ্রমোহন বসু, আজিমগঞ্জ	...	৩॥০
" কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভেরিয়াডেঙ্গি	...	॥০
" বিশ্বেশ্বর সেন, গুপ্ত, বেন্দাগ্রাম যশহর	...	৬৲
" মহেশচন্দ্র গুই দাস, চাদসী, বরিসাল	...	৯।০
" বঙ্কুবিহারী ঘোষ, কান্দি	...	২৸৶১০
" প্রতাপচন্দ্র সিংহ বালিয়া, কান্দি	...	২॥০
" সূর্য্যকান্ত সিংহ ঐ	...	২॥৴১০
" রাখালচন্দ্র সেন, জামালপুর	...	২৲
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীহট্ট	...	২৸০
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, সাতঘরা, হাওড়া		॥৶০
" দীননাথ পাত্র, রামপুর হাট	...	২৸৶০
" ঈশানচন্দ্র রায়, সারারচর, মৈমনসিংহ	...	৪।০
" হরিমোহন সেন, শিলচর	...	৫৲
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিল্‌মাড়িয়া	...	১২॥০
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়,কুণ্ডলা	...	১০৲
		১৬৫৸৴:৫

কার্ত্তিক।

" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধানকুড়া ৷৶৹
" হরিনারায়ণ চৌধুরী, কাকিনীয়া সত্রালয়ের ম্যানেজর ৺ কাশীধাম ৷৹
৺ কাশীধামের মুষ্টি ভিক্ষা মাহ শ্রাবণ ১৬৷৶৫
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সাহা পাবনা ৷৶৹
" ভারত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধান বড়া, পাবনা ৷৹
" গোপাল দাস বসু, বাজিতপুর ৶১৹
" চন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুমকা ১৲
" জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন কলিকাতা ৪৲
" অবিনাশ চন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান " ৯৲
" হরিদাস ঘোষ কুটি গোলা, পূর্ণিয়া ৩৷৹
" ভুবন মোহন সেন, আমিনপুর ১৷৶৹

৩০৷১৫

এক কালীন দান।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কলিকাতা ৴৹
" কৃষ্ণদাস বসু, বাজিত পুর ৶৹
" শিউ তেয়ারী, রামকোলা ১৲
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভেরিয়াডেঙ্গি ১৲ ১৲
" রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব দিনাজপুর } ৫০৲
" চন্দ্র কুমার রায়, বর্দ্ধন কোট ৫৲
ধর্ম্ম সভা রংপুর ১০৲
হরিসভা দিনাজ পুর ৪০৲
শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ দত্ত ফুলবাড়ী ২০৲

১০৭৶০ ২১৲

মাসিক বৃত্তি।

শ্রীমতী লবঙ্গ সুন্দরী বৃত্তি মাহ ভাদ্র ও আশ্বিন ১০৲ ১০৲
কেনচিৎ আর্য্য[illegible], বাজিত পুর ৷০

আশ্বিন ও কার্ত্তিক

শ্রীযুক্ত মহারাজা দরভঙ্গা আগষ্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দরুন } ৪০৲ ২০৲
বিপিন বিহারী রায়, পুনপুন ৶০
বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সিমলা ১০৲

৫০৴ ৪০৶০

বাৎসরিক বৃত্তি।

শ্রীযুক্ত কালী মোহন সেন, দিনাজ পুর ৫৲

৫৲

১৬২৷০ ৬১৶০

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাহার আয় ও ব্যয়।

আশ্বিনের জমা ৩২৮৴১৫
কার্ত্তিকের জমা ৯১৷৶১৫
মোট———————৪১৯৸১০

আশ্বিন মাসের খরচ।

মাসিক দক্ষিণা ও বৃত্তি দান ৫৭৷৹
ছাপাই খরচ ২৪৸০
মাশুল ৴০
বাজে খরচ ৪৸০
সেভিংস্‌বেঙ্কে জমা ১০০৲

১৮৭৴০

কার্ত্তিক মাসের খরচ।

মাসিক বৃত্তি ও দক্ষিণা ৭২৷০
বেদবিদ্যালয়-সভার বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণকে বিদায় আদি } ৩০৲
মাশুল খরচ ৴০
বাজে খরচ ৪৸৴০

১০৭৷০

মোট———————২৯৪৷৴

বাকী মজুদ ১২৫৴১০

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
লেখাধ্যক্ষ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥ "

ভাগ	" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৩
১০ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "	মাঘ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধি র্গন্ধাদিকর্ষণাৎ।
বাক্ শস্ত মম্বু নির্ণিক্ত মজ্ঞাতঞ্চ সদাশুচিঃ॥

মল মূত্রাদি অমেধ্য যুক্ত বস্তু গন্ধ শূন্য করিয়া মৃত্তিকা জল দ্বারা ধুইলে শুদ্ধ হয়। কোনও বস্তুর শুদ্ধতায় সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণের বাক্যে ও জল প্রক্ষেপ দ্বারা শুদ্ধ হয়। অজ্ঞাতাশুদ্ধি বস্তু সর্ব্বদা শুদ্ধ হয়।

শুচি গোতৃপ্তি কৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতং।
তথা মাংসঞ্চ চাণ্ডাল ক্রব্যাদাদি নিপাতিতং॥

পবিত্র ভূমিতে একটী গরুর পানোপযোগী নির্ম্মল জল থাকিলেও তাহা শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। চাণ্ডাল এবং কুক্কুর কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংস শুদ্ধ হয়।

রশ্মিরগ্নীরজশ্ছায়া গৌরশ্বো বসুধানিলঃ।
বিপ্রুষো মক্ষিকা স্পর্শো বৎসঃ প্রস্রবনে শুচিঃ॥

কিরণ, অগ্নি, ধূলি, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, বাষ্পকণা ও মক্ষিকা স্পর্শে কোন বস্তু অপবিত্র হয় না। দুগ্ধ দোহন কালিন বৎসও পবিত্র হয়।

অজাশ্বয়োর্ম্মুখং মেধ্যং নগৌর্ন নরজামলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুদ্ধন্তি সোম সূর্য্যাংশু মারুতৈঃ॥

ছাগল এবং অশ্বের মুখ পবিত্র ; গো জাতির মুখ ও মনুষ্য মল সর্ব্বদাই অপবিত্র। চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ও বায়ু স্পর্শে পথ পবিত্র হয়॥

মুখজা বিপ্রুষো মেধ্যা স্তথা চ মনবিন্দবঃ।
শ্মশ্রুচাস্যগতং দন্ত সক্তং ত্যক্ত্বা ততঃ শুচিঃ॥

মুখ নিঃসৃত লালা বিন্দু, মুখচ্যুত আচমনীয় জল কণা ও মুখ গত শ্মশ্রু লোম অপবিত্র হয় না। ভোজনাবশেষ দন্তগত উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিলেই মুখ শুদ্ধ হয়।

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামে দ্বাসোবিপরিধায়চ॥

স্নান ও পান করণানন্তর, হাঁচি, নিদ্রা ভোজন ও পথ পর্য্যটনের পর অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, দুইবার আচমন করিবে।

রথ্যা কর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্তশ্ব বায়সৈঃ।
মারুতেনৈব শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টক চিতানিচ॥

মার্গস্থ কর্দ্দম ও জল অন্ত্যজ, কুক্কুর ও কাকাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হয়। অপবিত্র অট্টালিকাও বায়ু দ্বারা পবিত্র হয়।

ক্রমশঃ।

স্বার্থ-পরতা ।

সময় গুণে প্রাণ প্রিয়তম পুত্রও বিষ চক্ষে পড়ে, পরম আত্মীয়ও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। মনের এক অবস্থায় যে ভাব, যে ভাষা অতীব মধুর বোধ হইতেছিল, অবস্থান্তরে তাহাই আবার বিষবৎ অনুমিত হয়। লগ্ন ক্রমে যাহা একবার পরম পবিত্র ভাবিলাম, কালদোষে তাহাই আবার বিকৃত আকার ধারণ করিল। জগতের তো ব্যাপার এই! কখন কি হয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। জগতের এ রকম অবস্থায় আসিয়া নিজের প্রকৃতি বাঁচাইয়া চলা বড়ই কঠিন কথা—লোকের নিকট আমার মর্য্যাদানুরূপ সম্মান পাওয়া অনেক সৌভাগ্য সাপেক্ষ—প্রায়ই উল্‌টো ফেরে পড়িতে হয়। অগত্যা "স্বার্থ-পরতা" শব্দ বেচারাও এই শেষ পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছে। কখন কি জন্য কে ইহাকে এরূপ শাস্তি দিল, তাহার নির্দ্দেশ করাও সহজ নহে। তবে কেহই যে ইহার প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করিতেন না এমন নহে, অনেকেই কথায় কার্য্যে সে ভাব দেখাইয়াছেন। সে সকল কথা সময়ে বলিব। এখন দেখা যটিক, সোজা কথায় "স্বার্থ-পরতা" বলিলে কি বুঝা উচিত—যিনি নিজের প্রয়োজনকেই প্রধান মনে করেন, তিনিই স্বার্থপর এবং তাঁহার সেই ভাবের আখ্যাটাই "স্বার্থপরতা"। আমরা মোটা মুটিতো এই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, "অন্যের মন্দ হয় হউক, আমার ভাল হইলেই হইল। এ ভাবার্থটা তাঁহারা কোথা হইতে টানিয়া আনিলেন, তহাতো আমরা কিছুই খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের মতে "স্বার্থ পরতা" মহা পাপ, স্বার্থপর ব্যক্তি ভয়ানক কলুষিত নরকের কীট। নিঃস্বার্থতা অবলম্বনই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত। আমরা কিন্তু, কে জানে কেন, ইহার বিপরীত বুঝি। তাঁহারা লোকের যে কুভাবটীকে লক্ষ্য করিয়া কথা গুলি বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক ঠিক; কিন্তু এ ভাবটা "স্বার্থ পরতার" স্কন্দে তাঁহারা চাপাইলেন কেন? আমাদের স্থির বিশ্বাস, স্বার্থ সিদ্ধিই জীবনের লক্ষ্য, স্বার্থ ভিন্ন জগৎ এক দণ্ড চলিতে পারেনা, স্বার্থ পরতাই জীবের অবলম্বনীয়।

বাসনাই জন্মের কারণ, আবার বাসনাই অবস্থান্তরে মুক্তি পথের সাথী। তাই জনন মরণ কারণ ও জনন মরণ তারণ-কারণ মলিনা ও বিমলা ভেদে বাসনা দ্বিবিধ।

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধাচ মলিনা তথা।
মলিনা জন্ম নো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী।

যোগ বাশিষ্ঠ।

বাসনা যুক্তই জীব আর বাসনা বিমুক্তই শিব। বাসনা না থাকিলে—প্রয়োজন না হইলে জগৎ তোমার কাছে আসিব কেন? মর্ত্ত্য লোকই বাসনার ভোগভূমি, এ রাজ্যে বাসনাই আমার সহচর—মন সঙ্গে থাকিতে বাসনা আমাকে ছাড়িবার নয়—ধোবা নাই "বাসনা" জ্বালায় কে? সুতরাং যাহাকে (মলিনা বাসনা) লইয়া যাহার (বিমলা বাসনা) জন্য আসিলাম তাহাকে ছাড়িয়া, যাহা করিব তাহা না করিয়া করিব কি? হাটের মাঝে বোকা সাজিয়া—স্বার্থ হারাইয়া বাহাদুরী কি?

প্রত্যেকে নিজে নিজে ভাল হও, সকলেই ভাল হইয়া যাইবে—নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া দেখ, সকলেরই স্বার্থ বজায় থাকিবে। আর্য্যগণ ব্যষ্টিগত উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, এখনকার মত সমষ্টিগত—সাচা ঝুটা সারে মাথে খিচুড়ী পাকাইয়া "বিড়াল চোকো" ভালমন্দের ধার ধারিতেন না।

বিশেষতঃ স্বার্থ পরতাই ভাব পদার্থ। স্বার্থ পরতার অভাবই নিঃস্বার্থ-পরতা সুতরাং তাহার আবার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? অভাব বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, ভাবের অবকাশই অভাব। সুতরাং দেখিতেছি, স্বার্থ ছাড়া কোন কাজই হয় না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, রস, রক্ত, ক্লেদ, অস্থি, মজ্জাদির সমবায়ে গঠিত দেহে

[illegible] স্বার্থ পরতা জীব নাই, তাহা যাহারা বলে বলুক ; কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না—তাহাদিগের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাই না। বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক শব্দ প্রয়োগই যে এ গোলের মূল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। মনের বিলীনাবস্থাপন্ন ঘোর সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন ব্রহ্মাত্ম বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত, নিঃস্বার্থ কে ? অহৈতুকী ভক্তিযুক্ত ভগবদভক্ত ভিন্ন—

প্রাতরুত্থায় সায়হ্নং সায়হ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্॥

যাঁহার একমাত্র সিদ্ধ মন্ত্র—তিনি ভিন্ন—প্রকৃত নিঃস্বার্থপর (অর্থাৎ স্বার্থ নিঃস্বার্থ উভয় ভাবাতীত) কেহ কি আর আছে ? মূলের এই কয়টা ছাট দিয়া সামাজিক লোকের তুমি আমি ভেদ বুদ্ধি যুক্ত জনের, ভাল মন্দ বিচারবান্ গণের দুই একটা স্বার্থ প্রধান কার্য্য দেখিয়া যাহারা তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ-পর বলে, তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিব কিরূপে ?

দুঃখীর কান্নায়, ক্ষুধিতের কাতর কণ্ঠধ্বনিতে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কাহাকেও কিছু দান করিতে দেখিলে আমাদের নিঃস্বার্থ বাদীরা তাহাকে হয় তো, হয় তো কেন, নিশ্চয়ই, মহা নিঃস্বার্থতা-পর দাতৃকুল ভূষণ বলিবেন, কিন্তু আমাদের জিহ্বা তাঁহাকে মহাস্বার্থ পর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চায় না। যে যত দানী, যে যত পরোপকারী আমরা তাহাকে ততই বেশী বেশী স্বার্থী বলি। তাহার কারণও আছে। অন্যের অভাব দূর করিতে আমার এত মাথা ব্যথা কেন ? তাহারও হেতু আছে। প্রকৃত পক্ষে অন্যের অভাব নয়, আমারই। আমি অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সাহায্য করি নাই ; কিন্তু আমারই কষ্ট কমাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অন্যের দুঃখের সহিত আমার বৃত্তি সমূহের কোনও যোগ না থাকিলে আমি কখনও তাহার আনুকূল্য করিতাম না। ইচ্ছার উদ্রেক বিনা কার্য্য কোথায় ? দুঃখী হইয়াও দুঃখ না জানাইলেই বা দয়ার প্রকাশ কোথায় ? আবার প্রকৃত দুঃখী হইলেও করুণ স্বরে না চাহিয়া জেদ করিলে দয়ার উদ্রেক না হইয়া বিপরীত ক্রোধ বৃত্তির উদয়ে বিভিন্ন ফল প্রসব করে কেন ? যদি পরের ক্লেশ আমার দানের মুখ্য কারণ হইত, তবে সে যে ভাবেই চাউক না কেন, আমি সকল অবস্থাতে এক ভাবেই তাহার প্রতি ব্যবহার করিতাম। সে শত্রু হউক বা মিত্র হউক, করুণ বা কঠোর যে স্বরে হউক চাউক না কেন আমি অন্য ভাব মনে স্থান না দিয়া তাহার ক্লেশাপনোদনই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিব। কিন্তু এই টুকু বুঝিতে হইলেও "আমি" "আমার" বোধ থাকা চাই। যদি অভাব বলিয়া আমি কোন একটা ভাব নিজে অনুভব করিতে না পারি—যদি আমার নিজের অভাবে দুঃখে ক্লেশ বোধ না হয়, তবে অন্যের কাতর কণ্ঠের স্বর আমার দুঃখের উদ্রেক করিবে কিরূপে ? বুঝিলাম যে কাজে বা কথায় আমার মন ভিজিল, গলিল—যাহাতে আমার মন আহত হয়, তাহারই প্রতি আমার কোন ক্রিয়া হইবার সম্ভব। তবে আমি স্বার্থপর নই তো কি ?

আমি শোকে তাপে, বিষয় বিপদে বিপন্ন হইয়া অনেক সময় অনেক কষ্ট পাই, আমার এখনও আমা হইতে ভিন্ন পদার্থের বোধ আছে, সুতরাং স্বতএব সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি—আমার দ্বৈত বুদ্ধি আছে বলিয়াই সুখকে দুঃখ হইতে ভিন্ন দেখি—একটী শান্তিকর অপরটী অশান্তি দায়ক বলিয়া বোধ হয়। তাই সুখের সন্ধানে বিঘ্ন বিনাশনে এত ব্যস্ত। শাস্ত্রে শুনিলাম, কাজে দেখিলাম দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তিনি আমাকে সম্পদে বিপদে, শ্মশানে কাননে রক্ষা করেন তাই ডাকিয়া থাকি—"নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে"। দুর্গানাম যদি জীবের দুর্গতি দলনে সমর্থ না হইত, হরিনামে যদি লোকের কল্যাণ সাধন না হইত, তবে

কামনা যুক্ত জীবের উপাসনায় কি দায় পড়িয়াছে ? ঠাকুরের কাছে মাথা কুটিয়া যদি সফল মনোরথ না হইলাম, তবে সাধে এ কপাল ব্যথা কেন ? নিজের কামনা পূরণই, বাসনা বিমোহিত জীবের মুখ্য লক্ষ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পূজোপাসনা সবই সেই জন্য । তবে জীব স্বার্থপর নয় কিসে ?

নিঃস্বার্থপর পরম যোগীন্দ্রের সাধনাবস্থাও স্বার্থ পরতায় উপর প্রতিষ্ঠিত। কয় জন শুকদেব শঙ্করাচার্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ? বাস্তবিক নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, নিজ কল্যাণ কামনার ইচ্ছা না হইলে জীবের বাসনা বিমুক্তির বাঞ্ছা হইবে কোথা হইতে ? নিম্নের কয়েক পংক্তিই এভাব পরিস্ফুট করিবে ।

কোন সময়ে জনৈক রাজা কোনও সাধুকে বলিয়াছিলেন " আপনিই প্রকৃত নিঃস্বার্থপর পুরুষ । সাধু উত্তর করিলেন—আমি না আপনি ? আমি নিত্য অমূল্য পরম পদার্থ লাভের জন্য, তুচ্ছ সংসার মাত্র ত্যাগ করিয়াছি, যাহা বাস্তবিক কিছুই নয় বলিলেও হয় । আর আপনি কিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ সুখেই তৃপ্ত হইয়া অমূল্য পদার্থের দিকে একবার চাহিয়াও দেখেন না । আমি সর্ব্বোত্তম পদার্থের জন্য বৃথা পদার্থ ত্যাগ করিয়াছি মাত্র ; কিন্তু আপনি তুচ্ছ সংসারের নিমিত্ত সর্ব্ব স্বরূপ পরম পদার্থকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব দেখুন দেখি কে বেশী ত্যাগী, আমি বলি—আপনিই সর্ব্বত্যাগী—পরম নিঃস্বার্থপর ।

এই অর্থেই কবি বলিয়াছেন—

" অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বাতু পৃষ্ঠতঃ ।
স্বার্থমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ স্বার্থ ভ্রংশোহি মূর্খতা ॥ "

তবে নিঃস্বার্থ বাদীদের ব্যাখ্যাত নিঃস্বার্থও স্বার্থ পরতা লোক কে, দোস নাম বদনামের ভাগী করে কেন ? " তেজীয়সাং ন দোষঃ" বড় দোষ বুঝি দোষের মধ্যে গণ্য নয় ? আজ তোমার আমার দোষ তিলে তাল হইয়া দাঁড়ায়, আর সম্রাট্ বাহাদুরের কুকর্ম্ম সুকর্ম্মে পরিণত হয়। তুমি খুন করিলে ফাঁসী—অনন্ত নরক। বড়লোকের, রাজা রাজড়ার দরবারে—অধিকার বিস্তার লালসা লালায়িত তরবারে—রুধির ধারায় ধরণী আপ্লুত হইলে অজস্র গুণবাদ ও অন্তে অনন্ত স্বর্গবাসের ব্যবস্থা। সামান্য সম্পত্তির জন্য লোকের যৎ সামান্য অনিষ্ট ঘটাইয়া হীন ভাবে কার্য্য সাধন করিলে তুমি দস্যু, আবার সেই তুমি জোর জমক দেখাইয়া সৈন্য সামন্ত সহ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশ উচ্ছিন্ন দিলেও বীর বিজেতা সিকন্দর । তুমি অধিক আশা না করিয়া জীবদ্দশোপযোগী যৎ স্বল্প স্বার্থ সাধন জন্য অন্যের সামান্য বৈষয়িক হানি কর, তুমি স্বার্থপর—নিন্দনীয়, আবার ইহ পরলোকের স্বার্থ সাধন জন্য দান ধ্যান করিয়া গ্রহীতার লোভ, যাচঞা প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে তৃণাদপি লঘু চিত্ত করিয়া জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য সুখে বঞ্চিত করিয়া দাও, তুমিই পরম দানী, নিঃস্বার্থ—পুণ্য শ্লোক । এই ভাবেই কি এ ভেদ বুঝিব ? না গ্রীসীয় সুবুদ্ধি সক্রেটিসের মতে মত দিয়া বলিব, যে আধুনিক আখ্যাত নিঃস্বার্থী ও স্বার্থী উভয়েই স্বার্থী, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পুরুষ নিজ প্রকৃত স্বার্থ কি তাহা তিনি জানেন। আত্মার কল্যাণ সাধনই যে তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির মূল, নির্ম্মল বাসনা যোগেই যে ভোগ বাসনার অবসান, ইহা তিনি অবগত আছেন বলিয়াই তিনি নিঃস্বার্থপর। আর স্বার্থী নিজ স্বার্থ কি বুঝেনা, ৫০ ৬০ বৎসরের বিলাস সুখই তাহার স্বার্থের চরম সীমা, দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ সাধনে তাহার স্বার্থ সাধন যে হইল না, আত্মার শান্তি সুখই যে তাহার স্বার্থ সাধনার গূঢ় লক্ষ্য, তাহার সে বোধ নাই তাই সে " স্বার্থপর ", কিন্তু সব দিক, বজায় রাখিয়া, পৌরাণিক অর্থের ব্যত্যয় না করিয়া, আধুনিক অর্থ বিভ্রাট না ঘটাইয়া সকলের সমান সম্মান রাখিয়া, পান হ'তে চূণ না খসাইয়া আমরা আধুনিক অভিধান

* স্বার্থ—পরের * অর্থ * স্বাথ =(নিজ কল্যাণ) + * পর * (অনাত্মীয় বা শত্রু) অর্থাৎ নিজ কল্যাণ সাধনে যাহার অনুরাগ নাই এই ব্যাখ্যা করিলাম।

নিঃস্বার্থ অভিলাষ।

প্রেম ভিক্ষা।

আর্য্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে,
স্বভাবের গুণ চাই বিধাতারে।
আমি হই দুঃখী তাহে ক্ষতি নাই
অন্যে সুখী হলে সুখী হতে চাই
আপনি কাঁদিব, কিন্তু পুছাইব
অপরের আঁখি—ভিক্ষা তব ঠাঁই!
মিথ্যাধন মান চাহে না এ প্রাণ
অসার সংসারে সকলি সমান
পর উপকারে লাগি এই চাই।
এই অভিলাষ করি হে ঈশ্বর।
কষ্টে পরিপূর্ণ আমার অন্তর
খাটিতে থাকিব, খাটিয়া মরিব
মম এই আশা পূর্ণ কর তাই।

ভগবানের সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখন তাঁহার প্রতি সম্যক প্রেম বা ভক্তি জন্মিতে পারে না। ভক্তি স্থূলতঃ নয় প্রকার, কিন্তু শাস্ত্রে ষোড়শ প্রকার ভক্তির উল্লেখ আছে, যথা; অর্চ্চনা, বন্দনা, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, স্তুতিবাদ, তপস্যা, যোগ, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি যাহার যাহা উপাস্য দেবতা তাঁহাকে করিতে২ ক্রমে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আয়ত্তাধীন হইলে ক্রমে চিত্তের মালিন্য দূর হওতঃ এক মাত্র অচলা ভক্তি দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইতে পারিলে এক মাত্র পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়, এবং তখনই জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে। ভক্তিই সাধনার শেষ, ভক্তিই পরম গতি। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, প্রীতিও নাই। যত দিন না বিশুদ্ধ ভক্তি জন্মে, তত দিন জীব পুনঃ পুনঃ পতিত হয়। এক মাত্র ভক্তিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায়। অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। যোগ ও তপস্যাদি সকল কার্য্য, শাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতিতে ভক্তি আছে বটে, তৎ সমুদয় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য। কেন না অনেক সময়ে অনেক মহাত্মা যোগী গণ ও উচ্চ সোপানে উঠিয়াও কখন কখন তাঁহাদের মনে অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু অচলা ভক্তি একবার জন্মিলে আর অবিশ্বাস আসিতে পারে না। বিশ্বাসই আশার মূল এবং বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। সুতরাং ভক্ত সাধক জগদীশ্বরকে প্রিয়রূপে উপলব্ধি করিয়া আর কখনই নৈরাশ্যে মগ্ন হন্ না। একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। যথা,—

"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ তেহি ভক্ত তমা মতাঃ।"

আমার ভক্ত দিগের যাহারা ভক্ত তাহারাই উত্তম ভক্ত। ভক্তি না জন্মিলে এবং ভক্তি যোগ না সাধিলে প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানিবার উপায় নাই। ভক্তি চরম সিদ্ধি, ভক্তি হইতেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়।

"সর্ব্বে নশ্যতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ
নমে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কশ্চ নিরাপদা।"

ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবই নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া গর্ভ যন্ত্রণা ও সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করে। কেবল আমার ভক্ত গণ অমর অজর হইয়া অনন্ত কাল সালোক্য সার্ষ্টি, সামীপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করতঃ ভোগাবসানে আমাতে লীন হয়।

কামরূপ কামাখ্যা।

বশিষ্ঠাশ্রম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাগ, যজ্ঞ, যোগাভ্যাস পূর্ব্বক জ্ঞানের উচ্চতর স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও যখন মহর্ষি বশিষ্ঠের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী

মায়ের জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার ত্রিভুবন মোহিনী রূপে মনকে বিমোহিত করিয়া ত্রিতাপ তারিণীর সুচারু চরণ ছায়ায় প্রাণ জুড়াইবার জন্য কামাখ্যা শৈল হইতে প্রায় ৪॥০ ক্রোশবর্ত্তী বিজন বনে বসিয়া প্রাণ মনে ঐক্য করিয়া মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই পবিত্র স্থানটি "বশিষ্ঠা শ্রম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্ঞানী ভক্ত মহাতপোধনের পবিত্রাসন দর্শনে মন বড় ব্যাকুল হইল। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমি যে দুরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, মায়ের কৃপায় তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিলেও সেই অবধি আমার পদ দ্বয় পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ নাই, এই জন্য দূর গমন করিতে হইলে অনেক সময়েই আমার কোন না কোন বাহনের সাহায্য লইতে হয় ও বিনা চেষ্টায় তাহা আপনা আপনি জুটিয়াও যায়। বশিষ্ঠা-শ্রম গৌহাটী হইতে যাতায়াতে প্রায় নয় ক্রোশ। প্রাতে তথায় গিয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিতে হইবে, এক দিনে ৯ ক্রোশ চলিতে হইবে, পারিব কি না সন্দেহ হইল! আবার ভাবিলাম, যখনই কোথাও মাকে দর্শন করিতে যাই, জন-যান জল-যান বা গজ বাজী বাহনাদি পাই। কেন না মা আমার রাজ রাজেশ্বরী, তিনি পূর্ণাৎ পূর্ণতমা, তাঁহার দ্বারে কিছুরই অভাব নাই। বশিষ্ট বনবাসী ঋষি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি বাহনাদি এখন কোথায় পাইবেন! মনে২ মাকে বলিলাম মা, তোমার পরম ভক্তের পবিত্রাসন দেখিতে যাইব, শক্তি দাও সামর্থ্য দাও যেন পাদচারেই যাইতে সমর্থ হই। অনাদ্যা শক্তি দয়া করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন।

যে পথ গৌহাটী হইতে বরাবর শিলং পর্য্যন্ত গিয়াছে, বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে সেই পথ ধরিয়া প্রায় আড়াই ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার পর যে পথ ছাড়িয়া দক্ষিণ (ডাইন) দিকে যে পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়াও প্রায় দেড় ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার পর আর রাজ পথ নাই। চা-বাগান ও বনের ভিতর দিয়া অবশিষ্ট এক ক্রোশ গমন করিলে বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া যায়। পথের দুই ধারেই শস্য ক্ষেত্র ও উত্তুঙ্গ শৃঙ্গাবলি শোভিত শৈল মালা দৃষ্ট হয়। পথ পার্শ্বে আতপতাপে পথিকগণকে ছায়া দান করিতে পারে এরূপ বৃক্ষাদি নাই বলিলেও হয়। গৌহাটী বাসী ভদ্র গণ ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রচণ্ড আতপ তাপে আপনার যাইতে বড় কষ্ট হইবে। আমি বলিলাম মা আমাকে আঁচল ঢাকা দিয়া লইয়া যাইবেন তিনি আদেশ করিলেই ইন্দ্রদেব জলদজালে সূর্য্য কিরণ নিবারণ করিয়া দিবেন। তাঁহারাও বলিলেন মেঘ হইলেই ভাল, নতুবা বড় কষ্ট হইবে। আমার বিশ্বাস আমার মা আমার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। পাঠক! বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, সমভিব্যাহারী বর্গ সহ আমি বশিষ্ঠাশ্রমের পথে চলিলাম, থরে থরে মেঘ রাশি আকাশে খেলিতে লাগিল, কোথাও বিশ্রাম না করিয়া আমরা একেবারে আশ্রম স্থানে উপস্থিত হই-লাম। পথে একটি হাট বসিয়াছিল, তথা হইতে বশিষ্ঠে-শ্বর মহাদেবের পূজার সামগ্রী ও এ দেহের উপজো-জীবী দ্রব্য গুলি সঙ্গে লইলাম। আমার ন্যায় অসমর্থ ব্যক্তি এক বেগে এত দূর আসিতে পারিবে, এ আশা ছিল না, কিন্তু মায়ের কৃপায় মেঘের ছায়ায় ছায়ায় অক্লেশে আসিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

মহর্ষির আশ্রমের চারি দিকেই গভীর বন। এই বনে বৃহদ্বৃহৎ হস্তী, ব্যাঘ্র, বিশাল বিষধর আদি সর্ব্বদা বিচরণ করে। নির্ঝরিণীর নির্ম্মল নীর ধারা ঝির ঝির ঝরঝর করিয়া বহিতেছে—প্রবাহরাশি যখন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধস্তর হইতে নিম্ন স্তরে পড়িতেছে প্রবল বেগে অন্যান্য প্রস্তর খণ্ডে আহত প্রতিহত হইয়া সুমধুর আনন্দ ধ্বনি পূর্ব্বক ফিরিয়া ঘুরিয়া হাঁসিয়া খেলিয়া নাচিতে ২ বনের ভিতরে ২ চুপি ২ কোথাও বা কুল ২ কল ২ করিয়া তরঙ্গ বালা গণ ক্রীড়া করিতে ২ কোন দিকে ছুটিয়াছে, পর্ব্বত ছাড়িয়া বন অতি ক্রম করিয়া

পলাইতেছে, বিহঙ্গ বর্গ নানা রবে বন আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে, এতাবৎ দেখিতে শুনিতে বড় মনোহর। আকাশের সমস্ত মেঘ কাটিয়াগেল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল—আমরা বনের মাঝে জল প্রবাহে স্নান করিলাম—আনন্দ ও ভক্তি সহ'সে পাষাণ খণ্ডে বসিয়া বশিষ্ঠ মাকে ডাকিতে ২ প্রেমে বিভোর হইয়া সমাধিতে ডুবিয়াছিলেন, সেই আসনকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিলাম। মনে ২ তিরোহিত তপোধনের তত্র বিরাজিত তাপসী শক্তির নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেন এই রূপ জ্ঞান মিশ্রিত প্রেম ভক্তি পাইয়া প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিতে পারি। তদনন্তর শিব মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও প্রকাণ্ড, স্থানে ২ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কারাভাবে স্থানটি কিছু মলিন হইয়াছে। শুনিলাম, গর্ত্ত ও বিলমধ্য হইতে মধ্যে ২ বড় ২ সর্প বাহির হইয়া থাকে। মন্দিরের মধ্য ভাগ অতিশয় অন্ধকার পূর্ণ, দীপালোকে মহাদেব মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। বিশাল কায় শঙ্কর লিঙ্গের পূজা করিয়া হৃদয় মন উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল—সঙ্গে২ সাহেব দিগের ন্যায় তথাকার পাণ্ডাগণের মুখে ত স্থানে ট এবং দ স্থানে ড উচ্চারণ শুনিয়া আরও হাঁসি পাইতে লাগিল (যথা-এটট্ মচণ্ডন বিল্ডল ওঁ নমো বশিষ্ঠেশ্বর নাঠায় নমঃ)।

মন্দিরের নিকটেই এই গভীর বনমধ্যে কাশীবাসী একটী বাঙ্গালী যুবা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী স্বহস্ত নির্ম্মিত এক খানি সুপ্রশস্ত পরিষ্কার কুটীরে বাস করিয়া থাকেন। তথায় বাল গোপালাদির সেবাও আছে। আশ্রম দর্শনার্থীগণ প্রায় তাঁহারই আশ্রয়ে গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীটি ভাল মানুষ, লোক জন গেলে সৎকার পূর্ব্বক স্থান দান করেন ও তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থাদিতে দেবসেবাও এক প্রকার চলিয়া যায়। কিছু না থাকিলে সন্ন্যাসী বনের ফল মূল খাইয়াও দিন কাটাইয়া দেন। আমরা সেই খানেই বিশ্রাম ও ভিক্ষাদির ব্যবস্থা করিলাম। এই অবসরে সেই দেশী একটি রাজার হস্তী পৃষ্ঠে আমারই পূর্ব্ব পরিচিত একটী সন্ন্যাসীকে লইয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী আমাকে কস্মাৎ বশিষ্ঠাশ্রমে দেখিয়া বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন ও আমাকে হস্তী পৃষ্ঠে যাইবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করিলেন। আমি কিন্তু তপস্বীর আশ্রম হইতে হস্তীতে গমন সুখকর বোধ করিলাম না, আবার পাদচারে বেলা ৩টার সময় যাত্রা করিলাম—তখন প্রখর তর রৌদ্র তাপ হইয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ বনে ২ আসিলাম ততক্ষণ কষ্ট হইল না, মাঠে আসিবামাত্র রৌদ্রের তীব্রতেজ দেখিয়া আবার মাকে বলিলাম মা "ঢেকে দে তোর সূর্য্যদেবে নিবীড় মেঘেতে"। মা আমার দীন দয়াময়ী, অমনি স্থান হইতে কান পাতিয়া শুনিলেন—দেখিতে ২ ঘোর মেঘ আকাশ ছাইয়াগেল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, গা জুড়াইয়া গেল। (এই সময়ে যে দৈবী লীলা দেখিলাম—তাহা সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে সাহস হইতেছে না।) প্রবল ধারায় বারি বর্ষণও হইল।

পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহারা কামরূপ কামাখ্যার সীমায় মধ্যে বাস করিয়া দেহ ত্যাগ তাহারা মহাপাপী হইলেও, মুক্তি লাভ করিত তাহাতে যমরাজের প্রার্থনায় বিষ্ণু আদির অনুরোধে মহাদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আর কেহ কামরূপে বাস করিতে পাইবে না। তাহাতে শিবদূত গণ সকল লোককে তাড়াইয়া দেয়, অবশেষে বশিষ্ঠকেও বিতাড়িত করে। বশিষ্ঠ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও এবং মুক্তি আদি কিছু চাহেন না, কেবল মাকে একবার দেখিতে চাহেন, এতাবদ্বিজ্ঞাত করিলেও, শিবদূত গণ তাঁহাকে কামরূপ ছাড়িতে বাধ্য করিল। মহর্ষি কুপিত হইয়া বলিলেন, মা, আমাকে যেমন দেখা দিলে না, আমি অভিসম্পাত করিতেছি, যে তোমার এখানে কোন সাধকই তোমার দর্শন পাইবে না—সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। ঋষির রাগে গরিব সাধকেরই হানি হইল।

বস্তুতঃ কামরূপ এখন আর সিদ্ধি সাধন শ্রুত হওয়া যায় না। যৌবন সুলভ চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া "ভেড়া" হইয়া থাকে। কামরূপের কামিনীগণ বিদেশাগত ব্যক্তি গণকে ভেড়া করিয়া রাখিত না; কিন্তু যাহারা সেকালে এই দুর্গম দেশে কোন প্রকারে আসিত, আর সহসা দেশে যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না, তাহারাই অগত্যাই ভেড়া হইয়া থাকিত।

একনাথ মহারাজ চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একনাথের গুণে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু কএক জন নীচ-মনা ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা একনাথকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। ইহার একটী কারণ এই যে, যাঁহারা কথকতা করিতেন তাঁহারা একনাথের সমক্ষে হীন-প্রভ হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষেও ব্যাঘ্যাৎ হইতে লাগিল। একনাথ কথকতা আরম্ভ করিলে আর অপরের কথা শুনিতে কেহ গমন করিত না। আর একটী কারণ এই যে, একনাথের সদৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং তাঁহার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকে কদাচার ত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্যবস্থা লইবার আবশ্যকতা রহিল না। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অর্থোপার্জ্জনের ব্যাঘাৎ হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ একনাথের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন, এবং নানা প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একনাথ অধ্যাপক মহাশয়দের কটু কথা শুনিয়াও শুনিতেন না, এবং তাঁহার প্রতি যে অত্যাচার হইত তাহা অম্লান-মুখে তাহা সহ্য করিতেন। প্রত্যুত, তাঁহাদের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একনাথের এই অমানুষিক ব্যবহার ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া, অধ্যাপকগণ আপনাআপনি লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইলেন। লোকের অত্যাচার একনাথ যে কত দূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন, নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটীতে তাহা প্রতীয়মান হইবে—এক দিন তিনি গোদাবরী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক জন যবন তাঁহার অঙ্গে থুৎকার করিল। একনাথ যবনকে কিছু মাত্র না বলিয়া, পুনরায় নদীতে গিয়া স্নান করিলেন। একনাথ প্রত্যাগমন করিলে, সেই যবন পুনর্ব্বার তাঁহার অঙ্গে থুৎকার করিল। একনাথ পুনর্ব্বার স্নান করিয়া আসিলেন। এই ব্যাপার সমস্ত দিন ব্যাপিয়া চলিল। কথিত আছে যে, দিবা অবসান হইলে, অত্যাচারীর বাক্ রোধ হইল। এই অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং ইহা দেখিবার জন্য লোকে দলে ২ আসিতে লাগিল। অত্যাচারী যবন বুঝিল যে, একনাথ ঈশ্বর-অনিত ব্যক্তি এবং তাহার বাক্ রোধ হওয়া, ঈশ্বর কর্ত্তৃক দণ্ড ব্যতিত আর কিছু নহে। তখন সে কর-যোড়ে একনাথের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল, এবং ইঙ্গিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একনাথ বুঝিলেন যে, সে ব্যক্তি অনুতাপ করিতেছে। তখন তিনি হস্ত উঠাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অমনি সে কথা কহিতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং একনাথ যে এক জন মহাপুরুষ তৎপক্ষে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। একনাথের পাণ্ডিত্য ও রচনা শক্তির খ্যাতিও চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এমন কি, কাশীধামের পণ্ডিতগণও তাহা অবগত হইলেন। একদা তথাকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার কয়েকটী কুট কবিতা রচনা করিয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য, একনাথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। একনাথ এই কয়েকটি কবিতার চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত প্রবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী দাক্ষিণাত্যের

ব্রাহ্মণ, সুতরাং একনাথের ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা অতি চমৎকার হইয়াছিল। তিনি নিজে একনাথকে মনে ২ সাধুবাদ দিলেন, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণকে তাহা দেখাইলেন। ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন, এবং মুক্ত কণ্ঠে একনাথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত এতদূর পর্য্যন্ত একনাথের অনুরাগী হইলেন যে, তিনি পৈঠনে গমন করত একনাথের সহিত সদালাপ করিলেন।

একনাথ শিশু দিগকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। যদি দেখিতেন, তাহারা বাটী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইতেন। কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র যে কোন ব্যক্তির সন্তান হউক না কেন, সকলকেই কোলে করিয়া লইতেন, এবং ভাল বাসা দেখাইতেন। যদিও একনাথ কদাচারী ব্রাহ্মণ গণকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তিনি তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। কি সদাচারী কি কদাচারী, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সকলেরই যাহাতে উন্নতি হয় তৎপক্ষে একনাথ যত্নবান ছিলেন। তিনি যে কেবল মন্দিরে বসিয়া উপদেশ দিতেন এমন নহে, সাবকাশ মতে লোকের বাটীতে গমন করিয়া কদাচারী ব্যক্তিকে নানা উপদেশ দ্বারা সৎপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং সদাচারী ব্যক্তি যাহাতে ধর্ম্ম পথে আরও অগ্রসর হইতে পারেন তৎপক্ষে যত্নবান হইতেন। মন্দ লোককে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা সে আপনিই লজ্জিত হইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিত। এ প্রকার ঘটিয়াছে যে কেহ তাঁহার বাটীতে চুরি করিতে আসিয়া দ্রব্যাদি হস্ত-গত করিতেছে এমন সময়ে একনাথ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। চোরও তাঁহাকে দেখিয়া কতক দ্রব্য লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল, একনাথ উচ্চৈস্বরে তাহাকে যাইতে বারণ করিতেন, এবং আর যে ২ দ্রব্য সে লইতে ইচ্ছা করে তাহা লইয়া যাইতে বলিতেন। ইহাতে চোর অপ্রতিভ হইত, এবং ক্রমে ২ চৌর্য্য বৃত্তি ত্যাগ করিত।

সাধু ব্যক্তির যে ২ গুণ থাকা আবশ্যক একনাথের জীবনে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি এই রূপে সাধু চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেনঃ—

> অন্তর নির্ম্মল যাঁর, মধুর বচন।
> না থাকুক গল দেশে রুদ্রাক্ষ ধারণ॥
> বহুদর্শী যিনি, আছে আত্মজ্ঞান যাঁর।
> না থাকুক মস্তকেতে জটাভার তাঁর॥
> কুনয়নে রমণীরে না দেখে যে জন।
> না থাকুক অঙ্গে তাঁর ভস্মানুলেপন॥
> পর দ্রব্যে মন্দ আর নিন্দায় যে মূক।
> সেই ত প্রকৃত সাধু সদা তার সুখ॥
> অনেকেই ক'রে থাকে উপদেশ দান।
> সেই মত কার্য্য করে কোথা সে প্রমাণ?
> বাক্য মত কার্য্য যাঁর সেই মহাজন।
> তাঁহার চরণ সবে করহ পূজন॥

এই প্রকারে লোকের হিত সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়া একনাথ পরম আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অনেক কদাচারী ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন হইলেন, এবং যাঁহাদের মন ধর্ম্ম-প্রবণ ছিল তাঁহারাও সমধিক উন্নতি লাভ করিলেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি প্রকারে পরমার্থ লাভ করা যায় একনাথের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। একনাথ, দুইটী কন্যা এবং একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রটী সমধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এবং হরি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

একনাথের জীবন বৃত্তান্তে কএকটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। এই ঘটনা গুলির উপর পাঠকগণ বিশ্বাস স্থাপন করুন বা না করুন, ইহার মধ্যে একনাথের যে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবশ্যই তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে। এই জন্য তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। একদা এক নাথ তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, খাদ্য দ্রব্য সকল অতি উত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। বাটীর বাহিরে পর্য্যন্ত তাহার সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়াছিল। একনাথের বাটীর নিকট দিয়া কএক জন হীন জাতীয় ব্যক্তি গমন করিতেছিল। তাহারা এই সুগন্ধ পাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আহা! কি উত্তম গন্ধ পাইতেছি। এ প্রকার উত্তম দ্রব্য আমাদের ভাগ্যে ঘটে কি? এই কথা গুলি একনাথ শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং সেই সকল খাদ্য দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে উত্তম রূপে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর, ব্রাহ্মণদিগের জন্য পুনরায় রন্ধন করাইলেন। ব্রাহ্মণ গণ শুনিতে পাইলেন যে একনাথ নীচ লোক দিগকে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা অপমানিত বিবেচনা করিলেন, এবং একনাথের প্রতি মন্দ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া একনাথ স্থির ভাবে রহিলেন। কিয়ৎ পরে দেখিলেন, কএক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একনাথ তাঁহাদিগকে সাদরে ভোজন করাইলেন। পরে তাঁহারা একে ২ বিদায় লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। একনাথের প্রতিবাদী ব্রাহ্মণ গণ দূর হইতে দেখিলেন, কএক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া অবাক্ হইলেন। ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেহ ২ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, কেহ ২ প্রতিবাসী। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পৈঠন বাসীগণ স্থির করিল যে, এক নাথ এক জন ঈশ্বর জানিত ব্যক্তি। তখন তাহারা একনাথের নিকটে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একনাথ তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

পৈঠনে এক জন সদাচার সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিত। সে জ্ঞানবান্ ও পরম ভক্ত ছিল। তাহার নাম ছিল রামা। তাহার স্ত্রীও সচ্চরিত্রা ও সুশীলা ছিল, কিন্তু জাত্যংশে তাহারা হীন ছিল। উভয়ে প্রতি দিন একনাথের কথা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিত, এবং উভয়েরই একনাথের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। উপদেশ দিবার সময়ে একনাথ বলিতেন যে জাতি বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। এক নাথের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া রামা বিবেচনা করিল যে, একনাথ যখন জাতি মানেন না, তখন তাঁহাকে সে ভোজন করাইতে পারে। এই স্থির করিয়া সে এক দিন একনাথকে নিমন্ত্রণ করিল। এক নাথ জানিতেন যে রামা এক জন পুণ্যবান্ ব্যক্তি এবং পরম ভক্ত। তিনি তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রামার বাটীতে গিয়া মহা আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া কএক জন ব্রাহ্মণ রামার বাটীতে গমন করিল, এবং দেখিল যে এক নাথ তথায় ভোজন করিতেছেন। তাহারা বাহিরে আসিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, কএক জন ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাদিগকে একনাথের শূদ্রের বাটীতে ভোজনের কথা বলিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া সে ব্রাহ্মণ গণ বিস্ময়ান্বিত হইল। কারণ, তাহারা একনাথকে তাঁহার বাটীতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরে তাহারা সকলেই এক নাথের বাটীতে গিয়া দেখিল যে, তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। ইহার পর, তাহারা রামার বাটীতে গেল। সেখানে গিয়া দ্বারের নিকট হইতে দেখিল যে একনাথ তাম্বুল ভক্ষণ করিতেছেন। তাহারা একনাথের নিকটে

যাইতেছিল। এমন সময়ে তিনি অদৃশ্য হইলেন। কোথায় গেলেন কেহ স্থির করিতে পারিল না। এই ব্যাপার যে দেবতার লীলা, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল।

যে সকল লোক একনাথের পুরাণ ব্যাখ্যা শুনিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক ছিল। ইনি রূপে এবং গুণে সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা সেই স্ত্রী লোকটীর দেব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেন। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কুদৃষ্টিতে দেখিত। কিছু দিন পরে, পুরাণ ব্যাখ্যা শেষ হইল পর, দুটী লোক মন্দ অভিপ্রায়ে এই রমণীটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। স্ত্রীলোকটী ইহাদের মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দ্রুত পদ সঞ্চারে গোদাবরীর দিকে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে নদীর তীরে উপনীত হইয়া জলে নামিল। পাছে রমণীটী আত্ম হত্যা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া লোক দুটী তাঁহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। এমন সময়ে গোদাবরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, এবং স্ত্রী লোকটী লোক দুটীকে রোষ নেত্রে অবলোকন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। এই ঘটনার বিষয় সকলে জানিতে পারিল। একনাথেরও তাহা কর্ণ-গোচর হইল। পর দিন পুরাণ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একনাথ উক্ত ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রী লোকটী গঙ্গা দেবী। পরে, শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে লোকের চরিত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে কেহ কখন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মন যার অপবিত্র, বাহিরের অনুষ্ঠানে সে কখনও পরমার্থ লাভ করিতে পারে না।

ধর্ম্মোৎসব।

ছাপরা।

১০ই হইতে ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া ছাপরা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। সহরের ভিন্ন ২ প্রধান ২ স্থানে সভার অধিবেশন হওয়ায় সমস্ত সহর কয় দিন উৎসবময় হইয়াছিল। প্রতিদিন সভায় লোকে লোকারণ্য হইত। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস মহাশয় কয়েক দিন নানাবিধ জ্ঞান গম্ভীর ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোক সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গের সমাগমও হইয়াছিল। এই উৎসবোপলক্ষে ভগবানের পূজা, পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, দীন দরিদ্রকে দানাদিরও কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। বালক বর্গের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার মহা মহোৎসবও এই সঙ্গে হইয়া গেল। এই সভায় স্বামীজী "আদর্শ-মানস" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ সভাটি স্বামীজীর প্রেরণায় বেহার বাসী দিগেরই উৎসাহ ও উদ্যমের ফল। এ সভা বিহারের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অনেক উন্মার্গ-গামীকে সুপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ছাপরাবাসী বাঙ্গালী গণকে এ সভার সহযোগী হইতে দেখিলে আমরা আরও সুখী হইব।

বাঁশ—বেরিলী।

১৭ ই হইতে ২১ এ পৌষ পর্য্যন্ত বেরিলী সদ্ধর্ম্মামৃত বর্ষিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন ও মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে পূজা, পাঠ, বক্তৃতা ও সংস্কৃত পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক বর্গকে পারিতোষিক দান ও পণ্ডিত বর্গের সৎকার হইয়াছিল। ধর্ম্মোপদেশ দান করিবার জন্য কাশী হইতে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কপূরথলা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবর দয়াল বেদান্ত ভূষণ আদি আহুত ও উপনীত হইয়াছিলেন। লাহোর, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, এবং নিকটবর্ত্তী বহুতর স্থান হইতে অনেক লোক উৎসব

দর্শনে আসিয়াছিলেন। বেদান্ত-ভূষণের শ্রাদ্ধ তত্ত্ব বিষয়িণী বক্তৃতা অতি সুমধুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল। দয়ানন্দী মতের অসারতা দেখাইয়া তিনি বেদ ও শ্রুতি হইতে বহুল প্রমাণ সহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের বেরিলীতে এই প্রথম পদার্পণ। তাঁহার মুখে হিন্দী ভাষায় দুই দিন "উপাসনা তত্ত্ব" ও এক দিন "কৃষ্ণলীলার" আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতা মাত্রেই চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়াছেন। প্রেমের তরঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয় গদ্‌গদ হইল, কত শত সম্ভ্রান্ত শির তাঁহার চরণে লুটাইল, কত শত উপাধি ধারী, রায় বাহাদুরাদির হস্ত তাঁহার পদ সেবা করিল, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার বক্তৃতা বক্তৃতা নহে, যেন প্রেম লহরী মালা স্বর্গের মন্দাকিনীর ন্যায় সভ্য গণকে পবিত্র করিল। তাঁহার মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য কত লোকে লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় আদি স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিল, কিন্তু স্বামীজীর অবকাশাভাবে যাওয়া হইল না। সভার উৎসব ফুরাইল, বিদেশী লোক সকল চলিয়া গেল, বেরিলীর সম্ভ্রান্ত লোক বর্গ স্বামীজীকে ছাড়িলেন না। এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন স্বামীজীকে তাঁহারা রাখিলেন ও সেবা শুশ্রূষা সহ তাঁহার নিকট শাস্ত্রীয় নানা রহস্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এবার উৎসবে স্বামীজীর সমাগমে বেরিলীবাসী বর্গের হৃদয়ের অনেক অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, অনেক বিপথগামী সদ্ধর্ম্মামৃত পানে জন্ম সফল করিল।

কাশী।

কাশী—মহাশ্মশান। সুতরাং এখানে উদ্যম উৎসাহ, চেষ্টার স্পন্দন অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে সাধক চেষ্টা করিলে শ্মশানকে জাগ্রত করিতে পারেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং দেখিলামও তাই। বাঙ্গালী কাশী বাসী গণের মধ্যে সাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উদ্যম পূর্ব্বে বড় দেখা যাইত না। পরিব্রাজক মহাশয় ভা, আ, ধ, প্র, সভার কার্য্যালয় মুঙ্গের হইতে কাশীতে উঠাইয়া আনিবার পর হইতে মহাশ্মশানের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া ক্রমশঃ চেষ্টা ও উদ্যাম শিখা জ্বলিয়া উঠিল—জড়তা ও নিস্পন্দতা ধীরে২ দগ্ধ হইতে লাগিল। সভা সমিতির যে পবিত্র পদ্ধতি বিস্তার করিয়া তিনি ভারতের চারি দিকে ধর্ম্মালোচনার পুনরুদ্দীপনা ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন, সেই আদর্শ লইয়া এখানেও হরি সভা, হরি ভক্তি প্রদায়িনী সভা, হরি নাম প্রচারিণী সভা, বালরঞ্জিনী সভা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সকল সভাই যথোচিত উৎসাহে কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। কাশীর ন্যায় মহাতীর্থে এই রূপ ধর্ম্মালোচনার স্থান যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা আনন্দিত হইব।

২রা হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার" বার্ষিক মহোৎসব হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের সাধু ও সম্পাদকীয় প্রযত্নেই সভাটির কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতেছে। উৎসব কালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্ক ভূষণ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র স্মৃতি তীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্র মোহন চূড়ামণি, ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার্থী বর্গের যোগ্যতানুসারে কিছু২ পারিতোষিক দান ও বৃত্তির ব্যবস্থা করাও হইয়াছে। কাশীস্থ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে প্রতিষ্ঠাভাগী হইতে দেখিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনি ভারতে ভৈরব রবে পুনর্ব্বিঘোষিত হউক।

বেদ বিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়। মাহ অগ্রহায়ণ এবং পৌষ ১২৯৮।

মুষ্টি ভিক্ষা		অগ্রহায়ণ	পৌষ
শ্রী পূর্ণানন্দ সেন	দাঁইহাট	১॥০	"
" আদ্যনাথ বিশ্বাস	লোকনাথপুর	২৲	"
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	সয়দাবাদ	৫৲	"
" নবীনচন্দ্র দাস	জাতুয়া শ্রীহট্ট	৶১০	"
" মধুসূদন রায়	দিনাজপুর	১০৲	"
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	কুণ্ডলা	১০৲	১২॥০
" রমনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	সিকারপুর	১০৷১০	"
" দীননাথ পাত্র	রামপুরহাট	৩।০	৪॥/০
" চণ্ডী চরণ ঘোষ	কলিকাতা	৸০	"
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	সাঁতঘরা	৸০	॥০
" তারকব্রহ্ম সেন গুপ্ত	স্যানিথা	১২৲	"
" চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য	খোকসাবাড়ি	"	৩৲
" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়	ডুমরদহ	"	৩॥০
" লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	ঝালদহ	"	১৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরীশাল	"	১০৲
" অক্ষয়চন্দ্র আচার্য্য	কুমড়াবাদ	"	৫।৴০
" গিরীশচন্দ্র শর্ম্মা	ধলা	"	১৸০
" আলোকনাথ দে	নারপাটী শ্রীহট্ট	"	১০৲
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	মাটবেড়িয়া	"	২॥০
" রমনীমোহন মল্লিক	মেহেরপুর	"	২॥৶০
" গোবিন্দচন্দ্র সুর	শ্যামপুর বরীশাল	"	৩৲
" চন্দ্রভূষণ সেন	কলিকাতা	"	১০৲
" প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	মতিহারি	"	২॥৶০
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়	গদাইপুর	"	।৴০
" সুনৎকুমার রায় চৌধুরী	শ্রীহট্ট	"	৫৲

এককালীন দান।		অগ্রহায়ণ	পৌষ
শ্রী উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সিমলা	১৫৲	"
" রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ	বাঁকিপুর	৫৲	"
" দুর্গাপ্রসাদ বাবু	ছাপরা	১০৲	২৸০
" দীননাথ পাত্র	রামপুরহাট	৶১০	"
" নেপালচন্দ্র কুমার	ব্যাটরা	৸০	"
" বিপিনবিহারী রায়		৸০	৸০
" উমাপদ চক্রবর্ত্তী	মাদ্রাজ	"	১৲
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	"	১৲
" রমণী মোহন মল্লিক	মোহরপুর	"	২।৶০
" যদুনাথ সাহ	ছাপরা	"	১০৲
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়	গদাইপুর	"	৴০

মাসিক বৃত্তি।

		অগ্রহায়ণ	পৌষ
লবঙ্গসুন্দরী বৃত্তি	কাকিনা	১০৲	১০৲
শ্রীশ্রীগোপালদাস বসু	বাজিতপুর	।০	"
" বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়	কালীঘাট	৫৲	"
" মহারাজা	দ্বারভাঙ্গা	২০৲	"

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম্ম প্রচারক ।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত ॥

১৪শ ভাগ
১১শ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১৩
ফাল্গুন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্বেদগুপ্তয়ে ।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্ম সংরক্ষণায় চ ॥

বেদ ও ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি জন্য স্বীয় তপোবলে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ সকলকে সৃজন করিয়াছেন।

সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠা স্তেভ্যোহপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ ॥

ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে বেদপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে আবার বেদোক্ত ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, এবং ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ॥

নবিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা ।
যত্র বৃত্তমিমেচোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতং ॥

কেবল মাত্র বিদ্যা কিম্বা তপস্যা দ্বারা, সুপাত্র হয় না ; যাঁহাতে বিদ্যা ও তপস্যা উভয়ই আছে, তিনিইউত্তম পাত্র।

গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতং ।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥

আত্ম মঙ্গল কামী ব্যক্তি গো, ভূমি, তিল, হিরণ্যাদি বিধি পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবেন । অপাত্রে কদাচ দিবেন না।

বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন নতু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মান মেবচ ॥

বিদ্যা ও তপস্যা হীন ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়, প্রতিগ্রহ করিলে দাতার সহিত নরকে গতি হয়।

দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমেত্তেতু বিশেষতঃ ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধা পূতন্তু শক্তিতঃ ॥

স্বীয় সামর্থ্যানুসারে প্রত্যহ সৎপাত্রে দান করিবে ; গ্রহণাদিতে বিশেষ করিয়া দান করা উচিত। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাচককেও সাধ্যমত দান করিবে।

হৈমশৃঙ্গী খুরৈঃ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা ।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণীগৌঃ সদক্ষিণা ॥

সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ, রৌপ্য মণ্ডিত খুর, সবস্ত্রা সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা ও কাংস্য দোহনীর সহিত দান করিবে।

দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসম্মিতান্ ।
কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চ সপ্তমং কুলং ॥

যতগুলি গোদেহে লোম থাকে দাতা তত বৎসর স্বর্গ ভোগ করেন। কপিলী গাভী দান করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়।

সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীং।

দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেণ বিধিনাদদৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সবৎসা উভয়তোমুখী গাভী দান করিলে, গাভীর ও বৎসের লোম পরিমিত বৎসর দাতার স্বর্গেস্থিতি হয়।

যাবদ্বৎসস্য পাদৌদ্বৌ মুখং যোন্যাঞ্চ দৃশ্যতে।

তাবদ্গৌ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং নমুঞ্চতি ॥

প্রসব সময় যোনি মুখে বৎসের সম্মুখের পদদ্বয় ও মুখ যখন দৃষ্ট হয় তৎকাল হইতে গর্ভ মোচনের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত গাভীকে উভয়তোমুখী কহে ; আর তৎসময় গাভী পৃথিবী তুল্যা হয়। (অর্থাৎ সেই অবস্থায় দান করিলে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়)।

যথাকথঞ্চিদ্দত্ত্বাগাং ধেনুম্বা ধেনুমেববা।

অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥

সবৎসা বা অবৎসা যে কোন প্রকার গাভী হউক না কেন, যদ্যপি অরুগ্না ও অক্লিষ্টা হয়, তবে দাতা স্বর্গলোকে পূজিত হয়েন ॥

ক্রমশঃ।

একনাথ মহারাজ চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদা একনাথ রজনীতে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে চারি জন দস্যু তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ তাহারা অন্ধ হইল। তখন তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিল। এই গোলযোগে এক জন পড়িয়া গেল এবং শব্দ হওয়াতে একনাথ জাগিয়া উঠিলেন। দস্যুদের দুরাবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন এবং একে ২ তাহাদের চক্ষুতে হস্ত বুলাইলেন। তখনি তাহারা দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনাতে দস্যুগণ বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহারা একনাথকে এক জন মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিল। কুকার্য্য করাতে তাহারা ভীত হইয়া দ্রব্য গুলি ফেলিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু একনাথ তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং তাহারা যে ২ দ্রব্য লইয়াছিল তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। দস্যুগণ অতিশয় অপ্রতিভ হইল। তাহারা একনাথের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কখন ঐ প্রকার কুকার্য্য করিবে না এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এক সময়ে, পৈঠনের এক জন ব্রাহ্মণ, একনাথের কাছে এক টুকরা সোণা রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এক নাথ তাহা দেবমন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে, নির্ম্মাল্যের সহিত তাহা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কএক বৎসর পরে ব্রাহ্মণ ঠাকুর প্রত্যাগমন করিয়া একনাথের নিকট সোণার টুক্‌রা টুকু চাহিলেন, একনাথ মন্দিরের সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সে দ্রব্যটী পাইলেন না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া একনাথের প্রতি দুর্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। একনাথ শান্তভাবে সমুদয় সহ্য করিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর একটু স্থির হইলে পর, একনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীর তীরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইলে পর, একনাথ নদী হইতে কএক টুক্‌রা পাথর তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা হইতে ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজের দ্রব্য উঠাইয়া লইতে বলিলেন। একনাথ তাঁহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন এই বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর একনাথের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু একনাথ বিশেষ রূপে অনুরোধ করাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার হস্ত হইতে এক টুকরা পাথর উঠাইয়া লইলেন। তাঁহার হাতে আসিবা মাত্র, প্রস্তর খণ্ড সুবর্ণে পরিণত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিস্ময়ান্বিত

হইলেন, এবং একনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একনাথের অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার পরহিত পরায়ণতা এবং শান্ত প্রকৃতি, লোকের মনকে এ প্রকার আকর্ষণ করিয়াছিল যে, তাঁহার নাম তাহাদের কাছে প্রাতঃ স্মরণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার দর্শন তাহাদের কাছে দেব দর্শনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, এবং তাঁহাকে চিরঃস্মরণীয় করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন করিবার জন্য সকলেই যত্নবান্ হইল।

এখন আমরা একনাথের কবিত্ব ও গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তিনি এক জন সুকবি ছিলেন। তাঁহার দ্রুত রচনার ক্ষমতা এত ছিল যে, তিনি কথা কহিতে ২ অথবা ভ্রমণ করিবার সময়ে অনর্গল কবিতা রচনা করিতেন। কখন শ্লোক ও পদ এবং কখন বা অভঙ্গ, পাদচারণা করিবার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। তাঁহার শিষ্যগণ এই সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কএক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা অতি প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট, এবং তাঁহার বর্ণনা শক্তিও যথেষ্ট ছিল। লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার গ্রন্থ গুলি পাঠ করিত। ভাষান্তর করিবার ক্ষমতাও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। একটী ঘটনা সূত্রে একনাথকে কাশীধামে যাত্রা করিতে হয়। সে ঘটনাটী এই। ভাগবৎ গ্রন্থ খানি যত দূর বহুল প্রচার হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, ইহা বিবেচনা করিয়া একনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। লোকে সহজে তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে এই বিবেচনা করিয়া তিনি সরল ভাষায় তাহার টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই টীকা এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা হইতে লাগিল যে, এক একটী শ্লোক এক একটী অধ্যায়ে পরিণত হইল। এই গ্রন্থের দুইটী অধ্যায় সমাপ্ত হইলে এক জন ব্রাহ্মণ তাহার প্রতিলিপি করিয়া লইলেন, এবং ইহা পাঠ করা তাঁহার দৈনিক কার্য্য হইল। কিছু কাল পরে, ইনি কাশী ধামে গমন করিলেন, এবং তথায় গঙ্গার তীরস্থ কোন সোপানের উপর বসিয়া এই অধ্যায় দুইটী প্রত্যহ পাঠ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইহা শ্রবণ করিতেন, তাঁহারা ইহার ভাব ও লালিত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোহিত হইতেন। সে সময়ে, কাশীতে এক জন মহাবিদ্বান্ সন্ন্যাসী ছিলেন। এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে গিয়া ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা কথা শুনাইলেন। স্বামীজি তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাহা আনাইয়া স্বামীজির হস্তে অর্পণ করিলেন। স্বামীজি তাহা পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু, একটী কারণে তিনি ব্যথিত হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে সকলেই তাহা পাঠ করত শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবে। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের মর্য্যাদা হ্রাস হইবে। এই বিষয় আলোচনা করিতে ২ তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে উক্ত টীকা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং, টীকা কর্ত্তার নাম অবগত হইয়া তিনি একনাথকে আনিবার জন্য তাঁহার কএক জন শিষ্যকে পাঠাইলেন। ইঁহারা পৈঠনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, একনাথ নাথ-মন্দিরে কথা কহিতেছেন। তথায় উপস্থিত হইয়া একনাথের কথা শুনিতে লাগিলেন। কথা শেষ হইলে পর, তাঁহারা স্বামীজীর লিখিত পত্র একনাথকে দিলেন, এবং তাঁহাকে কাশীধামে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি একনাথকে তাঁহার প্রণীত ভাগবতের টীকা লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। একনাথ, স্বামীজির আদেশ অগ্রাহ্য করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। ভাগবতের টীকার পাঁচ অধ্যায় সঙ্গে লইয়া তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া একনাথ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিঞ্চিৎ আলাপের পর প্রণীত টীকা

তাঁহার নিকট হইতে লইয়া পাঠ করিলেন। পরে, একনাথকে স্বামীজী সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। ইহা শুনিয়া একনাথ ধীর ভাবে বলিলেন যে, এরূপ করাতে ত আরো উত্তমই হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, ভাগবতামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ শাস্ত্রে ত এ সম্বন্ধে কোন নিষেধ বাক্য নাই। ইহার পর, একনাথের সহিত স্বামীজির নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কাশীর পণ্ডিতগণ সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি তর্ক করিতে ২ রোষান্বিত হইতেন, কিন্তু, একনাথ অতিধীরভাবে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেন। একনাথের বক্তৃতাশক্তি এবং বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখিয়া শ্রোতাগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা একস্বরে একনাথকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। স্বামীজি একনাথের কোন ২ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা তিনি একনাথের কাছে পরাভব স্বীকার করিলেন। কাশীধামের প্রধান পণ্ডিতকে পরাভব করাতে একনাথের সুখ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি পণ্ডিতগণের অনুরোধে তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন।

ক্রমশঃ।

পৈতৃকত্ব। (Heredity)

ভাদ্র মাসের "ধর্ম্ম প্রচারকে" "জন্মান্তর" প্রবন্ধে পৈতৃকত্বের (Heredity) উল্লেখ আছে। স্থানাভাব বশতঃ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তখন দিতে পারি নাই। আজকাল পাশ্চাত্য বুদ্ধিতে আমাদের শাস্ত্রের আলোচনা করিলে অনেক কথা আধুনিকগণের নিকট সুসঙ্গত এবং সুস্পষ্ট হয়। তাই পাশ্চাত্যগণ-সিদ্ধ বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা "জন্মান্তরের" আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্তগুলির বিস্তৃত পর্য্যালোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেই কারণে আমরা প্রথমেই পৈতৃকত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলিয়া রাখি যে ডারবিণ, ওয়ালেস এবং বাজম্যান কৃত গ্রন্থ সকলের অনুসরণে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এবং যুক্তি দ্বারা ইহার কলেবর পরিপুষ্ট এবং সেই সিদ্ধান্ত সকলের অনুগমন করিয়া আমরা শাস্ত্রানুমোদিত নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিব।

মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ব অথবা স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব মিলাইয়া মনুষ্য সৃষ্টি। মাতৃ অণ্ডের সহিত পিতৃ বীর্য্য (Sperm) সম্মিলিত হইয়া এক অদৃষ্ট ও অপূর্ব্ব উপায়ে জীব সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনুমান হয় যে পিতৃমাতৃদোষগুণ পুত্রে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব। এবং বহুতর পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পুত্র পিতার আত্মজ, আকারান্তর সামান্য ভাবান্তর মাত্র। শুধু তাই নয়, পিতার পাপ পুণ্যের ভাগীও পুত্র। এমন কি একজনের দোষেই বংশ নষ্ট হয়; শত ২ বৎসর পর্য্যন্ত, বংশ বংশান্তর পর্য্যন্ত একজন মহাপাপীর পাপ প্রবাহ ছুটিতে থাকে। স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব কি তাহা পাশ্চাত্য কোন বিজ্ঞান দর্শনের দ্বারা এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। কেবল মাত্র অবয়ব পার্থক্যে যে স্ত্রী পুরুষের নির্দ্ধারণ হয় তাহা নহে। কেন না প্রত্যেক জীবই স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব যুক্ত। চলিত ভাষায় যাহারা পুরুষ তাহাদের স্ত্রীশক্তি সম্মূঢ় অবস্থায় (Latent form) আছে মাত্র। দেখা গিয়াছে যে অনেক বৃদ্ধা পক্ষী অতি জরাবস্থায় তাহাদের অণ্ডস্থালী পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাকেই "Secondary sexual character" বলে। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ, ইহার অনেক আশ্চর্য্য২ ঘটনা উল্লেখ করিতে পারেন। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাউক স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব দুইটি

বিভিন্ন শক্তি বিশেষ। ইহারা জড় শক্তি নহে—সজ্ঞান জীব-শক্তি। Protoplasm এবং Germ-plasm এই দুই সজীব কীটাণু সঞ্চয়ে প্রাণী জগতের উৎপত্তি। নির্জ্জীব জড় শক্তির সম্মিলনে কোন প্রাণীর উৎপত্তি অদ্যাবধি কোন বৈজ্ঞানিকই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কেন এমন করিয়া—কাহার প্রেরণায় জীবোৎপত্তি হয়, কি উপায়ে, কোন্ প্রথানুযায়ী, কি নিয়মে গর্ভস্থ ভ্রূণ মনুষ্যাকার ধারণ করে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে পুরুষের বামার্দ্ধ স্ত্রীময়, দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষময় এবং উহাই প্রবল ও শক্তিমান্। স্ত্রীগণের দক্ষিণার্দ্ধ স্ত্রীময় এবং প্রবল ও শক্তিমান্, এবং বামার্দ্ধ পুরুষময় ও সম্মূঢ়। পাশ্চাত্য কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথাই নাই। বরং লুকাস্, ও ডারবিণ দুই জনেই বলিয়াছেন "(In one part of the system the mother in another the father predominates; certain organ and faculties are derived from the mother, others from the father and in others the parental influence may be equal.)" যে পুত্রের শরীরে এক অংশে পিতার, অপরাংশে মাতার শক্তি প্রবল; কোন২ অবয়ব ও মানসিক বৃত্তি মাতার অনুকূল, অপর সকল পিতার অনুরূপ এবং অন্যান্য অনেক মাতৃ-পিতৃ শক্তি সামঞ্জস্য সম্ভূত। বিশেষতঃ মহামতি ডারবিণ্ তাঁহার "Variation of animals and Plants under Domestication" নামক পুস্তকে আমাদের এই প্রচলিত হিন্দুমতই প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন।

বীজম্যান (Weismann) বলেন যে "in each individual a portion of the Specific substance derived from the parents is not used up in the construction of the body of that individual, but is reserved unchanged for the formation of the germ cells of the succeeding generations." প্রত্যেক মনুষ্যাতে পিতৃদত্ত উপাদানের একাংশ প্রস্ফুটিত হয় এবং অপরাংশ সম্পুটিত থাকে এবং আগামী বংশধরগণের উৎপত্তি কারণ বীর্য্য পুষ্টি করে। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে "Theory of Natural selection" টি বুঝা উচিৎ। ডারবিণ এই থিয়রী প্রথমেই পাশ্চাত্য জগতে ব্যাখ্যা করেন। জীব মাত্রেই দেশের জলবায়ুর অনুকূল শরীর করিয়া লয়। যে দেশে শীত অধিক তথাকার জন্তু সকল লোমশ, সেই জন্তুই আবার উষ্ণ প্রধান দেশে লোম শূণ্য; আমাদের দেশের গণ্ডারের গাত্রে লোম নাই, সাইবিরীয়ায় পুরাকালে লোমপূর্ণ গণ্ডার পাওয়া যাইত। কিন্তু মনুষ্য মনস্বী; জলবায়ু-গত পার্থক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে শীত প্রধান দেশে মানুষকে কিছু লোমশ হইতে হয় না; মনের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা এই অভাবের পূরণ করিয়া লয় মাত্র। "সংস্কার তত্ত্বের" আলোচনার সময়ে আমরা ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব। এখন বলিয়া রাখি যে, এই মনঃ শক্তি প্রয়োগে মনুষ্যের মন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়। জীবজন্তুর ন্যায় মনুষ্যের শরীরে কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না বটে, কিন্তু মনের উন্নতি হয়, সংস্কার গ্রন্থি অস্টে পৃস্টে লাগিয়া যায় এবং তজ্জন্য অবয়ব বৈলক্ষণ্যও কিছু ঘটিয়া থাকে। পিতার মনঃশক্তি ও সংস্কারের পুঁটুলি Germ-cells বীর্য্য কোষের মধ্য দিয়া পুত্রে সঞ্চারিত হয়। পরন্তু মাতৃ শক্তির প্রভাবে, অবস্থা বিশেষে পিতার এই মনঃশক্তি ও সংস্কার-গ্রন্থি, যাহাকে শাস্ত্র কারেরা "অদৃষ্ট" এবং "অপূর্ব্ব" বলিয়াছেন, পুত্রে কিছু বা পরিস্ফুট হয় এবং কিছু বা সম্মোহিত অবস্থায় থাকে। এমন হয় যে পিতৃ বীর্য্যে নিহিত পূর্ব্ব পিতৃগণের গুপ্ত শক্তি মাতৃরজোসঞ্চিত, মাতামহ অনুকূল শক্তি সংযোগে তাহারা আবার ফুটিয়া উঠে। প্রপিতামহ যাহা ছিলেন, প্রপৌত্র হঠাৎ তেমনি হইল। পিতার নিজস্ব চাপা রহিল, মাতার নিজস্বও চাপা রহিল।

সম্মূঢ় শক্তির সংযোগপ্রভাবে বহুদিনের অপহৃত এক অমূল্য নিধি আবার ফুটিয়া বাহির হইল। কেহ আপনার মত নূতন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, করিতেও পারে না। সহস্র ২ বৎসরের মাতামহ ও পিতামহ মহাপুরুষগণ যাহা সঞ্চিত করিয়া জন্মদাতা পিতার সাহায্যে যে উপাদানে আমাকে গঠিত করিয়াছেন আমি তাহাই। পরন্তু আবার বিশ্ব সৃষ্টি-শক্তি সামঞ্জস্য দিকেই ধাবমান। সকলকে সমান করিয়া, সকলকে সংযত করিয়া কি জানি কোন্ পথে, আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্ঘাতে অনেক শারীর ও মানস দোষ সামলাইয়া উঠে। তত্রাচ তিন চারি শতবৎসর পর্য্যন্ত একটা বংশগত দোষ, বা গুণ বিশেষকে পরিস্ফূটাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। পারদ-জনিত দোষ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে। কুষ্ঠ, অম্ল রোগ, শুল, শীরঃ পীড়া, মেহ, অজীর্ণ (Dyspepsia), বুদ্ধি হীনতা, অমনস্কতা ইত্যাদি রোগ সকল এক জনের পাষণ্ডতা হেতু পারদ ব্যবহার জন্য নানা আকারে পর ২ বংশধরগণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনের অত্যন্ত মাদক (Alcohol) দ্রব্য ব্যবহার জন্য উন্মত্ততা, শীরঃপীড়া, অম্লশূল, বিহ্বলতা, অতিশয় কামুকতা, গ্রহনী ইত্যাদি রোগ বংশানুক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। ইউরোপের প্রধান ২চিকিৎসালয়ে এই পৈতৃকত্ব জন্য রোগাদির বিশেষ অনুসন্ধান হইতেছে। যাহা সহজ, আজন্মগত (congenital) তাহা দুরারোগ্য। ঔষধ প্রয়োগে উপশম হয় বটে, তবে আরাম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং চিকিৎসকে চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যে, রোগ পিতৃ পৈতামহ উচ্ছৃঙ্খলতা জন্য পৈতৃকত্ব সঞ্চারিত প্রকৃতিগত রোগ, অথবা অবস্থা বিশেষ জন্য (যথা মহামারী ইত্যাদি সার্ব্বজনিক সংক্রামক) রোগ, কিম্বা রোগীর অনিয়মের ও অত্যাচার জন্য রোগ। যেমন নিজের দোষে অকাল মৃত্যু হয়, তেমনি পূর্ব্বতন পূর্ব্ব পুরুষগণের মহাপাপেও অকাল মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব পুরুষগণ সুসংযত ও নিয়মানুযায়ী থাকিলে, পুষ্ট বীর্য্য ও তেজস্বী হইলে, বংশধরেরা অবশ্যই পুষ্ট ও বীর্য্যবান হইবে। বালক বীর্য্যবান, তেজস্বী, নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল দেহ হইলে এবং নিজে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে থাকিলে, দেশীয় অন্য কোন উৎপাত না হইলে, তাহার অকাল মৃত্যু কখনই হইবে না। রাজার পাপে মহামারী ইত্যাদি সংক্রামক রোগ হয়, পিতৃ পিতামহের পাপে শিশু রুগ্ন, ক্ষতবিশিষ্ট, অল্প বীর্য্য, অল্প ভোগী হয়, এবং নিজের পাপে অত্যাচারী হইয়া যৌবনেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অথবা চির-রোগী হয়। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের সেই পুত্র হীন ব্রাহ্মণের গল্প মনে পড়ে। ব্রাহ্মণ নিজে বুঝিয়াছিল যে, তাহার অথবা ব্রাহ্মণীর বীর্য্যগত কোন দোষ জন্য সদ্যোজাত শিশু সকলের মৃত্যু হইতেছে না, তাহারা দুই জনেই নিষ্পাপ এবং ক্রিয়াগুণে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, পৈতামহ কোন দোষই তাহাদের কাহারও শরীরে নাই। তাহারা পবিত্র বংশের পুণ্যবান জীব-যুগল। কাযেই বলিতে হইবে দোষ রাজার। রাজার ব্যবস্থাগুণে দেশের জল বায়ু পবিত্র থাকে। তিনি যাগ যজ্ঞাদি করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের বায়ু নির্ম্মল রাখিবেন, সংক্রামক রোগের কীটাণু (Bacilli) সকল মরিয়া যাইবে। সুস্থ, সবল কায় নিষ্পাপ মনুষ্য হঠাৎ মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে বায়ু দূষিত হইয়াছে, Sanitary Department বে-বন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ তাই বুঝিয়া রামচন্দ্রের দুয়ারে আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল।

কেবল শরীরের উপরই পৈতৃকত্বের ক্রিয়া হয় না। "Within certain limits the thief steals as the duckling swims, by instinct; the murderer resorts to violence as naturally as a cat hunts a mouse; — virtue is inherited like land or money." ডারবিণ বলেন যে হংসশাবক যেমন স্বভাবতঃই জলে

সম্বরণ দিয়া থাকে তেমনি চোরেও অনেকটা প্রকৃতির তাড়নায় চুরি করিয়া থাকে, যেমন মার্জ্জারে স্বভাব সিদ্ধ বুদ্ধিতে মূষিক স্বীকার করিয়া থাকে তেমনিস্বত্বএব নর-হন্তা জোর জবরদস্তি অত্যাচারের প্রতি ধাবিত হয়; জমি জমা অর্থাদি ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সৎপ্রকৃতি সাধুতা এবং পবিত্রতাও পিতৃদত্ত। পিতৃ পিতামহ ও মাতামহাদির সঞ্চিত দোষ গুণের যেমন অধিকারী তেমনি সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির আমরা অধিকারী। তবে কথা এই যে " peculiarities of body or mind when they are not transmitted directly become transformed in passing from one generation to another. + + + what the parent transmits is not his insanity, but a constitutional defect which may manifest itself under different forms. " অর্থাৎ শারীর ও মানসিক দোষ ও গুণ বিশেষ যখন সম্যক্ প্রস্ফুটাবস্থায় বংশান্তরে সঞ্চারিত না হয়, তখন তাহারা আকারান্তর প্রাপ্ত হয়। উন্মাদ গ্রস্ত পিতার পুত্র যে পাগলই হইবে এমন কোন কথা নয়, তবে পিতার উন্মত্ততা পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া, আকারান্তর প্রাপ্ত হয় এবং স্বাস্থ্যগত দোষ রাখিয়া যায়। পৈতৃকত্বের এই আকারান্তর প্রাপ্তির (metamorphosis of Heredity) অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত না দিয়া আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের দুইটি দৃষ্টান্ত দিব।

নাম করিব না কোন বাঙ্গালী বাবু বিলাত গিয়া পুরা সাহেব সাজিয়া, সাহেবী ভাব ভঙ্গি চাল চলনে সম্যক্ দীক্ষিত হইয়া এবং একটি মেম বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। বাবু ব্যবহারে সাহেব সাজিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবির বিড়ম্বনা চামড়ার ধৌম্যতা চাঁচিয়া ছুলিয়া উঠাইতে পারেন নাই; তাহার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী গৌরী, বিড়ালাক্ষী, কটাকেশী এবং ইংরাজী চক্ষে সুন্দরী ছিলেন! বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র কন্যা অনেক গুলিন। পুত্র কয়টি, পিতার অনুকরণে অয়স্কান্তিকে নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ প্রভায় গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে পিতার যোগ্যপুত্র এবং ভাব ভঙ্গিতে পিতা অপেক্ষা অধিকতর সাহেব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কন্যা কয়টি, বিশেষতঃ একটি (যাঁহাকে আমরা জানি) আকার প্রকারে, শরীর সৌষ্ঠবে পুরা বিবি হইলেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বাঙ্গালিনী। যেমন বাঙ্গালীর গৃহ লক্ষ্মী দেবদ্বিজে ভক্তি-মতি, আচারবতী এবং সদাই ব্রীড়াবনত-মুখী তেমনি ইনি ব্যারিষ্টার পত্নী হইলেও হিন্দুকুলাচার পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালী বসন ভূষণ অনুরাগিনী, সদাই লজ্জাবনত মুখী, ভক্তিমতী, শ্রদ্ধাবতী এবং পবিত্রা। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় কোন হিন্দু কুলাঙ্গনা মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে বিলাতী বিবির শরীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছেন। এখানে বাঙ্গালী পিতার সম্মূঢ় হিন্দুত্ব কন্যায় সঞ্চারিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

অপর দৃষ্টান্তঃ—একটি বাঙ্গালী বাবুর তিন পুত্র আছে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি, শান্ত ও সুরূপ, মধ্যমটি উন্মত্ত, পক্ষাঘাত প্রাপ্ত ও কদাকার। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বাবু যখন মদে চূর ছিলেন তখন ব্রতপরায়ণা, উপোষিতা পত্নীতে জবরদস্তি অভিগমন করিয়া এই মধ্যম পুত্রটি জগতে আনিয়াছেন। আমাদের জানিত এমনতর অনেক গুলি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিতে পারি। সকলে একটু অনুসন্ধান করিলেই এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা জানিতে পারেন। ঘরে, বাহিরে, পাড়ায় ২ পৈতৃকত্বের দৃষ্টান্ত আছে। এই সকল পড়িয়া ও ইহার অলোচনা করিয়া মনে হয় যে, দূরদর্শী ধীমান অর্জ্জুন পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবানের সম্মুখে যুদ্ধের বিপক্ষে বর্ণ সঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কা রূপ যুক্তি যুক্ত আপত্তি সত্য যুক্তিই নিবেদন করিয়াছিলেন।

পিতৃ দোষগুণ সঞ্চারণেরও একটা সীমা আছে,

কেন না " Always striving after perfection, or rather uniformity of type, Nature either purifies a race of its physical and moral defects, or, if the type be too vicious, exterminates it. " প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ম এই যে, সর্ব্ব সামঞ্জস্য করা, দোষের হ্রাস করা। যেখানে সামঞ্জস্য হয় না, দোষ সংবরণ করা অসম্ভব, তথায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংসারে অনেক পাপের বংশ লোপ পাইয়াছে। পুণ্যের পথে না চলিলে তিন পুরুষ টি'কা ভার। রোগী পিতা রুগ্ন মাতা হইলে, হয় মাতা বন্ধ্যা হইবেন, নয় ক্ষীনজীবী দুই একটি পুত্র জন্মিয়া শৈশবেই মরিয়া যাইবে। আর যদি পিতা রোগী হন, মাতা সবলা ও পবিত্রা হয়েন তাহা হইলে মাতৃগুণে পুত্রে পিতার দোষ সামলাইয়া যাইবে। শুদ্ধ শারীরিক রোগ দেখিলে হইবে না, বীর্য্যগত ও মানসিক রোগই মহাপকার সাধক। শারীর দোষ পল্লীর প্রভাবে এবং অবস্থার ও দেশের গুণে ধীরে ২ নির্ম্মলীকৃত হইয়া যায়। কিন্তু পিতৃ বীর্য্যগত ও মানসিক রোগ ধরা পড়া কঠিন এবং উহাদের ফল ও বিষময়। বংশ পরম্পরায় মহাপাপের ফল মনের বিকৃতি, সেই বিকৃতি জন্য বংশলোপ নিশ্চিত, এবং মহাদুঃখের নিদানভূত কারণ তাহাই। সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিবাহে বর কন্যার বিচার এতই অধিক, গর্ভাধানের এত আঁটা আঁটি ও ভার্য্যাকে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত উপায় বলিয়া থাকে। নরলোক ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বিবাহকে হিন্দুর চক্ষে দেখাই সুসঙ্গত। আমার পাপপুণ্যের বোঝা কেবল আমিই বহিব না, আমার প্রিয়তম পুত্রকেও সেই ভার দিয়া যাইব। অন্য কেহ ভাগ্য-লেখক আছে কি না জানি না। পিতা ও মাতাই পুত্রের বিধাতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা যেমন আগামী বংশধরগণের নিকট দায়ী তেমনি পূর্ব্ব পুরুষগণের সমক্ষেও দায়ী। তাঁহারা যাহা দিয়াছেন তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে, এবং পরবর্ত্তীগণকেও তেমনি নিকাষ দিতে হইবে। আমরা অনন্ত শৃঙ্খলমালার একটি শৃঙ্খল মাত্র—আমাদের দায়িত্ব অতিশয়। কিন্তু সকলের সে বোধ কি আছে? যদি তাহা থাকিত তবে দেশের রাজন্য-বর্গ নিঃসন্তান হইত না, অল্পবীর্য্য হীন-মস্তিষ্ক, বাক্য-সর্ব্বস্ব মনুষ্যাধমে দেশ পরিপূর্ণ হইত না, এত শৈশব মৃত্যু হইত না, এমন অত্যাচার ব্যভিচার থাকিত না, এত ভ্রাতৃবিরোধ, হিংসা, কলহ, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা পাওয়া যাইত না। কি জানি ভবিষ্যতের গর্ভে আর কত দুর্দ্দশা সঞ্চিত আছে, তবে এমনি পাপের প্রবাহে আমরা ভাসিতে থাকিলে হিন্দু নাম আর অধিক দিন জগতে প্রচারিত থাকিবে না। ভগবান সে দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত "কাশী-যোগাশ্রমের" পবিত্র শোভা সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বিশেষতঃ ভক্ত বৎসলা মা যোগেশ্বরীর দিব্য জাগ্রত জ্বলন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হিন্দু মাত্রেরই হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। স্বামীজী যখন কাশীতে অবস্থিতি করেন, তখন ধর্ম্ম পীপাসু অনেক স্ত্রী পুরুষ তাঁহার নিকট আসিয়া অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই সকল সারগর্ভ উপদেশ-রাশির সারাংশ দেশ বিদেশীয় শুশ্রূষু বর্গ শুনিতে নিতান্তই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই আমরা " শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত " শীর্ষক প্রবন্ধে, ধর্ম্ম প্রচারকের, সম্ভবতঃ প্রতি সংখ্যাতেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বিলাস ও বৈরাগ্য।

এক দিন যোগাশ্রমে সমাগত ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে জনৈক ব্যক্তি পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিলেন, স্বামীজি!

আপনার যোগাশ্রমের শোভা, সজ্জা, সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ ২ বলে যে, বৈরাগ্যের লীলাভূমি সন্ন্যাসীর আশ্রমে এত সাজ সজ্জা কেন? বেশ, বিন্যাস, সাজ-সমাজ তো ভোগী দিগেরই বিলাস সম্পত্তি, সন্ন্যাসীর আশ্রমে এ সকল ভাল দেখায় না। ইহা শুনিয়া স্বামীজী ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, ভাবুক সাধক না হইলে আদি কবি ব্রহ্মার ভাব রসে ডুবিতে না শিখিলে মায়ের কৃপাসিন্ধুর সুধা বিন্দু পানের অধিকারী না হইলে বিলাস ও বৈরাগ্যের প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুট দেখা যায় না। অন্যে না বুঝিয়া আমাকে অকথা কুকথা বলে বলুক, তোমাদিগকে বিলাস ও বৈরাগ্যের গুহ্যতত্ত্ব বুঝাইয়া দিই। শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।—

শোভা, সাজ, সজ্জা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদি ভগবানের অন্তরঙ্গিণী শক্তির বিকাশ। ভগবান্ স্বয়ং পরম সুন্দর, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে তিনি, সেই খানেই ভাব, সেই খানেই শোভা, সেই খানেই বিকাশ, সেই খানেই সৌন্দর্য্য, সেই খানেই রস-মাধুর্য্য, সেই খানেই আনন্দের ছটা স্থির সৌদামিনীর ন্যায় হাঁসিয়া হাঁসিয়া সকলকে আমোদিত করে। যে তাঁহাকে দেখিতে চায় বা যায়, সেই তাঁহার সৌন্দর্য্য শোভায় সেই তাঁহার মাধুর্য্য-প্রভায় বিমোহিত হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠে, প্রেমে বিভোর হইয়া পড়ে। যে তাঁহার সমাচার পাইল সেই তাঁহাতে মজিল, যে তাঁহাকে ভাবিল, সেই বিলাস ভুলিল, যে তাঁহাতে মাতিল সেই বৈরাগ্য ধরিল, যে তাঁহাকে দেখিল সেই বৈরাগ্য-শৈল-নিঃসৃত প্রেম নির্ঝরিণীর সুশীতল জলে ডুবিয়া গেল, আর ভাসিল না। যে ভাসিল সে ডুবিল না, যে ডুবিল সে উঠিল না।

ভগবান্ শোভা ও সৌন্দর্য্য স্বরূপ। তবে শোভা ও সৌন্দর্য্য মন্দ কে বলিল? কে বলিল শোভা সাজ ও সৌন্দর্য্য বৈরাগ্যের বিরোধী? কে বলিল শোভা ও সৌন্দর্য্য বিলাসের সামগ্রী? স্বর্গের বর্ণনা পাঠ কর, দেখিবে স্বর্গ শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভরা, দেবতার ধ্যান পাঠ কর, দেখিবে তাঁহাদের শ্রী অঙ্গে শোভা ও সৌন্দর্য্য ধরে না। যখন মা অন্নপূর্ণার স্তবে পড়িবে—

"কেয়ূর হার মণি কঙ্কণ কর্ণপুর,
কাঞ্চী কলাপ মণিকান্তি-লসদ্দুকুলে
দুগ্ধান্নপূর্ণ বর কাঞ্চন দর্ব্বি হস্তে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥"

তখন কেমন করিয়া ভক্ত হৃদয় বলিবে—মা আমার বিলাস বেশ ধারিণী! যখন বৈরাগ্যের বিশাল মূর্ত্তি জটা-কলাপ মণ্ডিত ভস্ম ভূষিত শিবের তাণ্ডব স্তব পাঠ করিবে—

"অখর্ব্ব সর্ব্ব মঙ্গলা কলা কদম্ব মঞ্জরী
রস প্রবাহ মাধুরী বিজৃম্ভণা মধুব্রতম্।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকম্
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে।"

তখন কোন্ সাহসে বলিবে, যোগীন্দ্র জগদ্‌গুরু বিলাস বিভ্রমে পড়িয়াছেন? যখন শঙ্খ চক্র গদা কমল ধারী বৈকুণ্ঠ পতিকে রত্ন বেদিকায় কীরিট, কুণ্ডল, মালা, চন্দন চর্চ্চিত দিব্য অঙ্গে পীত পট্টবাসে সুশোভিত দেখিতে পাও, তখন কোন্ বুদ্ধিতে বলিবে বৈকুণ্ঠ বিহারী বিলাস বেদীতে বিশ্রাম করিতেছেন; যখন নারায়ণ স্তব কালে—

"ঘন নীরদ সঙ্কাশ কৃত কলিকল্মষনাশ।
যমুনা তীর বিহার ধৃত কৌস্তুভ মণিহার
পীতাম্বর পরিধান সুর কল্যাণ-নিধান॥
নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥"

পাঠ করিবে, তখন কি সাধক বলিতে পারিবে, যে নারায়ণ সাজ সজ্জা করিয়া বিলাস বেশ ধারণ করিয়াছেন? যে দিকে দেবভাব দেখিবে, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য—সেই দিকেই মুনীজন মনোলোভা দিব্য

শোভা-প্রভা প্রতিভা বিতরণ করিতেছে। যেখানে দেব ধাম, সেই খানেই তো পবিত্র সজ্জাতে শৃঙ্গার হইয়া থাকে। বৃন্দাবনের মন্দিরে ২ দর্শন কর, কাশীর প্রতি দেবালয়ে গমন কর, দেখিবে শোভা সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। যে সৌন্দর্য্য বুঝে না, সেই বিলাসী, যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যের সাগরে ডুবিয়াছে সেই মজিয়াছে সেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছে। যে সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়াছে, সেই গা ঝাড়িয়া মনের ময়লা ধুইয়া নির্ম্মল সুন্দর হইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। যার সৌন্দর্য্য বোধ নাই সে মলিন সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবে কেন! সন্ন্যাসী যত সুন্দর ভাল বাসেন এত আর কেহ বাসেনা। সুন্দরের অনুরাগী বলিয়াই সন্ন্যাসী ময়লা মাটী মাখা ছার সংসারের সাজ ছাড়িয়া ঝর ঝরে দিগম্বর পরিধান করেন, সুন্দরকে ভাল বাসেন বলিয়াই সন্ন্যাসী সাজা গোজা ধোবার বোঝা ফেলিয়া বিরজার পারে বিলাস-ভবন রচনা করিয়া থাকেন, সন্ন্যাসী সুন্দর দেখিতে ও সুন্দর হইতে ভাল বাসেন বলিয়াই মূত্র পুরীষ, ক্লেদ, রস রক্ত স্বেদ, মাংসমজ্জামেধ যুক্ত নশ্বর দেহ ভেদ করিয়া মুক্তি মার্গে চিদাকাশে স্বতন্ত্র নিবাসে আত্মজ্ঞানাভ্যাসে নিরত থাকেন। বিষয় বিরাগীর মত-শুদ্ধ সন্ন্যাসীর মত "শৌখিন" (সৌন্দর্য্য প্রিয়) আর নাই। ইন্ধনে যত পরিমাণে রস থাকে, তাহা জ্বালিলে তাহা হইতে ততপরিমাণে ধূম নির্গত হয়, ঐ ধূম চক্ষে লাগিলে চক্ষু জ্বলে ও জল পড়ে। এই রূপ সৌন্দর্য্য যদি বিশুদ্ধ না হয়, অথবা সৌন্দর্য্য প্রকাশের আধারে যত পরিমাণে মলিন উপাদান থাকিবে, ধূমের ন্যায় ঐ মলিনাংশ জীবের সম্মুখে মলিন বিলাস বুদ্ধির উদ্রেক করিবে এবং ভাবী দুঃখের সূচনা সঞ্চার করিয়া দিবে। আর বিশুদ্ধ উপাদান হইতে "সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্" দীপ্তির ন্যায় বৈরাগ্য জ্বলন্ততেজে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সৌন্দর্য্য বুদ্ধিই সন্ন্যাসী হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদ্দীপনা করিয়া দেয়।

প্রেম—ভাল বাসা জীব প্রবাহের মূল উপাদান। এই ভাল বাসাই জীবকে ভোগ বিলাসে অনুরক্ত করে, এই ভালবাসাই জীবকে সংসার ত্যাগী বিষয় বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে। প্রেম তরঙ্গিনীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসাবর্ত্তে ডুবিয়া মারা যায়, আবার অনুরাগের বাঁধা ঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের সুশীতল জল প্রবাহে ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। বৈরাগ্য ভালবাসার সুমধুর রস এবং বিলাস ".ভালবাসার" শিটী। সুচতুর ব্যক্তি গণ ভাল বাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগ রূপ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন, আর বিষয় বিমূঢ় মানবগণ সেই ভালবাসার তরুতলে বিলাস বিভ্রম রূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালায়তন হয়। শোভা সৌন্দর্য্যের তো দোষ নাই—অনধিকারী জীবের হৃদয়ই সকল দোষের আকর। ঔষধ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথারীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ প্রেম—ভাল বাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটী ভাল, কিন্তু অযথা স্থানে—অযোগ্য পাত্রে—অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে। তুমি গুরুকে ভাল বাসো, শাস্ত্র ভাল বাসো, বিদ্যা, জ্ঞান, সৎকর্ম্ম ভাল বাসো, মা অন্নপূর্ণাকে ভাল বাসো, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভাল বাসো—ভালবাসা এখানে সুফল প্রদান করিবে। আর তুমি মদ খাইতে, বেশ্যালয় যাইতে, অন্যের ধন লইতে, সাধু নিন্দা করিতে বা অপথে কুপথে চলিতে ভাল বাসো, ভাল বাসা তোমাকে কুফল দান করিবে। অতএব ভাল বাসা বা অনুরাগের দোষ নাই, দোষ লোকের ভালবাসা প্রয়োগের। রূপ ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, ভাল বাসো—প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া ভাল বাসো। সুরূপকে ভাল বাসো—কুরূপকে ভাল বাসিও না। যেমন ঝিকীমিকী বেলায়! সিন্দুরে মেঘের আভা

দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেই রূপ যে রূপ দেখিলে—যে রূপের দিকে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলে নয়ন প্রাণ মন শীতল হয়—আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে আমি সু হইয়া দাঁড়াই, তাহাই সু-রূপ, আর যাহা দেখিলে আমি সু থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া দাঁড়াই, তাহাকে লোকে সু রূপ বলিলেও আমি তাহাকে কুরূপ বলি। যাহাতে হাত দিলে আমার হাত মলিন হইয়া যায়, তাহা যে স্বতঃ মলিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মা অন্নপূর্ণার রূপ দেখ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রূপ দেখ, শ্রীরাম-জানকীর রূপ দেখ। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে আছে, "এই রূপ সাগরে ডুবিলে পরে, মিটে নাম রূপের ঢেউ আপনি"। নায়িকা বুদ্ধিতে যুবতীর রূপে, মমতা বুদ্ধিতে পুত্র কন্যার রূপে মুগ্ধ হইওনা, তাহাতে তোমার মন মলিন হইয়া যাইবে, এই জন্য এ সকল রূপ কুরূপ—আর ভগবানের রূপই "সুরূপ"। যাঁহাকে ভাল বাসিলে আর কাহাকেও ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে ভাল বাসো। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিলেই সংসারে 'বৈরাগ্য' বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত জানিও যে, বিষয়ে ভাল বাসার নাম "বিলাস" ও ভগবানে ভাল বাসার নামই "বৈরাগ্য"। ভাল বাসার মলিনাংশের নাম বিলাস ও বিশুদ্ধাংশের নামই বৈরাগ্য। লোক দেখানো সাজ সজ্জা ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে।

সাজ শোভা ভোগীরও আছে, সাজ শোভা সন্ন্যাস্ত যোগীরও আছে। অলঙ্কারাদি পরা যেমন ভোগীর সাজ, অলঙ্কারাদি না পরাই তেমনি বিরাগীর সাজ, অলঙ্কার না পরিলে যেমন ভোগীকে ভাল দেখায় না, অলঙ্কার পড়িলে তেমনি বিরাগীকে মানায় না। যে অঙ্গুলির নাম নাই, তাহাকে অনামিকা বলে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে "অনামিকাই" তাহার নাম। তেমনি সাজ-শোভা না থাকাই বিরাগীর সাজ ও শোভা। তৈল কজ্জলাদি যেমন ভোগীর শোভা, ভস্ম বিলেপনাদি তেমনি সন্ন্যাসীর শোভা। যাহাতে যাহা মানায়, যাহাতে যাহার কাজ হয়, তাহাই তাহার সাজ। সাজ নাই, এমন কেহই নাই। এখন বুঝিলেতো সাজ থাকিলেই বিলাসী হয় না! যে সাজে বিলাস বুদ্ধির উদয় হয় তাহা ত্যাগ করিবে, যে সাজে বৈরাগ্য বুদ্ধির উদ্রেক হয় তাহাই ধারণ করিবে। এক্ষণে যোগাশ্রমের সাজ শোভার বিচার কর। ইহার অধিশ্বরী মা, যোগেশ্বরী, নানা রত্নাভরণ ভূষিতা। তোমার অলঙ্কৃতা মেয়েটাকে দেখিলে যে শ্রেণীর ভাল বাসার উদয় হয়, এই সুসজ্জিতা মাকে দর্শন করিলে যে শ্রেণীর ভালবাসার উদয় হয় না; এ রূপ দেখিলে সংসারে অনাসক্তি ও বিরক্তি এবং ভাগবতী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এ সাজ সাজাইতে—এ সাজ দর্শন করিতে কোন্ ভক্ত কোন্ তপস্বী না ইচ্ছা করেন? এ সাজ কি বিলাস বুদ্ধি প্রণোদিত? আশ্রমের প্রত্যেক ঘরে দেব লীলা, যাগ যজ্ঞ, সাধু তপস্বী, ভক্তোদ্ধারাদির বিচিত্র চিত্রাবলি আছে। বাবুদের বৈঠক খানায় যে বাইজীর, মেম সাহেবের, বা কুক্কুর বিড়ালাদির ছবি থাকে, এতাবৎ তাহা নহে। ইহার একএক খানি চিত্র মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মন্ত্রের প্রতিলিপি মাত্র। ভাগবদাদির অধ্যায় ২ পাঠ করিয়া যে উপকার হয়, সময় বিশেষে যোগাশ্রমের এক ২ খানি চিত্র নিরীক্ষণ করিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে জ্ঞান, ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে। কবির কবিতা ও চিত্রকরের চিত্র পট একই জিনিস। কবি শব্দের দ্বারা, চিত্রকর রূপের দ্বারা ভাবের বিকাশ ও বিন্যাস করিয়া থাকেন। যোগাশ্রমে বসিয়া বলিতে পারি, প্রভো! যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিকে তোমাকে দেখি।" অনেক দিন সাধনা করিয়া মানব যে ভাব প্রাপ্ত হন

নাই. এখানকার এক ২ খানি চিত্র দর্শনে এবং তাহার প্রণিধানে তাহা লাভ হইয়া থাকে। কত২ সাধক এতাবতের এক ২ খানি চিত্র দর্শন করিতে২ গলদশ্রু নয়নে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছেন। দেখিয়া লও, যোগাশ্রমের প্রতি পদার্থই ভগবদ্ভাবোদ্দীপক কি না। সন্ন্যাসীরা বড় কবি, বড় সুরসিক. তাই সন্ন্যাসীর হৃদয়েই দেব লীলার অভিনয় হইয়া থাকে। মা আমার আনন্দময়ী, মা আমার যোগীজন-বিনোদ বালা, ভাবময়ী মা ভাবের তরঙ্গে আপনার দিকে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যে ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার দিকে জীবের গতি হয়, তাহাই বৈরাগ্য, আর যাহার আবেগে জীব তাঁহাকে ভুলিয়া যায় তাহাই বিলাস। যোগাশ্রমের পবিত্র শোভা বিলাস বর্দ্ধিনী নহে, এ শোভা ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞান বৈরাগ্যেরই সহবাসিনী। যে সকল চিহ্ন ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের উদ্দীপক, সে সকল চিহ্নকে সন্ন্যাসী গণ আদর করিয়া থাকেন। এখানে যোগ বাশিষ্ঠের উগ্র বৈরাগ্য বা ঔদাস্য দেখিতে পাইবে না, গীতার প্রেম মাখা বৈরাগ্য মা যোগেশ্বরীর চারু চরণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যাহা অধোগতির অনুকূল ও ভগবদ্দর্শনের বাধক, তাহাই "বিলাস" এবং যাহা সংসারাসক্তির প্রতিকূল ও ভগবদ্দর্শনের সাধক তাহাই বৈরাগ্য। যেখানে প্রেম নাই সে খানে বৈরাগ্য নাই. যে খানে ভগবদ্ভাব বিলাস আছে, সেই খানেই বৈরাগ্য বিদ্যমান। বৈরাগ্য মরু ভূমির উত্তপ্ত বালুকাস্তূপ নহে.—উহা ভগবৎ প্রেম সিন্ধু মধ্যে সুগভীর সুধা কূপ বলিয়া জানিবে। যেমন ঘৃতপক্ক ছানা বড়া খাইতে ভাল লাগে না, উহা রসে ডুবানো হইলেই ভাল লাগে, সেই রূপ বৈরাগ্য কেবল ঔদাস্য ও ত্যাগ মূলক হইলেই ভাল হয় না, উহা ভগবৎ প্রেম রসে ডুবু২ হওয়া চাই। সংসারে বৈরাগ্য চাই, কিন্তু ভগবানে অনুরাগ চাই। সংসারে অনুরাগের নাম "বিলাস" এবং ভগবানে অনুরাগের নাম বৈরাগ্য। [illegible] বৈরাগ্য হইলেই তিনি ভগবদ্ রস বিলাসী হইয়া থাকেন। তখনই বিলাস ও বৈরাগ্যে দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। অদ্য এই খানেই বিশ্রাম।

আমরা পরম আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দিনাজপুরের পরম ভক্ত হিন্দু ও সাত্ত্বিক দানশীল শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের চরক ও সুশ্রুতের প্রচার কার্য্যে নগদ ২০০৲ দুই শত টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তকাবলীর প্রত্যেক এক কাপি গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া যাঁহারা লুপ্তপ্রায় হিন্দু শাস্ত্রাদির উদ্ধার কল্পে এরূপ মুক্ত হস্ত হন, তাঁহাদের প্রশংসা আমরা শত মুখে করিতে পারি না।

ধর্ম্মোৎসব।

প্রয়াগ।

১। বিগত ২৫এ ও ২৬এ মাঘ শনি ও রবিবার দুই দিন ধরিয়া এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ হরি সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। উৎসবে শ্রীমন্নারায়ণের পূজা, দরিদ্র দিগকে দান, শ্রীমদ্ভাগবদ্ ব্যাখ্যা, হরি সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তিনি দুই দিন সুললিত হিন্দী ভাষায় ধর্ম্ম ও উপাসনা তত্ত্ব বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমাত্রেই আনন্দ পূর্ব্বক এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে এলাহাবাদে এরূপ ধর্ম্মার্থ যুক্ত সারগর্ভ ও সুমধুর বক্তৃতা তাঁহারা আর কখনও শুনেন নাই। এই বক্তৃতায় হিন্দুস্থানী বর্গের অতিশয় উৎসাহ ও উদ্যম বাড়িয়াছে।

কানপুর।

২। ২৫এ ও ২৬এ মাঘ কানপুর হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব আনন্দ পূর্ব্বক [illegible]

পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন দরিদ্র দিগকে দান, ও বক্তৃতাদি দ্বারা পবিত্র উৎসবের গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-ভাবের উন্নতির সদ্ব্যবস্থা করিয়া দিন।

বিগত ১০ই পৌষ বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ পৌষ রবিবার পর্য্যন্ত তেলেহাটী আঃ ধঃ প্রচারিণী সভার পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় দয়া পরবশ হইয়া এই উৎসবে শুভাগমন করত, সুললিত, সারগর্ভ তেজস্বিনী বক্তৃতায় প্রত্যেক শ্রোতাকে স্তম্ভিত ও আত্ম-বিস্মৃত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শেষ দিবসের ছয় ঘণ্টা ব্যাপিনী (রাসলীলা সম্বন্ধে) জ্বলন্ত বক্তৃতায় যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। ধর্ম্মগত প্রাণ ভক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ন অতীব প্রশংসনীয়, যদিও তিনি অল্প বয়স্ক, তাঁহার কার্য্য কলাপ অনেক বৃদ্ধের অনুকরণীয়। কেবল তাঁহার একান্ত যত্নে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য মহাত্মাগণ এখানে পদার্পণ করত ধর্ম্মোপদেশ দানে আমাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, যাহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও স্থানীয় উন্নতি হয় সে বিষয়েও ভোলানাথ বাবুর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে। আমরা কায়-মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি,জগদীশ্বর ভোলানাথ বাবুর মত উদ্যোগী ও হৃদয়বান পুরুষকে দীর্ঘ-জিবী করুন।

সমালোচনা।

১। "উপদেশ কথা" এবং "নিশীথের অশ্রুধারা"। এই কবিতা পূর্ণ পুস্তক দুই খানি ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের বিরচিত। ছন্দোবন্ধে স্থানে ২ সামান্য ২ দোষ থাকিলেও কবিতা গুলি অতি সুমধুর ও মনোহারিণী হইয়াছে। পুস্তকের পত্রে ২ ছত্রে ২ রাজা বাহাদুরের উচ্চ হৃদয়তা, সনাতন ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ, ভগবদ্ভক্তি আদির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা গুলি পড়িতে ২ আরও পড়িতে ইচ্ছা হয়। প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

২। "জ্ঞান তত্ত্ব" এবং "তৎতত্ত্ব প্রদীপ"। এই দুই খানি পুস্তক ভিক্ষু জ্ঞানানন্দ গিরি পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রণীত। নীতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অনেক নিগূঢ় কথা সুমিষ্ট ও সুললিত কবিতায় গ্রথিত হইয়াছে। কবিতা গুলি সরল ও রস মাধুরী পূর্ণ। ইহাতে অনেক কাজের কথা ও ভাবের কথা আছে—রচনা নৈপুণ্যে পাণ্ডিত্যও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। মূল্য প্রত্যেক খানির চারি আনা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত ॥

১৪শ ভাগ
১২শ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১৩
চৈত্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রান্তং সম্বাহনং রোগিপরিচর্য্যা সুরার্চ্চনং।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্ট মার্জ্জনং গোপ্রদানবৎ ॥

শ্রান্ত ব্যক্তির শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্য্যা, দেবতার অর্চ্চনা, দ্বিজাতির পাদক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়।

ভূদীপাংশ্চান্ন বস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃ প্রতি শ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥

ভূমি, দীপ, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, অনাশ্রিতকে আশ্রয়, গৃহস্থাশ্রম জন্য কন্যাদান ও সুবর্ণ সমন্বিত বৃষ দান করিলে স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।

গৃহধান্যাভয়পান ছত্রমাল্যানুলেপনং।
যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ ॥

গৃহ, ধান্য, অভয়, পান, ছাতা, মালা, চন্দনাদি অনুলেপন, যান, বৃক্ষ, শয্যা ও গ্রহীতার প্রিয় বস্তু দান করিলে দাতা অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বধর্ম্মময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্ম লোক মবিচ্যুতং ॥

সর্ব্ব ধর্ম্মময় বেদ দান করিলে [অধ্যাপনা করাইলে] সমধিক ফল লাভ হয়। অতএব বেদ দান কারী অবিচলিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

প্রতিগ্রহ সমর্থোঽপি নাদত্তেযঃ প্রতিগ্রহং।
যে লোকা দানশীলানাং সতানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥

প্রতিগ্রহ যোগ্য হইয়াও যিনি প্রতিগ্রহ না করেন, শীল ব্যক্তির যে ২ দান লোকে গতি হয়, তিনি ও তৎ সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়েন্।

কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।
মাংস শয্যাসনংধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়া নবারিচ ॥

কুশা, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধদ্রব্য, ফুল, দধি, ভূমি, মাংস, শয্যা, আসন, সিদ্ধ চাউল প্রভৃতি বস্তু শত্রুতে দান করিলেও কখন প্রত্যাখ্যান করিবে না।

অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃত কর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটায়ণ্ড পতিতেভ্য স্তথাদ্বিষঃ॥

বিনা প্রার্থনায় দুষ্কৃত কর্ম্মকারীর দান ও গ্রহণীয় পরন্তু ব্যভিচারিণী, ক্লীব, পতিত ও শত্রু অযাচিতভাবে দান করিলেও গ্রহণ করিবে না।

দেবাতিথ্যর্চ্চন কৃতে গুরু ভৃত্যার্থ মেবচ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদাত্মবৃত্যর্থমেবচ ॥

দেবতা ও অতিথির পূজা, গুরু ও ভৃত্যের নিমিত্ত এবং আত্ম পোষণ জন্য সর্ব্বত্রই দান গ্রহণ করিবে।

ক্রমশঃ।

সংস্কার তত্ত্ব।

মনস্বীতাই মনুষ্যকে জীব জগতের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের চিন্তা-শক্তি আছে, তাই আমরা সর্ব্ব প্রধান—আমরা মনুষ্য। ইতর জন্তু সকল দেখে, শুনে, অনুভব করে এবং তৎক্ষণাৎ সকল কথাই ভুলিয়া যায়। আঘাত করিলে যতক্ষণ বেদনার তীব্রতা থাকে ততক্ষণ ক্রন্দন করে, কিন্তু শরীরের ব্যথা জুড়াইলেই সকল বালাই চুকিয়া যায়; দুর্ব্বল মস্তিষ্কে কোন রেখাই অঙ্কিত হয় না; স্মৃতির ক্রিয়া অতি অল্পই থাকে। ইতর জন্তুরা সংস্কার শূন্য বলিলেও হয়। তাহাদের সহজ শারীর জ্ঞানই প্রবল। যাহা হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, যে ব্যাপারে শরীরের অনিষ্ঠ সম্ভব তাহা ইহারা অনেকটা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা শিক্ষা এবং চিন্তা জনিত নহে; সহজ এবং শরীরজ। ইংরাজীতে বলে Instinctive, যে ক্রিয়া দ্বারা এই সহজ পশুজ্ঞান সংস্কৃত হইয়া মনের বিকাশ হয়, এবং মনের বিকাশ হইলে পেশী শক্তির হ্রাস হইয়া মস্তিষ্কের পুষ্টি এবং মুখাবয়ব প্রস্ফুটিত ও ভাবযুক্ত হয়, যে ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ও মস্তিষ্কের ও হৃদয়ে সকল বৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া বিকশিত হয় তাহাই সংস্কার ক্রিয়া। ইহার তত্ত্বই এখন আলোচ্য।

ক্রমোন্নতিই সৃষ্টির নিয়ম। পাশ্চাত্যগণ ইহাই বুঝিয়াছেন এবং জগতকে তাহাই বুঝাইতেছেন। স্বেদজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণে দর্শনীয় কীটাণু হইতে বিশ্ববিজয়ী মনস্বী মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সমুন্নত হইয়া মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র, অনন্ত শৃঙ্খলায় সব আবদ্ধ; অনন্ত শক্তির প্রেরণায় তাবৎ পরিচালিত হয়। তাই মনে হয় অনন্তকাল হইতে সকল পদার্থই সৃষ্ঠ হইয়া আছে। নূতনের প্রবেশ নাই, নূতনের স্থানও অসম্ভব। কারণ, সৃষ্টি অনন্ত স্বীকার করিলে, যাহা আছে তাহাই, নূতন নহে। নূতন যাহা তাহা পুরাতনে ছিল না, সুতরাং নূতনের আগমনে পুরাতনের ঊণতা পূর্ণ হইল, অভাব মোচন হইল বুঝিতে হইবে। পরন্তু অনন্ত আধারে আধেয় অনন্তই সম্ভব। সৃষ্ট ও স্রষ্টার যে খানে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য নাই, সে খানে অনন্ত স্রষ্টার সৃষ্টিও অনন্ত এবং পূর্ণাতিপূর্ণ। তুমি আমি বুঝি না, বুঝিতে পারিও না, তাঁহার অজ্ঞেয় অনন্ত শক্তির দ্বারা ক্রমে ২ সকল গুপ্ত কথাই প্রকাশিত হয়। এই শক্তি ক্রিয়াই সকল দেশে পরিব্যাপ্ত এবং যাবৎপদার্থের পরিচালিকা। ইহার অনন্ত নাম, অনন্ত গুণ। জীব তত্ত্বে ইহাকে ক্রম উন্নতি প্রণালী বলে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই ক্রম বিকাশের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ধীরে ২ প্রকৃতির শক্তি যোজনা দ্বারা, জলবায়ুর ক্রিয়া দ্বারা দেহের উন্নতি হয়, শরীর সুপুষ্ট, উপযোগী এবং সহিষ্ণু হয়। প্রবৃত্তি গুলি একে ২ ফুটিয়া উঠে, পরে মন সঞ্চার হইয়া শারীর উন্নতি আর হয় না; মন পুষ্ট হইতে থাকে, মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি হয়, সকল কক্ষ ও পেশী গুলি কার্য্যক্ষম ও সরল হয়। যাহা জন্তু শরীরে পেশী-শক্তি (muscular action) ও প্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাধা হয়, মানব দেহে তাহা মনঃ শক্তি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। দেহ সম্বন্ধে মনুষ্য অবনত জীব হইলেও মানসিক তেজের দ্বারা এই অবনতি সামলাইয়া লয়। মনের এই ক্রমোন্নতির যুক্তি অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে; অন্য কোন গুপ্ত শক্তির প্রেরণায় যে মনের বিকাশ তাহা এখন স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় স্বীকৃত। আমাদের শাস্ত্র বলেন, মনের নাশে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের বিলুপ্তিতে, আত্মার মুক্তি হয়। পক্ষান্তরে ক্রমোন্নতি প্রণালী বুঝাইতেছে, যে মনের বিকাশে— মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারের প্রস্ফুটনে

মনুষ্যত্ব হয়। যাহা থাকিলে, আমরা মনুষ্য, যাহার উৎকর্ষে দেবত্ব প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা নষ্ট করিলে মুক্তি পাইব, অনন্ত সাগরে মিশিব। অথবা অন্য কথায় বলি না কেন; জন্তু হইলে, পশু হইলে মুক্তি হয়। কিন্তু কথা এই যাহার অনুপস্থিতিতে, ও অভাবে পশুত্ব, তাহার প্রকাশেও পরিপুষ্টি হইয়া, পরিণামেও কি পশুত্ব পুনঃ সঞ্চার হয়? পশুত্ব ছাড়িয়া মানুষ হইয়া মনুষ্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আবার তাহা পোড়াইয়া খাক করিলে কি হয়? মানুষ মরিয়া কি হয়? সংস্কার তত্ত্বের ইহাই কঠিন প্রশ্ন। আমরা যতদূর পারি এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে বুঝা যাউক সংস্কার কি ও তাহার ক্রিয়া কি রূপ।

জীব মাত্রেরই বাঁচিবার চেষ্টা প্রবল। যাহাতে শরীর রক্ষা হওয়া সম্ভব তাহা সকল প্রাণীই পাইয়া থাকে। এবং দেশের জলবায়ুর উপযোগী করিয়া জীবগণের শরীরও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যদি কোন গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জন্তুকে ধীরে ২ শীত-প্রধান দেশে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে সেই জন্তু যদি মরিয়া না যায়, উহার শারীর প্রকৃতি ক্রমে ২ শীত প্রধান দেশের উপযোগী হইয়া উঠে। লোমশূন্য জীব হয়ত লোমশ হয়। পরন্তু যদি শারীর উন্নতি অথবা পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে হয়ত সেই জন্তুর মস্তিষ্কের এক নূতন ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে, উহার চেষ্টা হয় কিসে প্রকৃতির প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করে। এই চেষ্টাই সংস্কার সৃষ্টির আদি কারণ। এবং সংস্কার সমষ্টিই মনের বিধাতা। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, গরু বাছুর যাহারা মাঠে চরিতেছিল সে তেজ সহ্য করিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া এক বিশাল বট বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইল। বটের শীতল ছায়ায় তাহাদের সকল কষ্ট দূরে গেল। পশুগণের সংস্কার রহিল যে বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলে রৌদ্রতেজ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনি ধীরে ২ নানা বিষয়ের সংস্কার হইতে থাকিলে, স্মৃতি শক্তির বিকাশ হয়। ইহা এক জীবনে বা এক দেহে সম্পন্ন হয় না। নানা দেহ ধারণ করিয়া কোটী ২ বৎসর এই সংসারের দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া তবে মনুষ্য জীব হওয়া যায়। যখনি জগতের নিত্য পরিবর্ত্তনের মুখে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য অনুকূল ও উপযোগী শারীর-শক্তি আর কুলাইয়া উঠে না, তখনই মস্তিষ্কের গুপ্ত ভাণ্ডারে গিয়া হাত পড়ে। সুতরাং মস্তিষ্কের উন্নতি হইলে শারীর উন্নতি হওয়া এক প্রকার বন্ধ থাকে। আত্ম রক্ষার চেষ্টা এবং সুখও অসুখের অনুভূতি এই দুইটি বৃত্তি বেশ প্রকাশিত হইলে আপনা আপনিই, দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে, আঘ্রাণ করিতে, খাইতে, অনুভব করিতে ২ নানা বিষয়ের সংস্কার-বিদ্ধ হইতে ২ স্মৃতির উদ্রেক হয়, এবং মনের বিকাশ হয়। পৈতৃকত্বের নিয়মানুযায়ী এক জীবনের সঞ্চিত সংস্কার রাশি, পরবর্ত্তিগণে সঞ্চারিত হয়। ইহার উন্নতি করিয়া, ঘসিয়া, মাজিয়া বংশের পর বংশে বিস্তারিত করিয়া তবে মনুষ্যত্বে পরিণত হয়। প্রাণীত্বের তিনটি অবস্থা আছে—অস্তি, ভাতি, প্রীতি। দেহী হইয়া কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান—আছি এই মাত্র বোধ থাকে, অন্য ক্রিয়া নাই, অন্য চেষ্টা নাই, অন্য অনুভূতি নাই, ইহাই জীবত্বের প্রথম স্তর। তার পর "ভাতি" অর্থাৎ আমি আছি এবং অন্যেও আছে, এবং আমার অস্তিত্ব তাহারা বুঝিতেছে; আমি চলিতেছি, নড়িতেছি এই মাত্র জ্ঞান যখন হয় তখন দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় "প্রীতি" অর্থাৎ অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, বাধা বিরোধের অনুভূতি যখন হয় তখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্বও ওতপ্রোতঃ ভাবে সম্মিলিত, পুরু-ভুজের ন্যায় কাটিলে নূতনের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ দুইটা দুই স্থানে থাকে তবে তৃতীয়ের সাহায্যে অন-নুভূত ভাবে জীবোৎপত্তি, যথা বৃক্ষাদি। তৃতীয় অবস্থা পূর্ণ সম্ভোগ জ্ঞানাবস্থা। কেমন করিয়া এই তিন স্তরের

মধ্য দিয়া সংস্কার সঞ্চিত হইতে ২ মদের চোলাইয়ের মত পরম্পরায় দেহী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহা এই প্রবন্ধে বিচার্য্য নহে। ডারবিনের এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। অনুভূতি সংস্কারের ভিত্তি, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়া উহার মাল মসলা, এবং শিক্ষা উহার মজুর মিস্ত্রি।

এতদ্ব্যতীত প্রাণীদের অন্য দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির স্তর আছে। একটি আধ্যাত্মিক অপরটি ভৌতিক, অথবা পঞ্চ ভূতাত্মক জড়দেহের স্তর। প্রথম সূক্ষ্ম, অশরীরী, দ্বিতীয় স্থূল ও জড়। একটি অনন্ত, অন্য সান্ত। এই যে ত্রিলোক ব্যাপী ক্রমোন্নতির প্রণালী, ইহা জীবদেহ পক্ষে, শরীর ও শারীর বস্তু ইহা দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু আত্মার প্রথা স্বতন্ত্র। উহা অনন্ত পথে, অনন্ত মাখাইয়া অনন্তে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং ইহার কথা বিরাট, বিশাল, ও অনন্ত ব্যাপী। তুমি আমি অনন্ত সাগরে, অনন্তের মধ্যে, অনন্তের প্রস্ফুরণ মাত্র। অনন্তের অংশ অনন্ত, অনন্তখণ্ড সান্ত নহে, তাই সেই ভূমা বিরাট পুরুষের অংশ হইলেও আমরাও সেই আমি—"সোঽহং"। শাস্ত্রে আছে পরমাত্মা গুটি পোকার ন্যায় জড়াইয়া ২ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের সত্তা লইয়া, নিজের শক্তির দ্বারা নিজকে আবদ্ধ করিয়া জনন মরণশীল সুখাসুখাংশভাগী দেহী হয়। যখন আবার গুটিতে আবদ্ধ কীট সুন্দর প্রজাপতি হইয়া উঠে, তখন ভীতরের চেষ্টায় তাহার নিজ উদ্যমে, কোটী ২ ফের রেসমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গোড়ার বাঁধুনি এলাইয়া দিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া, অনন্ত আকাশে উড়িয়া গিয়া অনন্ত নীল সাগরে ডুবিয়া যায়। তেমনি পরমাত্মাও সংস্কার সূত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, উন্নত হইতে ২ পাপ পূণ্যের—রজত ও কণক-ময় সুতায় জড়াইতে ২ যখন চরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি হয়, চিদানন্দময়ের অপরূপ অনুপম মোহনমাধুরী প্রকাশিত হয়, সংস্কার গুটির মধ্যে চৈতন্য-তনু-তেজে শ্যাম শোভা সুগৌরবর্ণ প্রাপ্ত হয়; তখন "এক প্রঘট্টকেণ" সকল বাসনা-বিলাস নষ্ট হইয়া, সংস্কার গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া, অনন্তের পাখী সকল ছিঁড়িয়া, সকল ছাড়িয়া অনন্ত আকাশে, অনন্ত নীল-সাগরে অনন্তের হাত ধরাধরি করিয়া, অনন্তের অঙ্গে মিলিয়া যায়। আমরা যতদিন দেহী থাকিব, ততদিন সংস্কার চাই, ভাল মন্দ চাই, দেখা শুনা চাই, বুঝা পড়া চাই, ব্রত নিয়ম চাই। যেমন সুতার মুখে কোন ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া লাটাইতে খুব শীঘ্র জড়াইতে থাকিলে, যখন সুতা শেষ হইয়া যাইবে, তখন গুরুভার বশতঃ লাটাইয়ের আবর্ত্ত-বেগে সুতা উল্টা ফের খাইয়া আপনিই খুলিয়া যায়। তেমনি এই কর্ম্ম-সূত্রের মুখে পরমাত্মার গুরুভার জড়াইয়া দিয়া অনন্তের উপর ভর করিয়া সর্ব্বলোক ঘুরিতে থাকিলে, সর্ব্বযোনি পরিভ্রমণ করিয়া, যখন জড়ত্বের হ্রাস হয়, তখনই উল্টা ফের খাইয়া সকল বাঁধন খুলিয়া যায়। কারণ, অনন্ত সৃষ্টি-চাতুরীর মধ্যে জড়ত্ব সান্ত, কেন না উহা মায়া মোহ মলিনতা উপহিত। যদি বলত অনন্তের সৃষ্টি সবই অনন্ত; তবে তুমি আমি দেখি, তোমার আমার দেখায় যেন ইহার আদ্যন্ত আছে, যেন ইহার উৎপত্তি পরিণতি আছে, মনে হয় যেন একটা প্রথম আছে, আর একটা অন্ত আছে। সুতরাং মায়ার জগতের, মায়ার ইন্দ্রজাল পরিব্যাপ্ত জড়জগত সান্ত ও সাদি। কাযেই তোমার আমার যতদিন জড়ত্ব ততদিন আমরা দেহী ও সংস্কার যুক্ত। অনন্তের অংশ অনন্ত না বুঝিলে মুক্তি কোথায়?

এখন বুঝিলাম যে দেহের উপর শক্তির ক্রিয়া যাহা তাহাই সংস্কার। অধিকন্তু দেহে যাহা হয়, যে ক্রিয়ার দাগ থাকে, তাহা চিরস্থায়ী, এবং যত দিন দেহ তত দিন ব্যাপী। কাযে কাযেই ক্রিয়াফলও অবশ্যম্ভাবী, এবং ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও অপরিহার্য্য। কত কোটী ২ জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া, কত লক্ষ ২ যোনি ঘুরিয়া

আসিয়া তবে আমার এই আমিত্ব। এই আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর আমিত্বে কোটী ২ জন্ম সঞ্চিত সকল সংস্কার সকল ক্রিয়াফল; সকল প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি স্ব স্ব স্থানে চিহ্নিত আছে। তাহা না হইলে আমার এই আমিত্ব থাকিত না, আমি যাহা তাহা হইতাম না। তবে বাহ্য ও নানা বিপরীত শক্তি দ্বারা কেহ ২ বা ব্যাহত ও সম্মূঢ় আছে মাত্র, কেহ বা আকারান্তরিত হইয়াছে। তাই শাস্ত্রে আছে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"। কবিও গাহিয়াছেন: —

"The moving finger writes, and having writ,
Moves on; nor all your piety nor wit
Can lure it back to cancel half a line,
Nor all your tears wipe out a word of it."

যাহা একবার লিখিত হইয়াছে তাহা মুছিবার নহে, তাহার ফল অনিবার্য্য, সে লেখা দুরপনেয়। প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক বারের দেখা, শুনা, ও অনুভবে যে অগণ্য সংস্কার রাশি সঞ্চিত হইতেছে তাহারা শারীর, ও মানসিক পরিবর্ত্তন করিয়া তবে নিবৃত্ত হয়। কোন কার্য্যই নিস্ফল যায় না, কোন ব্যাপারই শারীর ও মানসিক পরিবর্ত্তনে পরাঙমুখ নহে। যে ক্রিয়ার যে ফল তাহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় হইবেই, তবে বাহ্যিক অন্য কোন শক্তির দ্বারা সে ক্রিয়াফলের প্রতিরোধ হইতে পারে মাত্র। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বটে, তবে হাতে স্পিরীট মাখাইয়া আগুণে হাত দিলে হাত পুড়ে না। এতদ্ব্যতীত কার্য্য কারণ পরম্পরা অনন্তকাল ব্যাপী, অসীম এবং অনন্তযুগানুগ। অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎপত্তি, ফল প্রাপ্তি ও নূতন অভিব্যক্তি, বিসদৃশাপেক্ষ। যাহার উপর যে ক্রিয়ার কার্য্য হইতেছে তাহার যত দিন স্থিতি ততদিন সে ক্রিয়ার পরম্পরা বাড়িয়া চলিবে। জীব চিরকাল স্থায়ী, পরমাত্মায় না ডুবিলে, জীবের জীবত্বের আদিও নাই অন্তও নাই, সুতরাং জীবদেহে (লিঙ্গশরীরে) যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহার কার্য্য 'কারণ' পরম্পরা অনন্তকাল ব্যাপী। কাযেই আমাদের দেখাশুনা, বুঝার মধ্যে যাহা হয়, তাহার আদি ও অন্ত আমরা ধরিয়া পাই না।

অতঃপর বিচার্য্য মৃত্যু কি, ও কাহার সম্বন্ধে। যাহা পরিবর্ত্তন-শীল তাহারই মৃত্যু সম্ভবে। গীতার উপদেশ যে, আত্মার মৃত্যু নাই, বিনাশ নাই, পরিবর্ত্তন নাই; যতদিন নির্ব্বাণ মুক্তি না হয় ততদিন জীবাত্মা অর্থাৎ কর্ম্মোপহিত সংস্কার-সমন্বিত আত্মারও বিনাশ নাই। এই মেদ-মজ্জা বসা-কঙ্কালাদি পূর্ণ দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এবং অপরিহার্য্য, কেবল ইহাই নহে, মৃত্যু সদাই আসন্ন এবং উহার ক্রিয়া শরীরের অন্যান্য ক্রিয়ার সহগামী। প্রথমে দেহী হইবার সময় ইহতে যে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) সমষ্টি নিহিত আত্মা, যাহার অংশ হইতে আত্মজ পুত্রের উদ্ভব, যাহাতে সকল সংস্কার, সকল ক্রিয়া ফল সঞ্চিত থাকে, তাহার মৃত্যু—নির্ব্বাণ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেহের বিনাশে, জীবাত্মার অথবা লিঙ্গ শরীরের মৃত্যু নাই, উহা চিরকাল বিরাজিত এবং সর্ব্বযোনি প্রবাহিত। মোটা দেহের বিনাশ বিবরণ অনাবশ্যক, তবে সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের বিলয় ব্যাপার জানিবার ও বুঝিবার বিষয়। সকল ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, 'প্রোটোপ্লাজম পরিপুষ্ট, সংস্কার সমন্বিত যাহা, তাহাই লিঙ্গ শরীর। আত্মানুভূতি হইলে লিঙ্গ শরীরের মৃত্যু হয়—মুক্তি হয়। মনুষ্য—তাও একটু বিশেষ সভ্য মনুষ্য ব্যতীত "আত্মজ্ঞান" অর্থাৎ "আমি আছি" ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। প্রথম, মধ্যম, উত্তম পুরুষের বিভাগ করা সভ্যতার একটু উচ্চ পদবীতে আরূঢ় না হইলে বড় সহজ নহে। সুতরাং আমার "আমিত্ব" জ্ঞান টুকু মনুষ্যেতর জীব লোকের ত নাই, তাও মনুষ্যের মধ্যে যেমন তেমন মানুষ হইলে হইবে না, বিশেষ বুদ্ধি বৃত্তির

স্ফূর্ত্তি না হইলে হয় না। আবার এই আমিত্ব জ্ঞানই মুক্তির প্রধান উপাদান। কাযেই অগণিত জীবযোনি পরিভ্রমণ করিয়া সংস্কারের অষ্টগ্রন্থি দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে, নানা সাধ্য সাধনের পর পূর্ণাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে, তবে মুক্তি। অথবা সংস্কারের উন্নতি ও বৃদ্ধিতে পশুত্বের নাশ এবং ব্রহ্ম জ্ঞানরূপী পূর্ণেন্দুর পূর্ণ প্রকাশের সূচনা হয়। অগাধ সাগর গর্ভস্থ বায়ুর সঞ্চালনে সাগরবক্ষে কোটী ২ বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠে; কিন্তু মাথার উপরের অনন্ত আকাশের অনন্ত পবন রাশি যখন ছোট ২ জলের ফুট গুলিতে গিয়া আঘাত করে, তখন ক্ষুদ্র প্রাণ অমনি আহ্লাদে ফাটিয়া অনন্তে মিশিয়া যায়। তেমনি জীব নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মের পুঁটুলি লইয়া নানা দেহ ধারণ করিয়া, পরিমার্জ্জিত ও সমুন্নত হইয়া যখন অনন্ত পরিব্যাপ্ত মহাপুরুষকে "সেই আমি যে আমি এই আলোক আঁধারে পড়িয়া মহাকুম্ভিপাকে ঘুরিয়া বেড়াই লাম সেই আমার আমি" বলিয়া চিনিতে পারে, তখন চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় মহামায়ার মহাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা অনন্তের অংশ অনন্তকে পূর্ণ অনন্তে ঢালিয়া মিশাইয়া দেয়। সুতরাং জীব পশুদেহ না ছাড়িলে, মানুষী সংস্কার দ্বারা পরিষ্কৃত না হইলে মুক্তি অথবা লিঙ্গশরীরের মৃত্যু অসম্ভব। তবে "পশু" শব্দার্থে যিনি যাবৎ বস্তুতে সমান আত্ম প্রকাশ দেখেন" ইহাই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের পরিণাম পশুত্ব আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী।

জীব এক দেহান্তেই অন্য নূতন দেহে "জলৌকাবৎ" গিয়া সঞ্চারিত হয়। সংস্কার সহিত জীবাত্মা, (অথবা লিঙ্গশরীর) দেহশূন্যে থাকিতে পারে না। কারণ সংস্কার-ফল দেহে প্রকাশিত হয়, এবং দেহ ব্যাপী। শাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই। কাযেই বিজ্ঞান আবিষ্কৃত জীবতত্ত্ব মানিলে এবং কর্ম্মবাদ স্বীকার করিলে জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেই হইবে। বাস্তবিক এতবড় বিশাল বিশ্বব্যাপী জীবক্রিয়া এমন শৃঙ্খলা ও ক্রমোন্নতি ইহা কেবল মনুষ্যত্বেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না। তবে একটা প্রশ্ন এই উঠিতে পারে যে, যদি কর্ম্মবাদ মানিতে হয় তাহা হইল আত্ম-শক্তির— ইচ্ছা-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন এবং অযুক্তি-যুক্ত। জীব কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা, কর্ম্মের দ্বারা আত্মার সৃষ্টি, বাহিক অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবের জীবত্ব, চিন্তা, মেধা, প্রবৃত্তি আদি সকল গুলিই ক্রিয়ার সংঘর্ষে উৎপন্ন। জীব তৃণবৎ কর্ম্ম সাগরের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। যুক্তি বিচারের দ্বারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণ Theory of circumstance লইয়া আজকাল এত ব্যস্ত। আমাদের মধ্যে প্রারব্ধবাদ আছে বটে, তবে পুরুষার্থ বড় কম নহে। আজ কাল তোমার, আমার ন্যায়, অপদার্থ, অপটু অসহিষ্ণু, ভীরু জীবরাই কপালে আঘাত করিয়া অদৃষ্টের দোষ দিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর পুরুষার্থ অলৌকিক অপূর্ব্ব। হিন্দু শিখাইয়াছে যে, পুরুষকার দ্বারা কীটও বিশাল হইতে পারে, পথের রাতভিখারীও সার্ব্বভৌম সম্রাট হয়। হিন্দুর শিক্ষা নৈরাশ্যের শিক্ষা নহে। আশা, উৎসাহ ও উদ্যম এই তিনটিই হিন্দুর মূল মন্ত্র। চিরদিন দুঃখ নাই, এক জীবনে না হয় শত জীবনে সাধ্য সাধিত হইবে, কিন্তু তাহা দুরাশা নহে, তাহা আয়ত্তাধীন করামলকবৎ। এ বীরের, তেজস্বীর, বিশ্ববিজয়ীর ধর্ম্ম। আমরা তাঁহাদের সমক্ষে কুক্কুর হইলেও সেই বংশের বলিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্পর্দ্ধা করি। কাযেই ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে। পরন্তু পুরুষকার বুঝিতে হইলে শক্তি তত্ত্ব আলোড়ন করিতে হইবে। ইহার বিচার ভবিষ্যতের জন্য রহিল।

দেব-লীলা।

প্রয়াগ হইতে পাইওনিয়ার আফিসের খাতাঞ্চী শ্রীযুক্ত রামচরণ শুক্ল মহাশয় শ্রীমৎস্বামীজীকে যে একটী দেবলীলা রহস্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা ধর্ম্মাত্মা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পরম পূজনীয়

শ্রী শ্রীমহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী শ্রী শ্রীচরণ পদ্মেষু

মহাত্মন্!

যে বৃদ্ধা স্ত্রীর ভক্তির বিষয় আপনার সমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম তাহা আপনার গোচরার্থ নিম্নলিখিতেছি—

বৃদ্ধা স্ত্রীর নাম বাতাসিয়া মামাসিয়া, জেলা কানপুরের অন্তর্গত খজুয়া গ্রামে উহার নিবাস, এবং উহার পুত্রের নাম কালিকা প্রসাদ, জাতিতে ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ পাঁড়ে উপাধি, (লক্ষৌ ভট্টাচার্য্য শ্রেণী) বড় বাজার নন্দাপুর মহল্লা, আমাদের গ্রামে অর্থাৎ নরওলে, উহার কেহ সম্পর্কিত নহে। কানপুরের অন্তর্গত তিলশারি গ্রামে ভরসা তেওয়ারির ভ্রাতা কালীতেওয়ারির পুত্রি উক্ত কালিকা প্রশাদ পাঁড়ের ঘরে বিবাহিতা। যখন ভরসা তেওয়ারির প্রপৌত্রির শুভবিবাহ হয় তখন কালিকা প্রসাদ বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং আমার ভ্রাতাও সেখানে তদুপলক্ষে যান, ক্রমেকথা বার্ত্তায় উনি স্বমাতার বিবরণ বলিলেন, যে আমার মাতা ঠাকুরাণী প্রায় ২০।২২ বৎসর অবধি পক্ষাঘাত পীড়ায় পদহীনা ছিলেন, এবং উঁহার তীর্থাটনে নিতান্ত ব্যগ্রতা থাকায় আমি উঁহাকে কাশী, অযোধ্যা, মথুরা, নৈমিষারণ্য, চিত্রকূট ইত্যাদি স্থানে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতাম এবং তথায় গিয়া তিনি নিজ হাতের উপর ভর দিয়া চলিয়া দর্শনাদি করিতেন। তাহার পর আজ প্রায় দুই তিন মাস হইল আমি একদিন গ্রামের বাহির যাইতেছি এমন সময়ে আমার মামার ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, তোমার মাতা ঠাকুরাণীর পুনঃপদ প্রাপ্তি হইয়াছে, অর্থাৎ উহার পা ছিল না উনি পা পাইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, উহার শুভ সংবাদ যথার্থই বটে, এবং দেখিলাম উনি স্বপদে চলিয়া আসিতেছেন। দেখিবামাত্রই আমি পায়ে পড়িলাম এবং ১০৲ দশটাকার পয়সা আনাইয়া বিতরণ করিলাম, তৎপশ্চাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম যে মা, ইহার সমস্ত ইতিহাস আমাকে বলুন। উনি বলিলেন যে, আমি আমার গ্রামস্থ শ্রী শ্রী শ্রীমহাদেবের মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কারণ আমি সেই খানে প্রত্যহই যাইতাম, অদ্য যাইয়া দর্শন করিবার পর আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং বলিলাম হে মহাদেব! আমি বড় পাপিয়সী, কেননা গ্রন্থাদিতে শুনিয়াছি যে আপনি এমন দানী যে অন্ধ দিগকে চক্ষু দিয়া থাকেন এবং পদহীন দিগকে পদ দিয়া থাকেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমি পদহীনা হইয়াছি, এবং আমার, তোমার মন্দিরের ঘণ্টা বাজাইবার নিতান্ত ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেছি না এবং ফুল পত্রাদি লইয়া পূজা করিতে পারি না। ইহা বলিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলাম, যে মুহূর্ত্তেই জানিতে পারিলাম, যেন আমায় কেহ বলিতেছে যে তোমায় কে বারণ করিতেছে? তুমি কেন ঘণ্টা বাজাও না। তখন আমি মন্দিরের চতুষ্পার্শে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম সেখানে কেহই নাই, বিবেচনা করিলাম যে দয়ালু মহাদেবের বাক্য ব্যতীত আর কাহারই এবাক্য নহে। ইহা মনে করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং তখন দেখিলাম আমার পা হইয়াছে এবং পায়ের উপর ভর দিয়া ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিলাম, এমন সময়ে তৎস্থানস্থ ছেলেরা, যাহারা খেলা করিতেছিল বলিতে লাগিল বৃদ্ধা পা পাইয়াছে, ইহার পর থানাদার আসিয়া বলিলেন তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি বলিলাম যদি পড়িয়া যাই, তখন তিনি বলিলেন যে মহাদেব তোমাকে পা দিয়াছেন তুমি পড়িবেনা।

তখন আমি বাড়ী আসিলাম, তার পর আর কিছুই জানি না। তখন, তাঁহার বাড়ী আসার পর আমি চরণ ধুইয়া চরণামৃত লইলাম। উনি বলিলেন আজ রাত্রি জাগরণ করিব। আমি তাহা করিতে সম্মত হইলাম। সে রাত্রিতেই তাহার পাদুটী হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল। এখন এ প্রকার চলিতে পারেন যে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারি না। অনেক লোক দর্শনের জন্য আসিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত হিন্দি শালের গুজাস্তা শালের ফাল্গুন চৈত্র মাসের ঘটনা—

মোহনলাল পণ্ডিত দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন ও উনিও আমার ভ্রাতাকে এ ঘটনা বলিয়াছিলেন, আমার ভ্রাতাও সে খানে গিয়াছিলেন, তখন সেই গ্রামের থানাদার কায়স্থ ছিলেন, বর্ত্তমান মুসলমান থানদার, মন্দির কালিকাপ্রসাদের বাড়ীর সন্নিকট— আপনার নিকট আসল চিঠিও পাঠাইতেছি দেখিবেন।

আপনার সেবকাধম সেবক

শ্রীরাম চরণ শুক্ল।

কারাগার।

যাহাতে বহু ব্যক্তি স্বতঃএব এত আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে অগ্রসর, যাহাকে পরমপ্রিয় অবশ্যাবশ্যকীয় কার্য্য ও সংসারের সুখশান্তি স্বরূপ বলিয়া মনুষ্য মাত্রই গ্রহণ করে, সেই পরিণয় সম্বন্ধকে লোকে বিবাহ-" বন্ধন, " " পরিণয়-পাশ " বলে কেন! আবার ঐ এক পরম শান্ত যোগী মহান্ত পুরুষ সেই আনন্দোৎসব দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতেই বা —

" বেহা বেহা সবকই কহে, মেরা মনমে এই ভাওঁয়ে, চড়্‌খাটোলি ধো ধো লাগরা, জেহল্ পর্ লেজাওয়ে"

কহিয়া, বিবাহকে কারাগার স্বরূপ বলিলেন কেন? আমার মত সাধারণ জীবের প্রমাদোক্তি ব্যঙ্গোক্তি হইতে পারে, কিন্তু তুলসী দাসের ন্যায় প্রমাদ বর্জ্জিত, বিবেক বিজ্ঞ, ভক্ত মহাত্মার মুখ হইতে ও রূপ হৃদ বিদারিণী বাণী নিঃসৃত হইল কেন, ইহাই মনেং অনেক সময় ভাবি। এক অলীক সুখের—আকাশ কুসুমের ভাণ মাত্র রটাইয়া আমরা অবোধ বাল-দম্পতিকে কি কঠোর কষ্টকর কুহকে, দারুণ দাবদাহ মধ্যে ফেলিয়া দিইবহু ক্লেশোপার্জ্জিত বিপুল ধন ধান্যক্ষয়কর মহা বাদ্যোদ্যমাদি সহ আপন হৃদয়নিধি ননীর পুতুল দিগকে সানন্দে হিরণময় অলঙ্কার রূপ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, বিধিনির্দ্দিষ্ট রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া চিরদিনের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করাইতে কি কারাগারের সংরুদ্ধ অন্ধকূপ মধ্যে নিঃক্ষেপ করি?

আবার সন্দেহ উঠিল—অহো! কি আশ্চর্য্য! পরিণয় ব্যাপার যদি কেবল ভব বন্ধন স্বরূপ হয়, কঠোর ক্লেশকর কারাগার মাত্র হয়, তবে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুরও বিরুদ্ধে যে জননী প্রহ্লাদের কাণে কাণে অন্নে বিষ আছে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে মা কোন্ প্রাণে সত্যোদ্ঘাটন না করিয়া সদুপদেশ না দিয়া, আপন পুত্রকে আনন্দে বর সাজাইয়া পাঠাইয়া দেন? সাক্ষাৎ প্রকৃত্যংশ স্বরূপিণী, স্নেহময়ী, সরলা হিন্দু মহিলা মণ্ডলী মধ্যে, ঐ কোমলা ললনা প্রাণেই বা এরূপ প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরপণা, অকৃতাপরাধী নিরীহের প্রতি অত বিতাড়না, কিরূপে সম্ভব হয়?

পর্য্যায় ক্রমে তখন আমার মনে এই দুইটী সংশয় উত্থিত হইলে, প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত সমস্যা পূরণ বা প্রমাণ করিবার অগ্রে, পবিত্র নারী চরিত্রে এই আপাত বিচিত্র দোষের চিহ্ন মাত্র আছে কি না দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, বিবাহের সময় কন্যার ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেই, স্নেহময়ী জননী বাৎসল্য প্রেমঢল ঢল সহাস্য বদনে, কনকাঞ্জলি লইবার ছলে, কাণে কাণে "কাহাকে আনিতে যাইতেছ" জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ যে ত্রিসত্য করাইয়া লইলেন—যে "আপনার দাসীকে আনিতে যাইতেছি"; ইহার তাৎপর্য্য কি? এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি? এ একটি বহু কাল

প্রচলিত চির প্রসিদ্ধ স্ত্রী আচার বা দেশাচার। আবার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্ত্রী আচার বা দেশাচারকে সদাচার বা ধর্ম্মাচার বলিয়া গিয়াছেন। অতএব পাছে নবোঢ়া বধূ-প্রণয়-বিকার-গ্রস্ত পুত্র বিকারের খেয়ালে, পুত্র বধূ কর্ত্তৃক পূজনীয়া জননীকে নির্য্যাতিতা, লাঞ্ছিতা করেন, এই ভয়েই উক্ত স্ত্রী-আচার বা ত্রিসত্য করণ সমাজে প্রচলিত আছে, এরূপ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত ঘৃণিত; তাহা মোহমুগ্ধ ব্যক্তির প্রগল্‌ভতা মাত্র, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য। কারণ যে নরাধম পুত্রের প্রকৃতি ঐ রূপ কলুষিত মা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন, সে পুত্রের ত্রিসত্য যে হরিণাক্ষীর এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে তা কি আর মা বা সমাজ বোঝেন না? বিশেষ বোঝেন, তত্রাচ যে ঐ প্রথা প্রচলিত, ইহার গুপ্ত মর্ম্ম—রহস্য কি, তাহাই তখন মন জিজ্ঞাসু হইল। তদুত্তরে যা স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তাহাতেই আমার মন প্রাণ সন্তুষ্ট, শান্ত হইয়া গেল। বুঝিলাম পূর্ব্বকালে জ্ঞান-ভক্তিমতী প্রসূতিগণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী, জ্ঞানী পুত্রের মর্য্যাদা, সাধারণের নিকট রক্ষা করিবার জন্য, সংসারাশ্রমোচিত সার উপদেশ, সংসারে প্রবিষ্ট হইতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণেই ঐ রূপ ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতেন বা স্মরণ করাইয়া দিতেন। সেই প্রথানুসারে মা এখনও সঙ্কেতে বলিয়াছিলেন, সংসারে "আমার" কাহাকেও ভাবিও না—আপন পরিণীতা স্ত্রীকেও নহে—"আমার" ভাবিলেই তাহাতে অভিমান আহত হইলেই ক্রোধ জন্মায়, ক্রোধ হইতেই কলহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া সংসার ছার খার হইয়া যায়, আজীবন কষ্ট পাইতে হয়। অতএব ভাবিও স্ত্রী "আমার" নহে—"জননীর দাসী"। অহো! এ জননী শব্দের মধ্যেও আবার আশ্চর্য্য প্রহেলিকা-পূর্ণ গুপ্ত অর্থ রহিয়াছে। এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডোদরী প্রত্যক্ষ স্থূল শরীর ধারিণী মা, সেই বিভূতি মাত্র। তাই কৌশলে ইঙ্গিতে বলা হইল, তুমি সেই বিশ্ব প্রসবিনী জগজ্জননীর দাস, তোমার সহধর্ম্মিণী তাঁহারই দাসী। জগদম্বার আদেশ মাত্র পালন জন্য যাগ, যজ্ঞ, দান, প্রভৃতি যে কোন সংসার কার্য্য দ্বারা সংসারে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাহারই সাহায্যার্থ প্রধানা শক্তি স্বরূপিণী তিনি, যাঁহাকে আজ তুমি আনিতে যাইতেছ. তিনি তোমার কাম-বিলাসিনী রমণী নহেন—ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া, মাতা পুত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। অতএব কয়াধুর ন্যায় উপদেশ দিবার মাতা আছেন কিন্তু প্রহ্লাদের ন্যায় পুত্র কৈ, যে হরিকে এ কারাগারের মধ্যেও আকর্ষণ করিবে! সেই অভাব হেতুই আজ সোনার ভারতের এই দুর্দ্দশা। অতএব সাধ্বী সতী হিন্দু-রমণীর হৃদয়ে আবার প্রতারণা কোথায়?

বর কন্যার গৃহে সভাস্থ হইলে, সভার মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতগণ, মহামান্য গুরুজন বর্গ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিলেও, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বরকে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে প্রথমেই আবার স্ত্রী আচার আসিল। অত্রস্থ কুল কামিনীগণও স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন, স্ত্রী তোমার বিলাস-রমণী নহেন—শক্তি-স্বরূপিণী। তাই তোমার সুন্দরের বিদ্যা অনূঢ়া সীমন্তিনী আজ শিব সীমন্তিনীর ন্যায়, তব হৃদয় কন্দরের মহাবিদ্যা ষোড়শী রূপে, ঐ পুরুষবৃন্দের স্কন্ধে চড়িয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে, তাঁহার এক ভাবে প্রমত্ত, ভব ঘোর বিভোর, ভোলার প্রতি ইঙ্গিতে কহিলেন, যে আমিই সৃষ্টি শক্তি স্বরূপিণী, আমার ইচ্ছামত সৃষ্টি কার্য্যে আমারই ইঙ্গিতানুসারে ঈক্ষণে তুমি অনাশক্ত, নির্লিপ্ত ভাবে আমার সহায়তা করিবে মাত্র, তাই আজ সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া সর্ব্বাগ্রে কেবল ঈক্ষণ মাত্র করিলাম সাবধান, আমাকে বিলাস-বনিতা ভাবিও না!

শেষেও স্ত্রী আচার বাসর-শয্যা। এখানেও

বাসর গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে কোন স্থানে সিন্দূর চন্দনাদি চর্চ্চিত সামান্য চেলখণ্ডাবৃত উপানৎ ও সম্মার্জ্জনী সুসজ্জিত থাকে; আর বরকে তাহা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বলিয়া প্রণাম করিতে বলা হয়। ইহাতে বর যদি তাহা উপেক্ষা করত পদাঙ্গুষ্ঠ প্রহারে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যায়, তবে ভামিনীগণের আনন্দের আর সীমা থাকে না, আর সত্যই হুকুম মত প্রণাম করেন, তাঁহাকে নিতান্ত মূঢ় বোকা মনে করিয়া কামিনী কুল উপহাস করেন। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, তাঁহারা জানাইলেন ও প্রত্যক্ষ শিখাইলেন, স্ত্রী মাত্রই ষষ্ঠী স্বরূপিণী; কিন্তু স্ত্রীর এই অস্থি, মেদ, মজ্জা, রক্ত, মাংসময় দেহটাতে—উপরকার ছাউনটাতে বিমুগ্ধ হইয়া যদি তুমি সেটাকে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বোধে সম্মান কর, শ্রদ্ধা কর, তবেই রমণীগণ মনে মনে হাসিবে এবং তোমাকে চিরজীবন স্ত্রী সম্প্রদায় মধ্যে নশ্বর প্রণয়ে ও ভালবাসায় বদ্ধ হইয়া সমাজে নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনা রূপ উপানৎসেবী হইয়া থাকিতে হইবে কিম্বা তুমি সমাজের আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় কেবল শতমুখীর মুখে বিধ্বস্ত, বিতাড়িত, ঘৃণিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, শেষে বাসর-শয্যাতে ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল, যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, যদি সংসারে তদনুরূপ ঠিক চলিতে পার, তবে অচিরাৎ ঐ রূপ নির্ব্বোধ, নিঃসঙ্গ, নিশ্চেষ্ট ভাব পরিপাক হইয়া গেলে, তাহা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইলে, এক দিন এমন দিন আসিবে যে দিন আবার কুলবালাগণ আজকের মত গুরুজনের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, নির্ভীক ভাবে স্ব স্ব পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের অবশ্য বিধি পালন জ্ঞানে, উদাসীন ও সরল ভাবে তোমায় ভাল বাসিবে, কত আদর করিবে, সোহাগ করিবে, স্নেহ বিকীর্ণ করিবে। আর তুমি তাহাদের সেই সকল ভাবেই অভয় বাণী—আশ্বাস-বাণীর মধুর কল্লোল শুনিতে থাকিবে, চিরদিনের জন্য তোমার জন্ম জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

অতএব যেখানে স্ত্রী আচার, সেই খানেই যখন এত রকমে সুগম্ভীর তত্ত্বশিক্ষা, তখন স্ত্রী সম্প্রদায় মধ্যে আবার প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরপনা কোথায়? স্ত্রী আচারের ঐ সকল অতি গুহ্য তত্ত্ব শিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ ও বেদান্ত-নিষ্পেষিত বৈরাগ্য বিচার-প্রবাহ মানবের নানা কলুষ ভাব অতি সহজেই ভাসাইয়া দিবে, এই জন্যই বিবাহের আদি, অন্ত ও মধ্যে স্ত্রী সম্প্রদায়ের ভিতর অত উদার স্ত্রী আচার ব্যবস্থা। কিন্তু হায়! আজ কাল ভারতের কপাল দোষে, তাহাও ঘৃণিত, অতি কুসংস্কার, অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যা হউক, স্ত্রী সম্প্রদায় বা স্ত্রী আচার মধ্যে আর কোন দোষ নাই বুঝিলাম। পরে পরিণয়কে তবে ভক্তপ্রবর তুলসিদাস স্বামী জেলখানা রূপে কেন বর্ণন করিলেন? লোকে বিবাহ বন্ধন, পরিণয়-পাশ কেন বলে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা।

২২এ হইতে ২৮এ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া বীরভূম জেলায়-সাঁইতা ষ্টেশনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীর তটে কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আদির বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ ও আগ্রহে মহামেলা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই আদর্শ মেলায় লোকের অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার, অনেক বুঝিবার, কিনিবার বেচিবার ও অনেক স্মরণ করিবার ও মনে রাখিবার জিনিষ ছিল। মেলার প্রথম উদ্যমে এত সমারোহ হইবে, ইহা আমরা আশা করি নাই।

২। মেলার প্রথম দিন, যাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সাধু মেলার উদ্যোগ, সেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কাশী হইতে যাত্রা

করিয়া যখন সাইথা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলে ২ ভক্ত লোক-মণ্ডলী, ধ্বজা পতাকা, রৌপ্য ছত্র দণ্ডাদি সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে ২ ভক্ত বৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘন ২ বন্দুক ছুটিতে লাগিল, আনন্দের মহা-রোলে মেলাভূমি মাতিয়া উঠিল। স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বয়ঃপ্রবীণ বিচক্ষণ ভক্ত জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবুর বিরচিত যে কীর্ত্তনটি গান হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল —

("গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা"—সুর)

সাধ পুরাইতে সাধু মেলা দেখ্‌সে আয়।

এ মেলায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়॥

মেলার বোল্‌বো কি সুঠাম, যথা রাধা কৃষ্ণ রাম, যোগী সহ যোগেশ্বরী করেন অধিষ্ঠান;—এ তো কেনা বেচার মেলা নয়, এতে সাধকের সাধ পূর্ণ হয়॥ ১॥

হ'য়ে বিরাগী যে জন, করে আত্ম বিসর্জ্জন, হরি-ভক্তি জীব মুক্তি করেন বিতরণ;—সেই চিরানন্দ কৃষ্ণা-নন্দ এ মেলায় হলেন উদয়॥ ২॥

জীবের ধর্ম্ম অভাবে, কলির কুটিল প্রভাবে, উঠ্‌লো হরিনামের খেলা যাঁর আবির্ভাবে;—তাঁর গুণের গান, গাইবো বলে এই মেলার এই অভিনয়॥ ৩॥

হবে সাধু দরশন, যাতে কলুষ খণ্ডন, মুক্তি শক্তি পরাভক্তি হইবে সাধন—(কাতর) হয়ে দীনবন্ধু ব'লে যেন কৃষ্ণানন্দ হ'ন সদয় (মেলায়)॥ ৪॥

৩। মেলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, শ্রীশ্রী সীতারামের সংগঠিত ও সুসজ্জিত দিব্য মূর্ত্তির বিবিধো-পচারে পূজা হইয়াছিল, সম্মুখে প্রত্যহ চন্দ্রাতপের ছায়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, মনোহর সাহী কীর্ত্তন, বালক সংকীর্ত্তন ও রামায়ণ গান হইত। মেলার অধি-নায়ক স্বামীজী চারি দিন জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশ ব্যাখ্যানে সহস্র ২ শ্রোতাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কত যে নরনারী বক্তৃতা শ্রবণে মনের সাধ মিটাইয়াছেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দলে ২ লোক একত্র হইত।

বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ আদিও প্রায় পাঁচ শতাধিক জুটিয়াছিল। ২দিন তাহাদিগকে নগদ পয়সা ও ভোজন-সামগ্রী দেওয়া হইয়াছিল। মেলা দেখিবার বিজ্ঞাপন পত্র গুলিকে বাউল দরবেশ আদিগণ ভাবিয়াছিল ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পত্র। তাই তাহারা দলে ২ প্রকৃতি সঙ্গে লইয়া আসিয়া খাইবার জন্য বড় দাবী দাওয়া করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের দলপতি গণ ৫০ জনের নাম করিয়া খোরাক লয়, ও ২০ জন মাত্রকেই খাওয়াইয়া অবশিষ্ট সামগ্রী আত্মসাৎ করিতে লাগিল, তখন এই দলের মধ্যে একটা বিষম গণ্ডগোল উঠিল। বৈরাগী দলের অসদাচারে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবা-চার্য্য গণ বৈরাগী বর্গের ব্যবহার সংশোধন করিলে বঙ্গভূমি অনেক পরিমাণে নিরুপদ্রব হয়।

৫। বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য মেলা দেখিতে যেমন সাধারণ লোকেরই সমাগম হয় মাত্র, এ মেলায় কেবল তাহাই নহে; সাধারণ স্ত্রী পুরুষের সংখ্যাতো গণনাই করা যায় নাই, তদুপরান্ত হাকিম, উকিল, জমীদার, আদি অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলিকাতা, কান্দী কাশী, উত্তর পাড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, আদি বহু দূর দূর দেশ হইতে মেলা দেখিতে ভদ্র লোক সকল আসিয়াছিলেন; বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, মিষ্টান্ন, মণিহারী আদির বহুতর দোকান, কলিকাতা, কাশী, বর্দ্ধমান, পাঁচথুপী, কাঁদী, বীরভূম, বৃন্দাবন, মেদিনীপুর, হইতে আসিয়াছিল। বাঘের খেলা, নাগর দোলা, আদিরও অভাব ছিল না। বেচা কেনাও অনেক টাকার হইয়াছিল।

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্নের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার

চক্রবর্ত্তী শ্রীমান্ পাঁচকড়ী রায়, শ্রীমান্ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়,শ্রীমান্ কালী কান্ত হাজরা প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা গণ অনেক সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই মেলায় পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের মেলায় সহস্র ২ লোকের সমাগম হইলেও কোন প্রকার অশান্তি বা গোলযোগ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে এই মেলার আদর্শে অন্যান্য মেলা গুলি বিশেষ রূপ সাত্ত্বিক ভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে, এই রূপই আমাদের সম্পূর্ণ আশা।

ধর্ম্মোৎসব।

গত ২৯শে ফাল্গুণ,লোকনাথপুরস্থ শ্রীশ্রী ৺ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ শিরোরত্ন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শিরোমণি এবং শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় গণ তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পাঠ এবং বক্তৃতা দ্বারায় সভাস্থ সকলের ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিয়া ছিলেন।

বিগত ১৬ই ফাল্গুণ হইতে ২ রা চৈত্র পর্য্যন্ত সপ্তদশ দিন ব্যাপিয়া ৺ কাশীধামে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল। বেদার্চ্চন, স্বস্তিবাচন, বেদপাঠ, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণ পাঠ, শাস্ত্রপূজন, পণ্ডিতার্চ্চন, সভাপতি অভিষেক, ভারতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ মন্ত্রণা, বক্তৃতা, ধর্ম্মসঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন আদি নানাবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষদিনে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, শালগ্রাম শিলা ও চতুর্ব্বেদ রৌপ্যময় সিংহাসনে বসাইয়া শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনিপূর্ব্বক ধ্বজপতাকাদি সহ মহাধুমধামের সহিত সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। পণ্ডিত গণের সিদ্ধান্ত ও বিদেশীয় রাজা মহারাজগণের সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম উক্ত সভায় পঠিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত ও বক্তাগণের সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আদিতে বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় দশ সহস্র লোক এই মহাসভায় সমবেত হইয়াছিল। বিদেশ হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। রাজা শশি শেখরেশ্বরের ঐকান্তিক যত্নে ও কাশীর মহারাজার বিশেষ সাহায্যে এই বিরাট ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। রাজা শশিশেখরেশ্বর হৃদয়বান্ পুরুষ। যথার্থ ধর্ম্মের হৃদয় তাঁহার আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই রূপ ধর্ম্মান্দোলনে তাঁহার উৎসাহ চিরকাল অবিচলিত থাকুক। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি সভা উপলক্ষে গীত হইয়াছিল—

বাহার, মধ্যমান ঠেকা ॥ ১ ॥

জাতীয় সম্মান গিয়েছে অনেক দিন,
হে ভারত বাসীগণ, করিয়ে দেখ স্মরণ,
সেই স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন,
ভজন সাধন গত, সে দিন হয়েছে গত,
যে দিন হয়েছে ভারত স্বধর্ম্ম হীন পাপাধীন।
আধুনিক পদ সম্মানে, আপনাকে ধন্য মানে,
অভিমানে নাহি মানে মুনি সদৃশ প্রবীণ;
আপন ভেবে যেমন কাকে, পরডিম্ব পেলে থাকে,
তেমনি মানে মানীলোকে, এমনি ভ্রান্ত মলিন।
কোথা গেল সে স্বভাব, কোথা গেল সে প্রভাব,
কালের প্রভাবে এবে ভারত প্রাণ বিহীন;—
আর কি প্রভা প্রকাশিবে, যজ্ঞাগ্নি গিয়েছে নিভে,
ইন্দ্র যায় ইন্দ্রত্ব লভে,সে এক দিন আর এ একদিন।

খাম্বাজ—একতালা ॥ ২ ॥

ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে, যোগ দান করি হিন্দু সকলে,
মগ্ন প্রায় ধর্ম্ম, ধারণ করি বলে, মুক্তি সাধন কর
সুযুক্তি বিধানে।
ঘটেছে এককালে ধর্ম্ম নিবন্ধন,জলধি মন্থন জলধি বন্ধন,
স্মরণ করি তাই হে আর্য্য নন্দন, কার্য্য কর বিশ্বেশ্বর
সন্নিধানে।
বেদ প্রণিহিত ধর্ম্ম সুমহান,ভারত মাতার ধর্ম্ম মাত্র প্রাণ
মাতৃ হত্যা আজ হইয়ে সন্তান, দেখিতেছ কোন্ প্রাণে;—
স্বধর্ম্মে নিধন যদি হতে হয়, সেও ভাল, পরধর্ম্মে বড় ভয়,
আরজেনো যথাধর্ম্ম তথাজয় বিহিত পঠিত পুরাণে এ সব।

বৈদবিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয় মাহ মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৮

মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য।

	মাঘ	ফাল্গুন
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন ফতেপুর দুমকা	৪৷০	
" গঙ্গাদিনাথ মুখোপাধ্যায় বঁকিপুর	৫৲	
" চৈতন্যচরণ দাস শ্রীহট্ট	২৲	
" গুরুগোবিন্দ মজুমদার কাকিনিয়া	৩৲	
" হরলাল দাস গুপ্ত ধুবড়ি	৮৸৵০	
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর	১/০	
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসত	১৷/০	
" যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় সিরাট	৪৲	
" ঈশানচন্দ্র দাস আখালিয়া শ্রীহট্ট	১৸৵০	
" বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত পটুয়াখালী বাখরগঞ্জ	৬৲	
" যোগীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কলিকাতা	৶১০	
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাঁতাড় হাবড়া	।০	
" কেদার নাথ গোস্বামী বড়া শ্রীরামপুর	৫৲	
" হরিমোহন সেন শিলচর কাছাড়	১৲	
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলগাড়িয়া	৪৵০	
" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দাঁইহাট	৮৲	
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান	।৵০	৸০
" শ্রীনাথ সাকার শর্ম্মা দিনহাটা	৩॥৵০	
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট	১৲	
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট		৬॥৵১০
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী গোকুলখালী		১০৲
" ভূপতি ভূষণ অধিকারী গুড়প		৵০
" মধুসূদন দাস কলিতপাড়া গোয়ালপাড়া		৮৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল		৫৲
" শ্রীনাথ দাস ফারাসগঞ্জ নোয়াখালী		৪৲
" ঈশানচন্দ্র রায় সরারচর		৪৲
" কৃষ্ণনাথ সিংহরায় নাকাসিপাড়া		২॥/০
" লোকনাথ শর্ম্মা নয়াসড়ক শ্রীহট্ট		১২৲
" শশীভূষণ ধর মোগরাড়ী নসিপুর		৩।০
" কালীকুমার রায় শ্রীপুর ঢাকা		১৲
" কিশোরী মোহন দাস শুজাপুর ফুলবাড়ি		১০৲
	৬০৸৵১০	৬৮।/১০

এককালীন দান।

	মাঘ	ফাল্গুন
শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্ট কাশীধাম	১৲	
" অম্বালিকা ও স্বর্ণময়ী দেব্যা, ফরিদপুর	৫॥৵০	
" হরিমোহন সেন শিলচর কাছাড়	৫৲	
" মহিমচন্দ্র বটক ৺ কাশীধাম	২৲	
" কেনচিৎ আর্য্য সন্তানেন দাঁইহাট	২৲	
" জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার ৺ কাশীধাম	১৲	
শ্রীবিপিন বিহারী রায় চৌমা ষ্টেশন		/০
" শরচ্চন্দ্র দাস মিত্র ঐ		৵০
" গৌরচন্দ্র লাল দাস মিত্র ঐ		/০
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র গয়া		৵০
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট		৶১০
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানিপুর		১৲
৺ কাশীধাম হইতে নাং পেয়ালা		৫
শ্রীঅশ্বিনী কুমার ঘোষ পাগুয়া শ্রীহট্ট		।/০
" গোবিন্দ চন্দ্র দাস বালুচর পাগুয়া		৵০
" দুলাই সিংহ মণিপুরী ঐ		/০
" মহারাম আসামি বিন্দাকুল ঐ		/০
	১৪॥৵০	১৵১৫

মাসিক বৃত্তি।

	মাঘ	ফাল্গুন
শ্রীযুক্ত মহারাজ দ্বারভঙ্গা মাহ ডিসেম্বর	২০৲	
ঐ ঐ মাহ জানুয়ারি	২০৲	
শ্রীবিপিনবিহারী রায় চৌমা ষ্টেশন	৵০	৵০
শ্রীমতী লবঙ্গসুন্দরী দাসী কাকিনিয়া মাহ মাঘ		১০৲
দেবেন্দ্র নাথ দত্ত দেওয়ান হাতুয়ারাজ মাহ পৌষ		৫৲
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কালীঘাট পৌষ হইতে ফাল্গুন		১৫৲
	৪০৵০	৩০৵০

জমা	
মুষ্টি ভিক্ষা মাহ মাঘ	৬৩৮৶১০
ঐ ফাল্গুণ	৬৮।/১০
এককালীন সাহায্য মাহ মাঘ	১৬॥৵০
ঐ মাহ ফাল্গুণ	১৵১৫
মাসিক বৃত্তি মাহ মাঘ	৪০৵০
ঐ ফাল্গুণ	৩০৵০
	২১৭।/১৫
পূর্ব্ব হিঃ উদ্বৃত্ত	৩২২৸/১০
	৫৪০৶৫

খরচ	
আচার্য্যগণের দক্ষিণা মাহ মাঘ	৫০৲
ঐ মাহ ফাল্গুণ	৩৯৲
ছাত্র বৃত্তি মাহ মাঘ	১৪৲
ঐ ফাল্গুণ	২০৲
ছাত্রাবাসের ব্যয় মাহ মাঘ ১৬৫।৵১৫ আষাড় হইতে পৌষ তক	
ঐ ফাল্গুণ	০
নিম্নশ্রেণী কর্ম্মচারীর বেতন মাহ মাঘ	১৯৲
ঐ ফাল্গুণ	৯৲
ছাপাই ব্যয় মাঘ	০
ঐ ফাল্গুণ	০
মাশুল ব্যয় মাঘ	।০
ঐ ফাল্গুণ	০
ক্ষুদ্র ব্যয় মাঘ	৸০
ঐ ফাল্গুণ	।৵১০
বিদ্যালয়ের জন্য জমি খরিদ হওন জন্য বায়না	২২৲
	৫৪০৵৫

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।